প্রয়াগ

প্রকাশক
গ্রাম প্রকাশনী
অর্জুনা, ভূঞাপুর, টাঙ্গাইল

মোবাইল
০১৭৫২০২৩১৭৭

ই-মেইল
pathagarsammelon@gmail.com

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০২২

প্রচ্ছদ
শামীম আকন্দ

মুদ্রণ

সম্পাদনা পরিষদ
রাসেদ শাহ
ইমরান মাহফুজ
লাবণী মন্ডল
শাহেরীন আরাফাত
তমাল দেব

শিল্প সম্পাদক
শামীম আকন্দ

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

মানুষ মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, বিপ্লব মোস্তাফিজ, কাজী এমদাদুল হক খোকন, মোঃ শরিফুর রহমান রাকেশ, রাজেন্দ্র দেবনাথ, মোস্তাফিজুর রহমান পাভেল, ফরিদুজ্জামান রাসেল, সৈয়দ আমিনুল হক কায়সার, মঞ্জু, নির্মল গোস্বামী, শরীফুস সালেকীন শাহান, কামরুল মোজাহীদ, শফিক আহমেদ, জান্নাতুল ফেরদৌস, রানু মিয়া।

মোঃ জিয়ারুল ইসলাম জুয়েল, শাকিল আহসান, এ.এস.এম. খালেদ হাসান শান্ত, মো. আনারুল ইসলাম, ওসমান গনি, সুমন আহমেদ সম্রাট।

অমিদ হাসান অনন্ত,মোছাঃ শান্তা খাতুন, মোঃ রাজু সরকার, মোঃ তামিম খাঁন, ইলিয়াস জামান, কামরান পারভেজ ইভান, মোঃ সাইদুর রহমান, আশিকুর রহমান, মোঃ মমিনুল ইসলাম, সাইমুন ইসলাম সিয়াম, মাহবুব হাসান মানিক, খলিলুর রহমান, সাইফুল্লাহ রাব্বি

অনিক, মোঃ রাকিব, মিলন তালুকদার, মোঃ আরিফ হোসাইন, মোঃ রাকিব হোসেন, তানভীরুল ইসলাম শিহাব, সিফাত হোসেন, সাদিয়া ইসলাম শান্তা, আতিকুর, হারুন আর রশিদ, আবু ফারুক, হাসিবুল ইসলাম, মোঃ আয়নাল হক, মোঃ জামাল হোসেন, মোঃ তামিম তালুকদার, সজিব উজ জামান সজিব, আরিফ হোসেন, মোঃ আলিফ খাঁন, মোহাম্মদ আহসানুল আলম, কবির।

মোঃ সাদিকুজ্জামান সৌরভ, নাঈম মন্ডল, মোছাঃ তানজিলা আক্তার তৃপ্তি, স্বপন সরকার, নাসির উদ্দিন, মোঃ মারুফ হোসেন, মোঃ শাকিল, কাজী নয়ন, হৃদয় পারভেজ লিখন, মোঃ জনি তালুকদার, তাসলিমা, মোঃ মানিক ইসলাম, মোঃ রাকিব খান মোঃ সম্রাট, মোঃ লিখন খান, মোঃ নাহিদ শেখ, মোঃ হানিফ মিয়া।

মোঃ সাকিব খান, মোঃ আবির মাহমুদ, মোঃ কবির হোসেন, মোঃ মিলন তালুকদার, মোঃ হাফিজুল, মোঃ মোস্তফা, নাফিউর রহমান তালুকদার, আব্দুল মাজিদ, জাওয়াদ হোসেন ইমরান, জিনা খান, রীনা খান, মায়েশা, নাদিম, পল্লব, ইসমাইল গণি চৌধুরী।

আহ্বায়ক এর বাণী

ছাত্র বয়স থেকে শুনে আসছি কাগমারি সম্মেলনের কথা। শুনে আসছি কৃষক সম্মেলনের কথা। এসব সম্মেলনকে ঘিরে হতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা। সম্মেলনগুলো হতো গণমানুষের টাকায়, তাঁদের শ্রমে, ঘামে। আগত মানুষেরা পেত আগামীর দিক নির্দেশনা। বিদেশি শত্রুদের তাড়িয়ে স্বদেশ গঠনের অগ্নিদীপ্ত মন্ত্রনা।

মনে মনে ভাবতাম, আমাদের সময়ও যদি এমন একটা সম্মেলন হতো! যেখানে অন্ধকারকে দূর করার মন্ত্রণা থাকবে, থাকবে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার প্রেরণা, যেখানে সারা দেশের শুভ বোধসম্পন্ন মানুষেরা একত্রিত হবে, দেশ গড়ে তোলার শপথ নিবে।

আজ সেই স্বপ্ন সত্য হওয়ার পথে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ১৭০টি পাঠাগারের চার শতাধিক লোক একত্রিত হচ্ছে, যারা কাজ করেন পাঠাগারকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বানাতে, যারা স্বপ্ন দেখেন বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে গ্রামে পাঠাগার গড়ে তুলতে। যারা পাঠাগার দিয়ে অন্ধকার দূর করতে, বীরের রক্তস্নাত বাংলাকে বিশ্বের আঙিনায় অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান।

জ্ঞাননির্ভর ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা মানুষের বহুদিনের। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সমাজের সর্বস্তরে চিন্তার একটি ঐক্যসূত্র অত্যাবশ্যক। 'পাঠাগার হোক গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়' এ শ্লেণ্ঢাগানকে সামনে রেখে বাংলাদেশে বেসরকারিভাবে যে পাঠাগারগুলো গড়ে উঠেছে সেসব পাঠাগারের সংগঠকদের সঙ্গে পারস্পরিক ভাব বিনিময়, যোগাযোগ বৃদ্ধি, সাংগঠনিক নানা সমস্যা নিয়ে মতবিনিময়, সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া তুলে ধরা এবং পাঠাগারগুলোর সঙ্গে চিন্তার ঐক্যসূত্র গড়ে তোলা ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়ে আমরা ৩ দিনব্যাপী পাঠাগার সম্মেলনের অংশ হিসেবে নবীণ-প্রবীণ লেখকদের ভাবনাকে সমন্বয় করে আমরা এই সংকলনটি প্রকাশ করছি।

আমাদের অপেশাদারিত্ব, সময়ের স্বল্পতা, কারিগরি অদক্ষতা, সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি নানা কারণে সংকলনটিতে অনেক ত্রুটি রয়ে গেল। আশা করি, আপনাদের উদারতা দিয়ে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

সম্মেলনকে সফল করতে যারা মানসিক, শারীরিক, অর্থনৈতিকসহ নানাভাবে পাশে দাঁড়িয়েছেন তাদের সবার প্রতি জানাচ্ছি আন্তরিক ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা। আশা করি, আগামীতে এ ধরনের সম্মেলন দেশের নানা প্রান্তে আরও হবে। জ্ঞান ও ন্যায়ভিত্তিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে এই পাঠাগার সম্মেলন হয়তো আমাদের পথ দেখাবে।

জয় হোক গণমানুষের!
জয় হোক পাঠাগার সম্মেলনের!

আবদুস ছাত্তার খান
আহ্বায়ক, সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি ২০২২
সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলন

সদস্য সচিব এর বাণী

আত্মপ্রত্যয় আর আত্মবিশ্বাস যে কোন জনপদের মানুষকে কঠিকতম কাজে আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহী ও শেষ পর্যন্ত লেগে থেকে কাজটি সমাপ্ত করতে শক্তি দান করে। আর সেই উৎসাহ আর শক্তি যদি সংগঠিত হয়ে কাজ করে তবে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুণে বেড়ে যায়। তবে সেই কাজের উদ্দেশ্য শুভ নাকি অশুভ হবে সেটি নির্ধারিত হয় ঐসব সংগঠিত মানুষের বোধ ও বিদ্যা দ্বারা। বোধের জাগরণ ও বিদ্যার প্রসার করে যদি কোন জনপদের মানুষের সংগঠিত করা যায় তবে ঐ জনপদের বহুমুখী কল্যাণসাধনসহ সংকট মোকাবেলা করতে তারা সক্ষম হবে।
তাই আমরা বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে সমৃদ্ধ করতে ও সংকট মোকাবেলা করতে বেছে নিয়েছি পাঠাগার আন্দোলন। প্রতি গ্রামে হোক একটি পাঠাগার' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন'। এই চলমান আন্দোলনেরই একটি প্রয়াস 'পাঠাগার সম্মেলন-২০২২' যেটি আয়োজন করতে আমরা গঠন করেছি 'সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলন'। বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে পাঠাগার গড়ে তোলার আত্মপ্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস জাগানোর একটি শক্তিঘর হিসেবে এই সম্মেলন ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আর ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা পাঠাগারসমূহের মধ্যে একটি নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক নির্মাণ করে একটি পরম আত্মীয়তা সৃষ্টি করবে যা থেকে দেশ গঠনের নতুন স্বপ্ন তৈরী হবে, বাস্তবায়নের শক্তি উৎপাদন হবে।

যারা আমাদেরকে এই আয়োজনটি করতে নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি রইলো অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা ও নির্মোহ ভালোবাসা।

জুলিয়াস সিজার তালুকদার
সদস্য সচিব, সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটি ২০২২
সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলন

গণতন্ত্র, গণশিক্ষা ও গণগ্রন্থাগার

ফজলে রাব্বি

গ্রন্থ নিয়েই গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থই শিক্ষার প্রধান উপকরণ। তাই গণগ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনা করতে গেলে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসঙ্গটি অনিবার্যভাবে এসে যায়। শিক্ষাব্যবস্থা ও গণগ্রন্থাগার একে অপরের পরিপূরক। কেবল তাই নয়– গণতন্ত্র, গণশিক্ষা ও গণগ্রন্থাগার একে অপরের পরিপূরক। উল্লেখ অবান্তর, বাংলাদেশে এই তিনটির কোনোটিই যথাযথ নেই। অথচ স্বাধীন রাষ্ট্র যে-ক্ষমতা তার শাসকদের দিয়েছিল তা দিয়ে এই তিনটির অন্তত যেকোনো একটিকে সফল করলেই বাকি দুটো আপন ইচ্ছেয় আলোর মুখ দেখতে পেত। জীবন-জীবিকা নিয়ে ব্যস্তসমস্ত থাকা সময়ে সার্বজনীন হিতকর কাজ করার সদিচ্ছা খুব একটা দেখা যায় না।

শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানের দুটি পদ্ধতি বা ধারা দীর্ঘকাল যাবত প্রায় সকল দেশেই চলে আসছে। এই পদ্ধতি বা ধারার একটি প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপরটি অপ্রাতিষ্ঠানিক। অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয় পরিবার থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আরম্ভ হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে। প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি বেশি কিছু না শিখলেও আশা করা যায় সে তার মাতৃভাষা ভালোভাবে লিখতে ও পড়তে শিখবে, সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে শিখবে। তাই বিশ্বের সকল স্বাধীন দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক। ফলে সাক্ষরতা সেসব দেশে ক্রমান্বয়ে বাড়তে বাড়তে শতভাগ সফলতার দিকে এগিয়ে যায়। যারা শিক্ষাক্ষেত্রে এই প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করে আর অগ্রসর হতে পারে না, তখন তারা অগ্রসর হয় গ্রন্থাগারের সহায়তায়। তাই গণগ্রন্থাগারকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য– স্বাধীন দেশে যে-সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন, সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্তন আজও আমাদের দেশে ঘটে নি। শিক্ষার সুযোগ ও অধিকার সকলের জন্য সমান হয় নি। শিক্ষা কেন সর্বজনীন হয় নি সেই কারণও আমরা যথাযথ নির্ণয় করতে পারি নি। বরং শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষ, নাকি ধর্মযুক্ত অথবা শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা হবে, না অন্য ভাষায় হবে সেটি নিয়েই আমরা তর্ক করে কালক্ষেপণ করেছি। শিক্ষা কেন সর্বজনীন হয়নি সেই কারণ নির্ণয় করতে পারলে হয়তো আমাদের অনেক সমস্যার কারণও নির্ণয় করতে পারতাম। এবং তার সমাধানও খুঁজে পেতাম।

তবে এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে একটু পেছনের ইতিহাস পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। আমরা অনেকেই জানি না ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা প্রচলনের পূর্বে এদেশে একপ্রকার সর্বজনীন শিক্ষার প্রচলন ছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের পর কোম্পানি আমলে ইংরেজরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের দেশে যে-সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থার অবকাঠামো বিদ্যমান ছিল সেই অবকাঠামো ধ্বংস করে দিয়েছিল। একইভাবে তারা আমাদের এই ভূখণ্ডে বিদ্যমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস করে একটি নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ করেছিল, যাতে এই নতুন আর্থসামাজিক অবকাঠামো ইংরেজদের স্বার্থ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারে।

তারই ফসল আজকের কথিত পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা, যে-শিক্ষাব্যবস্থা দেশের আপামর মানুষের জন্য নয়, যে-শিক্ষাব্যবস্থা শাসকবর্গের তথা সরকারের অনুদান আর অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল, যে-শিক্ষাব্যবস্থা একটি শ্রেণীকে অভিজাত ভাবতে শেখায় আর অপর শ্রেণীকে অপাঙ্‌ক্তেয় ভাবতে শেখায়, যে-শিক্ষাব্যবস্থা একশ্রেণির বুদ্ধিজীবীকে সিভিল সোসাইটি ভাবতে শেখায় এবং যে-শিক্ষাব্যবস্থা সর্ব অবস্থায় শুধুই চাকরিমুখী। অন্যদিকে দেশের বৃহত্তর অংশ সামাজিকভাবে উদ্যমহীন পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সেই উদ্দেশ্যে ইংরেজরা যখন তথাকথিত আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করে–সেই ব্যবস্থা ছিল মুষ্টিমেয়

কয়েকজনের জন্য এবং তা করেছিল এদেশের বিদ্যমান সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা বিলুপ্ত করার পর।

অথচ ইংরেজরা নিজেদের দেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন করেছিল এবং ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে; করেছিল সর্বজনীন গণগ্রন্থাগার। এই গণগ্রন্থাগারের কাজ ছিল প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত যারা শিক্ষালাভ করে আর অগ্রসর হতে পারত না, অর্থাৎ যারা আজকের ভাষায় ড্রপআউট, তাদেরকে অধিকতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা। সেজন্য ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে গণগ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয়েছিল। এই আইন প্রণয়নের পেছনে দুজন সংসদ সদস্য ও একজন গ্রন্থাগারিকের অবদান রয়েছে। সেই গ্রন্থাগারিকের নাম এডওয়ার্ড এডওয়ার্ডস। এই গ্রন্থাগারিক তাঁর প্রথমজীবনে ছিলেন সাধারণ একজন রাজমিস্ত্রি। তিনি প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পর আর পড়াশোনা করতে পারেন নি। রাজমিস্ত্রির কাজ শিখে রাজমিস্ত্রি হয়েছিলেন।

তবে কাজের শেষে প্রতিদিন একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে গিয়ে বই পড়তেন। এমনি করে গ্রন্থাগারের বই পড়ে তিনি উচ্চ-শিক্ষিত হন এবং আপন প্রতিভায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরির সহকারি গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত হন। তিনি নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অনুধাবন করেন যে, গণগ্রন্থাগারের প্রয়োজন কী। তিনি গণগ্রন্থগারের জন্য জনমত সৃষ্টি করেন। গ্রন্থাগার আইন পাশ করান। আইনে বলা হয়, প্রতিটি কাউন্টিতে স্থানীয় সরকার স্থানীয়ভাবে কর সংগ্রহ করে গণগ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনা করবেন। সেখানে স্থানীয় সরকার যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা করেন, তেমনই গণগ্রন্থাগার পরিচালনা করবেন। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনো অর্থ দেবে না, অর্থাৎ গণগ্রন্থাগারকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করতে হবে না। সেই আইনই প্রকৃতপক্ষে প্রথম গণগ্রন্থাগার আইন। সেই আইনবলে সে-দেশে গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে।

অপরপক্ষে, পরবর্তীকালে অর্থাৎ সাম্প্রতিককালে বিলেতে সর্বত্র গণগ্রন্থাগার স্থাপিত ও পরিচালিত হওয়ার কারণে পাঠক যেকোনো বই ক্রয় না করে গণগ্রন্থাগার থেকে ধার করে পড়তে পারেন। বইটি কেনার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এর ফলে যখন লেখক মনে করলেন তিনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তখন আরেকটি আইন করা হলো, গণগ্রন্থাগারে কোনো একটি বই যতবার পঠিত হবে সেই বইয়ের লেখক ততবার একটি নির্ধারিত হারে রয়্যালটি লাভ করবেন। সেই রয়্যালটি করলব্ধ অর্থ হতে পরিশোধ করা হবে। এই আইনের নাম 'পাবলিক লেন্ডিং রাইট'। এটি ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে পাশ হয়েছে। বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশে এই আইন প্রণীত হয়েছে। নিজের দেশের পাঠকের জন্য আইন, লেখকের জন্য আইন, দেশের মানুষের উন্নতির জন্য কত আইন তারা প্রণয়ন করেছে! কিন্তু গ্রন্থাগার-আইন প্রণীত হলো না ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষের জন্য।

গণগ্রন্থাগার আইন এমন এক আইন যা প্রণয়ন করতে বা প্রয়োগ করতে কোনো অর্থের

প্রয়োজন হয় না। ভারতবর্ষের জন্য এই আইন প্রণীত হলে ইংরেজ সরকারের বা ভারত সরকারের কোনো অর্থের প্রয়োজন হতো না। তবুও তারা ভারতবর্ষের জন্য এই আইন প্রণয়ন করে নি। পরাধীন ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার-আইন প্রণীত হয় নি। যদিও তার প্রভাবে ভারতবর্ষে তথা বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে আরম্ভ হলো বেসরকারি গণগ্রন্থাগার। এসব গণগ্রন্থাগারই এদেশের প্রাচীন গণগ্রন্থাগার, যেমন– রংপুর সাধারণ গ্রন্থাগার, রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার, যশোর ইনস্টিটিউট সাধারণ গণগ্রন্থাগার, বরিশাল গণগ্রন্থাগার ইত্যাদি পুরাতন মহকুমা ও জেলাশহরে অবস্থিত বেশ কিছু গণগ্রন্থাগার।

তবে ইংল্যান্ডের পাবলিক লাইব্রেরি এবং বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগারের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল, এবং আজও আছে। ইংল্যান্ডের গণগ্রন্থাগারগুলো ছিল প্রকৃতই জনগণের দ্বারা এবং জনগণের জন্য। আর বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগারগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দেশের একটি ক্ষুদ্র অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা, অভিজাত শ্রেণীর জন্য। এ অবস্থা গ্রেটব্রিটেনে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের আইন পাশের পূর্বে বিদ্যমান ছিল। সেখানে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে চাঁদা দিয়ে কিছু গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনা করতেন। আমাদের দেশে সেভাবেই কিছু জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তি নিজেদের প্রয়োজনে এসব গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে আমাদের দেশে জমিদারশ্রেণী নেই, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি অংশ সেই ঐতিহ্য আজও ধরে রেখেছেন।

ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠিত অধিকাংশ গণগ্রন্থাগার স্থানীয় ধনাঢ্য ব্যক্তির দানে ও সহায়তায় স্থাপিত ও পরিচালিত হয়েছে। ইংরেজ সরকার তাদেরকে কোনো আর্থিক সহায়তা প্রদান করে নি। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় বেসরকারি গণগ্রন্থাগারকে সহায়তা অনুদান দিতে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু এর কোনো নির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না। একই ধারায় বাংলাদেশে আজ অবধি নতুন নতুন নীতির ভিত্তিতে সরকারি সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। বারবার অনুদান নীতিমালার পরিবর্তনের কারণে অধিকাংশ বেসরকারি গণগ্রন্থাগার নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসর হতে পারে নি। একইভাবে এই বেসরকারি গণগ্রন্থাগারগুলোর সেবার মান ও পদ্ধতির পরিবর্তন হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে নানাবিধ সমস্যার।

অন্যদিকে আমাদের গণগ্রন্থাগারগুলো সাধারণভাবে ড্রপ-আউটদের জন্য লক্ষ্য করে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। এগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিক্ষিতজনের উচ্চতর মানসিক ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য। অথবা বলা চলে–শিক্ষিতজনের বিনোদনের জন্য। ফলে সাধারণ মানুষ এই গণগ্রন্থাগারের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে নি। তারা একটি মসজিদ বা বিদ্যালয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে, কিন্তু গণগ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারে না। ফলে গণগ্রন্থাগারের পক্ষে তেমন কোনো সামাজিক সমর্থন পাওয়া যায় না। অন্যদিকে আমরা যারা বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের সংগঠক তারা এই সত্য বুঝতে না পেরে পাঠকের ওপর দোষারোপ করি এবং বলি 'পাঠকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে'।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত অর্থাৎ অল্পশিক্ষিত জনগণকে গণগ্রন্থাগারে নিয়ে গিয়ে তাঁদের ক্রমাগত উচ্চ হতে উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারতাম। কিন্তু আমাদের সেই ক্ষমতা নেই। গ্রন্থাগাওে তাঁদের আকৃষ্ট করতে পারি না। এ কারণে আজ গণগ্রন্থাগারে সাধারণ পাঠকের স্বল্পতা একটি বড় সমস্যা। এটাই বাস্তব অবস্থা।

ইংল্যান্ডে কোনো লিখিত সংবিধান নেই। সেখানে কোনো গ্রন্থনীতি প্রণীত হয়েছে বলে জানি না। নিছক আইন প্রণয়ন করে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ব্রিটেনে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। সেই গণগ্রন্থাগার-ব্যবস্থাই বর্তমান যুগের আদর্শ গণগ্রন্থাগার সিস্টেম বা ব্যবস্থা। সে-দেশেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নিয়ে অধ্যয়নের বিষয় গড়ে উঠেছিল, তাকে বলা হতো গ্রন্থাগারবিজ্ঞান। বর্তমানকালে তাকে বলা হয় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান। আমাদের দেশে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ জে. এস. পার্কার দেশের গণগ্রন্থাগার-ব্যবস্থা জরিপ করেন, সেই প্রেক্ষিতে তিনি গ্রন্থাগার আইন পাশ করার প্রস্তাব করেছিলেন। এমনকি আইনের একটি খসড়াও তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন। তথাপি আজ অবধি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করা হয় নি। এর কারণ আমরা জানি না।

ভারতেও এটি একটি সমস্যা ছিল, গ্রন্থাগার বিষয়টি ছিল প্রাদেশিক। আইন পাশ করবে প্রাদেশিক সরকার। যেখানে শিক্ষার হার বেশি সেখানে আগে এই আইন পাশ হয়েছে। যেমন তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ যথাক্রমে ১৯৪৮ ও ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে আইন পাশ করে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাগার আইন প্রণীত ও বলবৎ হয়েছে। তারপর প্রতিটি জেলা, মহকুমা, থানা ও ইউনিয়নে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বিভিন্ন প্রকার গণগ্রন্থাগার রয়েছে। যেমন সরকারি, আধা-সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি গণগ্রন্থাগার। তার সংখ্যা ২,৮০০ এবং রেজিস্টার্ড বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা ২,২০০। মোট প্রায় ৫,০০০ ছোটো-বড় গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে সেখানে। তামিলনাড়ুর এত পরে সেখানে কেন গ্রন্থাগার আইন পাশ হলো? কারণ সম্ভবত শিক্ষার হার তামিলনাড়ুতে অনেক বেশি ছিল।

প্রকৃতপক্ষে বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের সমস্যা অনেক ও বিভিন্ন প্রকারের। কোনো একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে তার সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। এসব সমস্যা সম্মিলিতভাবে সমাধান করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন বাংলাদেশের সকল বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের একটি শক্তিশালী সংগঠন, যে-সংগঠন সকলের পক্ষ থেকে, সকলের পক্ষ হয়ে সরকারের সঙ্গে, অন্য পেশাদার সংগঠনের সঙ্গে এবং সহায়তাদানকারী সংস্থার সঙ্গে এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারে। বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘকাল যাবৎ বিচ্ছিন্নভাবে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আমরা মিলিত হতে পারি নি। যারা দেশের অসংখ্য বেসরকারি গণগ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনা করেন তাদের সম্মিলিত কোনো সংগঠন নেই। অর্থাৎ মূলত গ্রন্থাগার-সংগঠক ও গ্রন্থাগারিকের মধ্যে সম্পর্ক নেই।

গণগ্রন্থাগারকে সেবা দিয়ে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে। উন্নত দেশে বিষয়টি নিয়ে কালক্ষেপণ করতে হয় নি। তারা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গণগ্রন্থাগারকে যুগোপযোগী করে নিয়েছে। সেখানে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আপামর জনগণের প্রয়োজন মেটানোর জন্য। আমাদেরকে একটি জিনিস বুঝতে হবে যে আধুনিক মিডিয়া, টিভি, ইন্টারনেট ও কম্পিউটারের যুগে পাঠাগার বা গ্রন্থাগারের দীর্ঘদিনের প্রচলিত ধারণা পাল্টে গিয়েছে। এককালে গ্রন্থাগার প্রধানত বিনোদন ও গবেষণার কেন্দ্র ছিল। গণগ্রন্থাগারে বিনোদনটাই ছিল প্রধান, কারণ তখন শিক্ষিতজনের বিনোদনের প্রধান উপকরণ ছিল গ্রন্থপাঠ তথা উপন্যাস-পাঠ, কাহিনি ও গল্পপাঠ। একালে সে-গল্প বা কাহিনি আর কষ্ট করে কেউ পাঠ করতে চায় না। অল্প সময়ে বিনা পরিশ্রমে টেলিভিশনে ও সিনেমায় সে সেই কাহিনি দেখে নিতে পারে।

সে-কারণে এখন গণগ্রন্থাগারে বিনোদনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তবে যারা গণগ্রন্থাগার হতে সেই বিনোদন লাভ করতে চান তাদের আকৃষ্ট করার উপযুক্ত পরিবেশ গণগ্রন্থাগারে সৃষ্টি করতে হবে। গল্প-উপন্যাস পাঠের মাধ্যমে যে-বিনোদন সেই বিনোদনের প্রয়োজন কম বলে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি। তার পরিবর্তে সেখানে যুক্ত হয়েছে তথ্যসেবা। আমাদের গণগ্রন্থাগারে তথ্যসেবার অভাব। অথচ তথ্যের চাহিদা রয়েছে প্রচুর, তাই দেখা যায় সকল গণগ্রন্থাগারে সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যাই অধিক। বইয়ের পাঠকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যম কেবল সংবাদপত্র নয়, বর্তমানকালে এর বড় মাধ্যম ইন্টারনেট। আমাদের দেশেও ইন্টারনেট দ্রুত বিস্তারলাভ করছে। এক্ষেত্রে বেসরকারি গণগ্রন্থাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, কিন্তু তাদের অধিকাংশের সেই ক্ষমতা নেই। একদিকে গণগ্রন্থাগারকে সহজে ও সুলভে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে, তেমনই ইন্টারনেট হতে প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করে যার প্রয়োজন তাকে সরবরাহ করতে হবে।

অল্প-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণকে সকল বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার কেন্দ্র হিসেবে গণগ্রন্থাগারকে গড়ে তুলতে হবে। সে-কাজ করতে পারেন গ্রন্থাগারকর্মী বা গ্রন্থাগারিক। তাকে তথ্য-উপকরণ সংগ্রহ করে রাখতে হবে। নিছক চাকরি করে এ কাজ করা যাবে না, সমাজ ও জনমানুষের শিক্ষার প্রতি আন্তরিক তাগিদ অনুভব করতে হবে। গণগ্রন্থাগারকে শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।

শৈশব হতে পাঠাভ্যাস গড়ে ওঠার কথা থাকলেও তা না হয়ে তারা বরং পাঠবিমুখ হচ্ছে। এই প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হবে যেমন করে উন্নত দেশের গণগ্রন্থাগারগুলো করেছে। সেখান থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। বিদ্যালয় ও গণগ্রন্থগার একে অপরের পরিপূরক।

পাঠাগার কোথায়, কীভাবে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

পাঠাগারে জ্ঞান থাকে, অনেক কালের জ্ঞান যেন নীরবে অপেক্ষা করতে থাকে পাঠকের জন্য। ছোটো গৃহে বিরাট আয়োজন।
জ্ঞান জিনিসটা মানুষের জন্য খুবই প্রয়োজন। আহার, বাসস্থান, জামাকাপড়, চিকিৎসা ও শিক্ষার চাহিদা খুব বড়; তাই বলে জ্ঞানের চাহিদাটাও নিতান্ত কম নয়। জ্ঞান না থাকলে তো মানুষ মানুষই থাকে না, আর পাঁচটা প্রাণীর একটিতে পরিণত হয়।

জ্ঞান বই থেকে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় জীবন থেকেও। বইয়ের যে জ্ঞান সেটাও জীবন থেকেই উঠে আসে; এসে সংরক্ষিত থাকে, পড়বে যে তার জন্য। জ্ঞান পাওয়া যায় বিদ্যালয়েও। ভালোভাবেই পাওয়া যায়। কিন্তু বিদ্যালয়ের জ্ঞানপ্রাপ্তির পেছনে একটা প্রাতিষ্ঠানিকতা থাকে, থাকে আনুষ্ঠানিকতা। তাগাদা থাকে পরীক্ষা দেবার, তাগিদ থাকে সনদপ্রাপ্তির। পাঠাগারে সেসব কিছু নেই। সেখানকার জ্ঞানানুশীলন সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক; সেজন্য মুক্ত ও আনন্দমুখর। তবে পাঠাগার যে বিদ্যালয়ের বিকল্প তা নয়; তারা যে পরস্পরের পরিপূরক তাও বলা যাবে না; পাঠাগার বিদ্যালয়ের সঙ্গী, অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু এটাও তো সত্য যে পাঠাগার না থাকলে বিদ্যালয়ের চলে না, যদিও বিদ্যালয় ছাড়াও পাঠাগার চলতে পারে।

পাঠাগার তাই নিজের পায়েই দাঁড়াতে সক্ষম। কিন্তু এখন, চতুর্দিকে যখন উন্নতির মহা হইচই, অবিরাম ত্রস্তব্যস্ততা, তখন পাঠাগারের দশাটা বেশ নড়বড়ে। মূল কারণ জ্ঞানের দামটা এখন কমেছে। সভ্যতার যে অগ্রগতি সেটা কি জ্ঞানের সৃষ্টি ও প্রয়োগ ভিন্ন সম্ভব ছিল? জ্ঞান এসেছে অভিজ্ঞতা থেকে, এসেছে পূর্ববর্তীদের জ্ঞানকে বিশ্লেষণ ও বিচার করে। জ্ঞান বোঝা নয়, জ্ঞান পাথেয়। তেমন পাথেয় যা আনন্দ দেয় সৃষ্টির, মুক্তি দেয় চেনা জগতের চেয়ে অনেক বড় এক জগতে, যুক্ত করে বহু মানুষের সঙ্গে–কাছের, দূরের, জীবিত ও মৃত। অতি সংক্ষেপে বলতে গেলে রক্ষা করে ও বিকশিত করে মানুষের মনুষ্যত্বকে।

এখন তো দেখা যাচ্ছে মানুষের এই মনুষ্যত্বটাই বিপদগ্রস্ত। আক্রমণটা আসছে নানান দিক থেকে। খুব ভালোভাবেই আসছে এই ধারণার প্রচার থেকে যে জ্ঞানের চর্চার এখন আর আলাদা করে দরকার নেই, প্রযুক্তি জ্ঞানকে এনে দিয়েছে আমাদের ঘরের ভেতরেই। বোতাম টেপা পর্যন্ত অপেক্ষা, তার পরেই চলে আসবে ঝরঝর গড়গড় করে। অনুশীলনের আবশ্যকতা নেই, দরকার নেই মাথা ঘামানোর কিংবা হৃদয় দিয়ে বুঝবার।

এই যান্ত্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা ও আলস্য মনুষ্যত্ববিরোধী। এর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো চাই। চর্চা চাই আনন্দের, মুক্তির আকাঙ্ক্ষার, সৃজনশীলতার। আর দাঁড়াবার একটা উপায় হচ্ছে পাঠাগার

গড়ে তোলা। নতুন নতুন পাঠাগার চাই, চাই পুরাতন পাঠাগারকে সজীব করা।

কিন্তু কী করে সেটা সম্ভব হবে? উপায়টা কী? উপায় রয়েছে পাঠাগারকে কেবল পাঠাগার না রেখে সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ভেতরে। পাঠাগারে বই থাকবে, অবশ্যই। কিন্তু বইগুলো মৃত কিংবা অর্ধমৃত অবস্থায় থাকবে না। তারা প্রাণবন্ত রইবে; পাঠক পড়বে, কেবল পড়বে না রীতিমতো হৃদয়ঙ্গম ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করে নেবে। পাঠাগারে বইয়ের আদান-প্রদান ঘটবে। কোন বইয়ে কী আছে, কোথায় কোন নতুন বই পাওয়া যাবে, পুরাতন বই অপেক্ষা করছে পঠন ও আলাপনের জন্য, এসব নিয়ে কথাবার্তা চলবে।

পাঠাগারকে কেন্দ্র করে আলোচনাসভা হবে, আয়োজন করা হবে নানা ধরনের প্রদর্শনীর ও বক্তৃতার, ব্যবস্থা থাকবে গানের, নাট্যাভিনয়ের। উদযাপন চলবে বিশেষ বিশেষ দিবসের। প্রতিযোগিতা চলবে নানা রকমের। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীও বাদ থাকবে না। এমনকি দেয়ালপত্রিকাও প্রকাশ করা যেতে পারে। মুদ্রিত পত্রিকা তো আরও ভালো। পাঠাগারের সামনে যদি খোলা জায়গা থাকে তবে সেখানে খেলাধুলার ব্যবস্থা করাটাও অসম্ভব হবে না।

বিকেল হলে মানুষ রওনা হবে পাঠাগারের দিকে। আসলে পাঠাগার তো একটা সংস্কৃতিকেন্দ্রই হবে। আসবে শিক্ষার্থী, আসবেন শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী। অবসরভোগী মানুষেরা আসবেন। মেয়েরাও আসবে। সন্ধ্যা হলে সর্বত্র এখন যে বিষণ্নতাটা নেমে আসে, দেখা দেয় ছোটো ছোটো ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সব যন্ত্রপাতি দিয়ে বিনোদন খোঁজার অসুস্থ ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন তৎপরতা সেটা আর ঘটবে না। মানুষ সামাজিক হয়ে উঠবে। আর এটা তো কোনো একটা পাঠাগারের ব্যাপার হবে না, ব্যাপার হবে সকল পাঠাগারেরই, পাড়ায় মহল্লায় সমস্ত দেশ জুড়ে। সব মিলিয়ে একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটার সম্ভাবনা।

সংস্কৃতির এই ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। সংস্কৃতি আসলে সভ্যতার চাইতেও স্থায়ী। তাই দেখা যায় সভ্যতার পতনের পরও সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান টিকে যায়। সংস্কৃতির ভেতর জ্ঞানও থাকে। এবং সংস্কৃতিতে খুব ভালোভাবে যেটা থাকে তা হলো সামাজিকতা। অত্যন্ত আবশ্যক এই যে সংস্কৃতি তা আদান-প্রদান ও মেলামেশার মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে ও বিকশিত হয়।

সাংস্কৃতিক কাজ আসলে মনুষ্যত্বকে রক্ষা করারই কাজ। সেজন্য তাকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। এই যে মানুষ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, হতাশ ও বিষণ্ন হয়ে পড়ছে, হিংগ্রতা ও ভোগবাদিতা একে অপরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, এর কারণ সংস্কৃতির সুস্থ চর্চা নেই। ওদিকে বিকৃতির আক্রমণ কিন্তু ঠিকই চলছে। আসছে তা ইন্টারনেট, ফেসবুক ও মুঠোফোনের মাধ্যমে; আসছে ধর্মীয় ওয়াজের আবরণের ভেতর দিয়েও।

পাঠাগারগুলোকে সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র করা গেলে এলাকার মানুষ জানবে বিকেলে ও সন্ধ্যায়

কোথায় যেতে হবে। সেখানে যাবে, পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হবে, আনন্দ পাবে, এবং রক্ষা পাবে বিবরবাসী করবার যে-চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলছে তার হাত থেকে।

কিন্তু কারা করবে এই কাজ? করবে তারাই যারা মনে করে পরিবর্তন দরকার, পরিবর্তন সম্ভব এবং পরিবর্তন না ঘটলে অন্ধকার আরও বাড়বে, এবং আমরা আরও তলিয়ে যেতে থাকব। এরকমের হৃদয়বান মানুষ সমাজে অনেক আছেন। তাঁদেরই কর্তব্য এই কাজে সংঘবদ্ধ হওয়া।

যা বলছিলাম, এইরকম একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ সৃষ্টির জন্য পাঠাগার অত্যন্ত উপযোগী। কারণ পাঠাগারে একটি জায়গা পাওয়া যাবে, তার আশেপাশে খোলা পরিসর পাওয়া যেতে পারে–ভবনে যেমন তেমনি ভবনের বাইরেও। সাংস্কৃতিক কাজটা কিন্তু উদ্দেশ্যবিহীন হবে না। উদ্দেশ্য হবে অবস্থাকে বদলানোর; পুঁজিবাদের দৌরাত্ম্যের বিপরীতে নতুন এক সামাজিকতা সৃষ্টি করার। সামাজিক না হলে আমাদের মনুষ্যত্ব যে রক্ষা পাবে না এ নিয়ে তো কোনও সংশয় নেই।

ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বইয়ের মানুষ আবদুল্লাহ আবু সায়ীদঃ একজীবনে অনেক জীবন

মামুনুর রশীদ

প্রকাশঃ ২৯ জুলাই ২০২২,প্রথম আলো

মানুষটি ছুটতে ছুটতে একসময়ে কিংবদন্তি হয়ে গেছেন। একরৈখিক মানুষ তিনি নন, বহুমাত্রিক তাঁর কর্মযজ্ঞ। আর তাঁর জীবনের নেই কোনো অবসর। নিত্যদিন তাঁর মনে নতুন নতুন ভাবনা জেগে ওঠে, যা আমাদের নতুনভাবে বেঁচে ওঠার স্বপ্ন দেখায়। এই স্বপ্নবান মানুষটি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। ৮২-তে পৌঁছেও তাঁর বয়স বাড়ে নি, ১৮ থেকে ১৯-এ আটকে রেখেছেন নিজেকে। তাই তাঁর গোঁফের পরিধি কমে নি, সুদূরের স্বপ্নের হাতছানিভরা চোখটাও পাল্টে নি, শুধু বয়সের সংখ্যাটি বেড়েছে।

সংস্কৃতি নির্মাণে যেকোনো মানুষের প্রয়োজন সঠিক বোঝাপড়া। সেইজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া শেষ করেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ ঢুকে গেলেন নিজের আরাধ্যকর্মে–শিক্ষকতায়। তিনি ভাবতেন, শিক্ষাটা শুধু পাঠক্রম বা শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, শিক্ষা হবে মানুষের সংস্কৃতি নির্মাণের বাতিঘর। আর তার জন্য প্রয়োজন মানুষ। সতীর্থ, ছাত্র, সহকর্মী সবাইকে এ-বিষয়ে ভাবাতে হবে। সেই লক্ষ্যেই তিনি শুরু করলেন কাজ। প্রথমে একলা চলো অভিপ্রায় নিয়ে শুরু, পরে তাঁর যাত্রাপথের সাথি হলো বহুজন।

বিশেষত তখন যাঁরা ছাত্র, যাঁরা নবীন, তাঁদের পাশে পেলেন তিনি। সেই যাত্রায় তিনি ভাবলেন, নতুন সাহিত্য চাই, আধুনিক সাহিত্য। তবে আধুনিক সাহিত্যের জন্য তো প্রয়োজন নতুন লেখক, যাঁরা নতুন করে আবিষ্কার করতে চান নিজেকে। এই ভাবনার গুটিকয় মানুষকে নিয়ে যাত্রা শুরু হলো নতুন সাহিত্যের।

বহু কষ্টে দিনের পর দিন হেঁটে, প্রেসের নির্ভুল প্রুফ দেখে সায়ীদ ভাই প্রকাশ করলেন কণ্ঠস্বর-এর মতো উন্নতমানের সাহিত্য-পত্রিকা। কিন্তু পত্রিকার জন্য লেখা চাই, অর্থ চাই। তবে অর্থ অনিশ্চিত, লেখাও তাই। ফলে অনিশ্চিত যাত্রাপথে আবার সাথিদের জাগ্রত করলেন তিনি। বলা বাহুল্য, এই জাগ্রত করার কাজটি দীর্ঘদিন ধরেই তিনি করেছেন, সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে যখন শুরু করেছিলেন, তখন থেকেই। শিক্ষকতার শুরু থেকেই হয়তো-বা সায়ীদ ভাইয়ের মাথায় ভর করেছিলেন ডিরোজিও। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে মধুর কিন্তু তর্কমূলক একটা সম্পর্ক থাকা দরকার, ছাত্রদের কাছে শিক্ষকের দরজা যদি অবারিত না থাকে, শিক্ষক যদি ছাত্রের বন্ধু হতে না পারে, তাহলে শিক্ষার একটা বড় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়–এসব প্রথম থেকেই জানতেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ।

এখানেই আমরা ষাটের দশকে পেয়ে যাই একজন মুক্তচিন্তার মানুষকে, সংস্কারের অন্ধকার

ভেদ করে যিনি দাঁড়ান আমাদের সামনে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলেন, শ্রেণিকক্ষের বাইরেও 'অপাঠ্য' বই খুঁজতে হবে। তাঁর প্রেরণায় ছাত্র ও সহকর্মীরাও নতুনভাবে চিন্তা করতে শিখলেন। আর নতুন সাহিত্যের পাঠ তো তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আগেই।

এক জীবনে সায়ীদ ভাইয়ের অনেক জীবন। তিনি সাহিত্য সম্পাদক হিসেবে খ্যাতিমান, লেখক হিসেবে অনুকরণীয়, শিক্ষক হিসেবে অনুপ্রেরণাদায়ী, উপস্থাপক হিসেবে ঈর্ষণীয় এবং সংগঠক হিসেবে অনন্য। সাংগঠনিক দক্ষতা প্রথম থেকেই তাঁর ছিল। তাই ছাত্র থাকা অবস্থায় তিনি যেমন শিক্ষকদের সঙ্গে এক অভিনব সম্পর্ক নির্মাণের চেষ্টা করেছেন, তেমনি নিজে যখন শিক্ষক হয়েছেন তখন তাঁর ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।

সায়ীদ ভাইয়ের সাংগঠনিক দক্ষতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন সম্ভবত বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, দর্শন এবং উন্নত বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনার আশ্রয় হলো এই বিদ্যায়তন। এর শুরু একেবারে ছোট্ট পরিসরে, তারপর আস্তে আস্তে বড় হওয়া। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, একজীবনে তিনি যত কাজ করেছেন, তার কোনোটিই জনবিচ্ছিন্নতার মধ্যে ভাবেন নি। সব সময়ে তারুণ্য আর সম্ভাবনাময় মেধার সমন্বয়ে এগিয়েছেন–কখনো ধীরে, কখনো দ্রুতগতিতে। শিল্পের সব শাখায় বিচরণ করেছেন অনায়াসে।

একবার আমরা বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পুরোনো ইসফেনদিয়ার মিলনায়তনে নাটকের মঞ্চ গড়ে তুলেছিলাম। মঞ্চটি জমেও উঠেছিল। বেশ কিছু প্রদর্শনী হলো। কিন্তু সায়ীদ ভাই একসময়ে সেটি বন্ধ করে দিলেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র শুধু নাটকের মিলনায়তন হোক এটা তিনি চান নি। তাঁর এই আচরণে আমরা সেদিন খুব অবাক হয়েছিলাম। যে সায়ীদ ভাই নাটক দেখেন, নাটক নিয়ে বিস্তর কথা বলেন, একদা 'ফেরদৌসী' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, তখন বুঝি নি তিনি কেন এমন করলেন!

সেই ষাটের দশকে সায়ীদ ভাই আমাদের অ্যাবসার্ড থিয়েটারের কথা বলেছেন। আয়োনেস্কোর চেয়ার নাটকটি আমাকে দিয়েছিলেন পড়ার জন্য। নাটকটি সে-সময়ে বুঝি নি অবশ্যই। সাহিত্যে জাদুবাস্তবতার কথা যখন তিনি আমাদের বলেছিলেন, তখন মনে হয়েছিল এই সাহিত্যের তিনিই নায়ক। কারণ, অবিশ্বাস্য সব ঘটনা তিনি অবলীলায় ঘটিয়ে চলেছেন।

অথচ নাটকের প্রদর্শনী হবে–এটা করতে দিলেন না? পরে জানলাম, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নতুন ভবনে একটি মঞ্চ হবে। সেটি হলোও বটে, কিন্তু মঞ্চটি অভিনয় উপযোগী নয়। এ-ক্ষেত্রে সায়ীদ ভাইয়ের সহজ উত্তর, "নাটক একটা সর্বগ্রাসী মাধ্যম। এর মধ্যে এত মায়ামমতা, ভালোবাসা, দ্বন্দ্ব রয়েছে, সেখান থেকে চেষ্টা করলেও বেরিয়ে আসা যায় না। তাই নাটকের যে ইন্টেলেকচুয়াল দিকটা আছে, সেটাই হবে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বিষয়।

সংগীত, চিত্রকলা, নৃত্য–এসবের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।"

সায়ীদ ভাই সব জায়গায় উপস্থিত করেছেন নতুন ব্যাখ্যা, নতুন ভাবনা। একসময় নতুন ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথকে তিনি হাজির করেছেন 'দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যকর্মের মধ্যে দুর্বলতা খুঁজে তা প্রকাশ করার সাহস সহজ নয়। অথচ সায়ীদ ভাই এই কাজটি করেছেন অনেক আগে। রবীন্দ্রনাথের বিশাল সমর্থক, পাঠক–সর্বোপরি মধ্যবিত্তের জীবন-ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেভাবে জায়গা করে নিয়েছেন, সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে ছোটোখাটো আঘাতও অনেক বড় হয়ে দেখা দেয়। এ-ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্যে চোখ রাখা যেতে পারে, "দুর্বলতায় রবীন্দ্রনাথ তারুণ্যজনিত দুরুক্তিতে ভরা, এটাই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রথম প্রবন্ধ, যা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর অনেক যুক্তি শিবনারায়ণ রায় ও বুদ্ধদেব বসুর রচনা থেকে আহৃত হলেও ভিতরে ভিতরে সায়ীদ তাঁর নিজস্ব কিছু মন্তব্য গেঁথে দিয়েছিলেন।
রবীন্দ্রনাথে বাস্তবতার অভাব, শারীরিকতার অভাব, কবিত্বের প্রতি উন্মুখিতা, বন্দিত জীবনদেবতা–এই সবকেই আর একবার অতীব্র আক্রমণ করেছিলেন সায়ীদ। যুগে যুগে অবশ্যই নতুন নতুন রবীন্দ্রবিচার চলতেই থাকবে; রাবীন্দ্রিক অভাবগুচ্ছেরও শনাক্তকরণ ও বীথিকরণ আমাদের জন্য অপ্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু তার জন্য চাই সুস্থ শান্ত দৃঢ় যুক্তিপূর্ণ শিল্পবিবেচনা, আবেগীনির্মুক্তি নয়। এই বোধ অচিরকালের মধ্যে রোজগার করে নেন সায়ীদ এবং তাঁর উত্তরকালিক রবীন্দ্রবিচার 'সান্ধ্যসঙ্গীতের রবীন্দ্রনাথ' ও 'প্রভাতসঙ্গীতের রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধদ্বয়ে সুশান্তও নিরুত্তেজ, গুণগ্রাহী ও বিশ্লেষণশীল হয়ে উঠেছে।"

দেশ ও বিদেশের আধুনিক সাহিত্যের ভাবনায় তত দিনে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে। অবিচল, অদম্য প্রাণশক্তি নিয়ে তিনি এগোতে শুরু করলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, চরম ব্যর্থতা ও হতাশার মধ্যেও তিনি নতুন একটা চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করতে পারেন। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বিভিন্ন সাংগঠনিক পর্যায়ে সব সময়ে যে সবকিছু ইতিবাচক হয়েছে তা নয়, আশাহত হওয়ার ঘটনাও ঘটেছে–বাঙালি জীবনে যা স্বাভাবিক। এই সব ঘটনাপ্রবাহের অভিজ্ঞতা থেকেই আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন *সংগঠন ও বাঙালি*। এই বইয়ে বাঙালির চরিত্রের মধ্যে সাংগঠনিকতার যেসব দুর্বলতা আছে, তা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে আলস্যপ্রবণ বাঙালির জীবনকে কত যে নান্দনিকভাবে তিনি উপস্থিত করেছেন! তবে তাঁর সহকর্মী ও শিক্ষার্থীরা জানেন, এর মধ্য থেকেই তিনি শক্তি অর্জন করেছেন তিল তিল করে।

বাঙালিকে পাঠাগারের সীমানায় নিয়ে আসার জন্য একদা সায়ীদ ভাই চালু করলেন ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার। চারদিকে কাচ দিয়ে ঘেরা একটা বড় ট্রাকের মধ্যে সুন্দর করে সাজানো বইগুলো শিশু-কিশোরদের দ্রুত আকর্ষণ করল। এ যেন হ্যামিলিনের বাঁশিওয়ালার কাচের ঘর। এখন বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়িভর্তি বই নিয়ে ভ্রাম্যমাণ এই পাঠাগার পৌঁছে যায়।

একজীবনে এই যে অনেক জীবনযাপন করলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, এর মধ্য দিয়ে তিনি আসলে কী করলেন? মানুষের চিত্তের উৎকর্ষ সৃষ্টিতে যেমন কাজ করলেন, একইভাবে নিজের সমুদয় কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করলেন এক ঐন্দ্রজালিক তরঙ্গ, যে তরঙ্গের ভেতর দিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে দেশ। আর লাখো মানুষের মনের গহিনে তিনি গড়ে দিয়েছেন অন্য রকম এক পৃথিবী। আমরা যাঁরা তাঁর এই পৃথিবীর সূচনাকালের প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁরা দেখেছি এক স্বপ্নবান তরুণ শিক্ষককে, সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবি, কটি ও চাদর নিয়ে যিনি হাঁটছেন, একের পর এক দুস্তর পারাবার অতিক্রম করছেন।

অবশ্য সায়ীদ ভাইয়ের ক্ষেত্রে হাঁটাটা রীতিমতো ওষুধের কাজ করে। তিনি বলেন, 'জ্বর হলে আমি হাঁটি, হাঁটলে জ্বর সেরে যায়।' আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এভাবে হাঁটতে হাঁটতেই নতুন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, উৎকর্ষমণ্ডিত, মননশীল, সাহিত্যমনস্ক, স্বপ্নবান মানুষ তৈরি করেছেন যুগ যুগ ধরে। যে গুটিকয় মানুষ পৃথিবীর তাবৎ দর্শন পাঠ করে জীবনের পথকে ভূয়োদর্শনের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন, তাঁদের হাতে থাকে জগতের পরিবর্তনের চাবি। সবশেষে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'ভূততত্ত্ব'র কথা দিয়ে শেষ করি।

'ভূতে পাওয়া একজনকে নিয়ে আরেকজনের কথা' শিরোনামে এই লেখা তিনি লিখেছিলেন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের উদ্দেশে, "কাঁধে যদি ভূত চাপে তাহলে স্থির থাকা অসম্ভব হয়, সায়ীদ সেটা জানেন, আর ভূতের সংখ্যা যদি একাধিক হয় তাহলে কী ঘটে, তার একটা দৃষ্টান্ত আমার ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে। তবে ভূতে পাওয়া জিনিসটা যে সব সময়ই খারাপ, তা মোটেই নয়। কোনো কোনো ভূতের স্বভাবচরিত্রটা বেশ ভালো। ওই ধরনের ভূতপ্রাপ্তদের সংখ্যা বাড়ুক। তাদের জয় হোক।"

বই এবং
আন্দালিব রাশদী

বই মৃত। পঞ্চদশ শতকের প্রযুক্তিকে পৌরসভার আবর্জনার গাড়িতে তুলে দিন–এমন ভয়ংকর কথা শুনলে আমার মতো কাগজ-ছাপা বইয়ের পাঠক মেজাজ তো খারাপ করবেনই। প্রথম ছাপাখানার কারিগর গুটেনবার্গের (Gutenberg) আত্মা রেগেমেগে অমন কথা যিনি বলবেন তার ঘাড়ও মটকে দিতে পারেন!

ছবি: কাদার ট্যাবলেটে সুমেরিয়ান ভাষার বই খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০-২২০০

যখন কাদামাটি কিংবা ধাতব প্লেটে বই লেখা হতো সেই লেখকরাও শুরুতে ভাবেন নি যে, প্যাপিরাস এসে ভারী ভারী এক একটা বই হঠিয়ে দিয়ে কম পরিসরের বই হিসেবে বছরের পর বছর টিকে থাকবে।

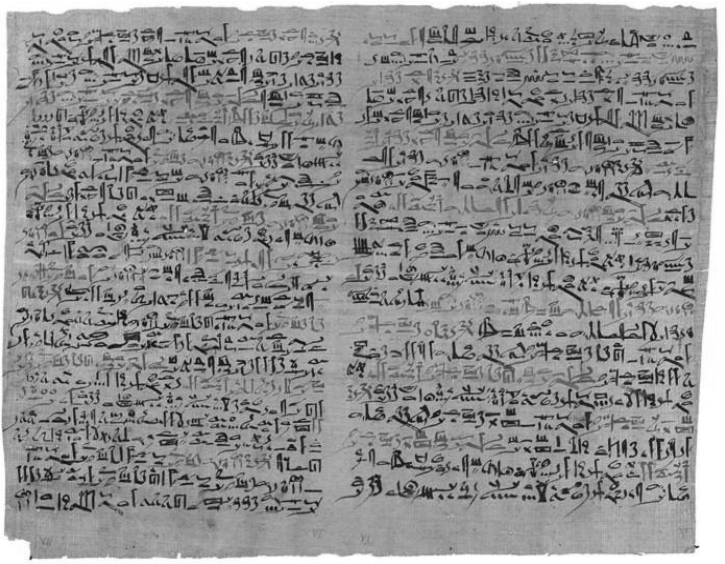

ছবি: প্রাচীন মিশরে প্যাপিরাসে লিখিত চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রথম বই

বহনযোগ্য ধাতব টাইপ ব্যবহার করে ১৪৫৫ খ্রিস্টাব্দে একালের প্রথম বই 'গুটেনবার্গ বাইবেল' প্রকাশিত হয়। টাইপ তৈরির জন্য জন্য যে মণ্ড তৈরি করা হয় তাতে শিসা, টিন ও অ্যান্টিমনি ব্যবহার করা হয়।

ছবি: নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত গুটেনবার্গ বাইবেল

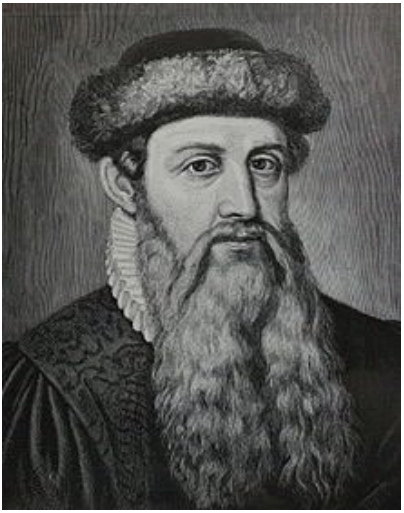

ছবি: ইউহানেস গুটেনবার্গ (১৩৯৮–৩ ফেব্রুয়ারি ১৪৬৮)

জার্মানির ইউহানেস গুটেনবার্গ বিপ্লব, রেনেসাঁ, রিফর্মেশন, দ্য এজ অব এনলাইটেনমেন্ট ও সাইন্টিফিক রেভুলিউশনের পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। তারপর ৫৪০ বছর কেটে যায়। মুদ্রণশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। তারপরও বই কিন্তু কাগজ, ছাপাখানা, বাঁধাই–এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নি।

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না কিন্তু দেখা যায়, পড়া যায় এবং সযত্নে রেখেও দেওয়া যায় এমন একটি বই বিক্রি হলো। বইয়ের লেখক ডগলাস হফসতাদার (Douglas Hofstadter), বইয়ের নাম Fluid Concepts of Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Thought. এত দিনে কি তবে গুটেনবার্গ প্রযুক্তি বাস্তব হুমকির মুখে পড়ল!

গুটেনবার্গের মতোই একটানা লেগে থেকে যিনি এ-কাজটি করলেন তার নাম জেফ বেজোস (Jeff Bezos) নামের আমেরিকান এক যুবক, তাঁর জন্ম ১২ জানুয়ারি ১৯৬৪। তিনিই 'আমাজন ডট কম'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে, মাত্র দু-বছরের মাথায় আমাজন দাবি করে বসল যে এটা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান। খানদানি বইয়ের দোকানগুলো চটে গেল। বার্নস অ্যান্ড নোবেল মিথ্যাচারের অভিযোগ এনে আমাজনের বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে দিল ১৯৯৭-র মে মাসে। তাদের দাবি এটা আদৌ কোনো বইয়ের দোকান নয়, বরং জেফকে বলা যায় বইয়ের

দালাল। ১৯৯৮-তে ওয়ালমার্ট মামলা করল এই দাবিতে যে, আমাজন তাদের ব্যবসায়ের গোপন সূত্র চুরি করেছে।

ছবি: জেফ বেজোস

জেফ বেজোস তখন এমনিতেই 'ত্রাহি মধুসূদন' অবস্থা। মামলার কারণে নয়, ক্ষতি সামলে উঠতে পারছেন না। এরই মধ্যে টাইম ম্যাগাজিন আর্থিক দৈন্যদশায় ডুবে থাকা মানুষটিকে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'পার্সন অব দ্য ইয়ার' ঘোষণা করল। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বইয়ের দোকানের মালিকরা স্থানীয় ট্যাক্স অফিসের স্বীকৃতিটুকু কেবল পেয়েছেন, আর টাইম ম্যাগাজিন আমাজনের মালিক হিসেবে তাকে 'বছরের সেরা ব্যক্তি' নির্বাচন করেছে!

দ্য গার্ডিয়ানের সমীক্ষায় (২০০৮) পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি বইয়ের দোকান হচ্ছে:

১০. হ্যাচার্ড (১৯৯৭-তে প্রতিষ্ঠিত, লন্ডনের পিকাডিলিতে)
৯. কিবুনসিয়া (জাপানের কিয়োটোতে)
৮. এল পেনডুলো (মেক্সিকো সিটি)
৭. পোসাডা (ব্রাসেলস)
৬. স্কার্থিন বুকস (ক্রমফোর্ড)
৫. বোর্ডারস (গ্লাসগো)
৪. সেলেট হেডকোয়ার্টার্স কমিক বুকস্টোর (লস অ্যাঞ্জেলেস)
৩. লিব্রারিয়া (লন্ডন)

২. এল অ্যাটেনিও (বুয়েনস আইরেস)
১. বোয়েখান্দেল সেলেক্সিজ ডোমিনিকানেন (মাসট্রিখট)

গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের তালিকায় পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান নিউইয়র্ক সিটির ফিফথ অ্যাভিনিউর 'বার্নস অ্যান্ড নোবেল' কলেজ বুকস্টোর। ফ্লোর-স্পেসের হিসেবে ধরলে এটিই সর্ববৃহৎ। কিন্তু শেলফ-স্পেস বিবেচনা করলে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বইয়ের দোকান যুক্তরাষ্ট্রের পোর্টল্যান্ডের পলওয়েলস বুকস।

টরন্টোর একটি বইয়ের দোকানের নামই ছিল 'ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট বুক স্টোর।' তিনতলা ভবনের তিনটি তলাতেই মোট ২০ কিলোমিটার শেলফ জুড়ে কেবল বই আর বই। ১৯৮০-তে প্রতিষ্ঠিত এই বইয়ের দোকানটি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়। ভবনটি গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। এখন এখানে চারটি রেস্তোরাঁ নির্মিত হচ্ছে।

আমাজনের ধাক্কা পৃথিবীর সব বড় বড় বইয়ের দোকানে লেগেছে। ২০০১ খ্রিস্টাব্দে আমাজন প্রথম লাভের মুখ দেখে। এখন আমাজনের কর্মচারির সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৫ হাজার। আর জেফ বেজোস পৃথিবীর পঞ্চম শ্রেষ্ট ধনী, সম্পদের পরিমাণ ৭০.৪ বিলিয়ন ডলার। তিনি 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকাটিও অনেক খরিদ্দারকে টেক্কা মেরে কিনে নিয়েছেন। তিনি বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছেন সনাতন প্রকাশনা জগৎকে।

ই-বই ছাপা-বইকে মার দেবেই। ছাপা বই সাড়ে পাঁচশত বছর রাজত্ব করেছে, আর কত?

লাইব্রেরি আন্দোলন প্রসঙ্গে

ম. আ. কাশেম মাসুদ

মানবিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয়, অন্যের মত প্রকাশে প্রবল বাধাসহ ভিন্নমতের প্রতি চূড়ান্ত রকমের অসহনশীলতা এবং নাগরিক অধিকারচর্চার সংকটে আজকের বিশ্ব পূর্বের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সমস্যা-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এসবের অভিঘাতে দেশে দেশে মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীনচর্চার সুযোগও সংকুচিত হচ্ছে। প্রতিনিয়তই আমরা দেখছি আমাদের চারদিকে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক সংঘাত–যা এইসব সংকটেরই প্রতিফলন। আজ প্রত্যেকের জন্য একান্তভাবে প্রত্যাশিত একটি সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যের নাগরিক জীবনযাপনই কঠিন হয়ে পড়েছে। যুগে যুগে এমন সংকট মোকাবেলায় আলোকপ্রাপ্ত সচেতন ও বিবেকবান নাগরিক সমাজই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

উন্নত জাতি, সমৃদ্ধ দেশ সকলেরই কাম্য। সুতরাং সে লক্ষে মানসম্মত সমাজ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূরণে জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে আলোকিত সচেতন মানুষ তৈরি করার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের জাতীয় সংগীতের উল্লেখে বলা যায়–প্রকৃত সোনার বাঙলা গড়ার জন্য সোনার মানুষ তথা সচেতন প্রজ্ঞাবান মানুষ দরকার। মানুষ যদিও প্রকৃতি এবং সমাজ থেকে জ্ঞান অর্জন করে, কিন্তু বই নিঃসন্দেহে আবেগ আশ্রিত জ্ঞানের আধার। জ্ঞানভিত্তিক মানবিক সমাজ ও শোষণ-বৈষম্যহীন রাষ্ট্র গঠন এবং জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টিতে আলোকিত সচেতন মানুষই পারে যথাযথ ভূমিকা রাখতে।

তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের অগ্রগামী নাগরিক সমাজ জ্ঞানভিত্তিক মানবিক সমাজ নির্মাণ করে এই সংকট উত্তরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে, স্বাভাবিকভাবে এটাই আজ সময়ের দাবি। এই ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত নাগরিক সমাজ বিনির্মাণে সারা দেশে বিদ্যমান কয়েক সহস্র লাইব্রেরি গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। ইউনেস্কোর স্বীকৃতমতে লাইব্রেরি জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়। লাইব্রেরি মুনাফাহীন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান। বড় কথা, লাইব্রেরি হতে পারে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম।

বর্তমান সময়ে লক্ষ করা যায়, মানুষ তেমন লাইব্রেরিমুখী হচ্ছে না। বই পড়ার অনাগ্রহতার পাশাপাশি ভার্চুয়াল জগতের প্রতি আকর্ষণ সমাজে মূল্যবোধের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার জন্ম দিচ্ছে। এক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধ উন্নয়নে ও ভবিষ্যতের নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় লাইব্রেরি-আন্দোলন কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। লেখার মান ও লেখকের কল্যাণের বিষয়টিও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনায় উন্নয়নসহ লাইব্রেরিকে আরও সক্রিয় করার ভাবনা থেকে দেশের সর্বত্র লাইব্রেরি-আন্দোলন গড়ে তোলা প্রাসঙ্গিক। এই আন্দোলন দেশে বিদ্যমান সব পর্যায়ের অন্যান্য লাইব্রেরি-সংগঠনের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত রাখবে।

এসব চিন্তাভাবনা বাস্তবায়নে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে তা হলো– পরিশীলিত জীবন গঠনে অপরিহার্য এমন একটি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে সারা দেশের লাইব্রেরিকে ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ আধুনিক মডেল-লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে উঠতে সহযোগিতা করা; এবং বহুমুখী সেবা প্রদানে সক্ষম এমন সমৃদ্ধ লাইব্রেরি-পর্যায়ে উন্নীত করা। সরকারি লাইব্রেরিগুলোর জন্যও সুপারিশ প্রদান করতে হবে। এই লক্ষ্যে লাইব্রেরিসমূহকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণে ও আরও সক্রিয় করে তুলতে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ব-স্ব লাইব্রেরি-এলাকায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নিয়মিত আবৃত্তি, বিতর্ক, বক্তৃতা, শিশুদের হাতের লেখা, ছড়া প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন, নৃত্য ও সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজন; পাঠক সমাবেশ, বিষয়ভিত্তিক সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা, গল্প বলার আসর; এলাকার ডাক্তারের পরিচালনায় স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা ও চিকিৎসাসেবা দেওয়া; এলাকার সম্মানিত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন; বইমেলা ও লোকমেলা প্রভৃতির আয়োজন করা। এ-ছাড়া লাইব্রেরিসমূহকে সমৃদ্ধ করা, যাতে এসব লাইব্রেরি ছাত্রছাত্রী ও জনগণকে প্রয়োজনীয় বইয়ের চাহিদা মেটানো ছাড়াও উচ্চগতির ইন্টারনেট-সেবাযুক্ত সার্ভিস প্রদান, ফটোকপি ও স্ক্যানিং করার সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা নিতে পারে।

লাইব্রেরির ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে লাইব্রেরির বর্তমান অবস্থা, জ্ঞানচর্চা কার্যক্রমের মূল্যায়ন, চাহিদা নিরূপণ, সমস্যা ও সম্ভাবনা জানতে সময়ে সময়ে সারা দেশে জরিপ-কার্যক্রম পরিচালনা করা; 'বেজলাইন সার্ভে'র ভিত্তিতে সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকারি দপ্তর এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে ওয়ার্কশপের আয়োজন করা; লাইব্রেরি কার্যক্রমে বা জ্ঞানচর্চায় সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতপূর্বক কর্মসূচি গ্রহণ করাও সঙ্গত হবে। সারা দেশের লাইব্রেরিসমূহের মান উন্নীতকরণ এবং লাইব্রেরি পরিচালনায় যুক্ত ব্যক্তিদের পেশাদারিভিত্তিক জ্ঞানবৃদ্ধির লক্ষ্যে জেলাভিত্তিক, আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে সমাবেশ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। লাইব্রেরিতে গণশিক্ষা ও সাপ্তাহিক জ্ঞানআড্ডা পরিচালনার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। লাইব্রেরিকে একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

তাছাড়া লাইব্রেরি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জার্নাল, পত্রিকা, বুলেটিন ও বই প্রকাশে ভূমিকা রাখা দরকার। এজন্য যোগ্য সদস্যদের নিয়ে সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা। উক্ত পরিষদ বই ও অন্যান্য বিশেষ প্রকাশনার দায়িত্বপালন ও সম্পাদনা নীতিমালা প্রণয়ন করবে। তাছাড়া লেখক-কল্যাণ এবং গ্রন্থের উন্নয়ন, সৃজনশীল লেখকের বই প্রকাশ ও বিতরণে সহযোগিতা করবে। এজন্য সমবায়-ব্যবস্থা গড়ে তোলা যেতে পারে। আধুনিক মডেল-লাইব্রেরি গড়ে তুলতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। সংগঠনের নিজস্ব জায়গায় আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরি গড়ে তোলা যায়। সেইসঙ্গে একটি প্রশিক্ষণ-কর্মসূচি নিয়মিত পরিচালনা করা এবং একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বিবেচনায় রাখা যেতে পারে। সংগঠনের

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপূরণে যা কিছুই সহায়ক, কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে সেসব বাস্তবায়নে সংগঠন সর্বদাই সক্রিয় ভূমিকা রাখবে। স্থানীয় কমিটি হতে মনোনীত প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠিত হবে। স্থানীয় লাইব্রেরিতেই উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক অফিস স্থাপিত হবে এবং কমিটিগুলো স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত কঠিন কাজ। তাছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের জীবনাচরণও জটিল হয়েছে। মানুষ যেমন সেবামূলক কাজে আর সেভাবে সময় দিতে পারে না, তেমনি ফলাফলও দ্রুত আশা করে। প্রাপ্তির হিসেবটাও অনেকের কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। আরেকটি বিষয় হলো, প্রত্যেকটি লাইব্রেরির নিজেদের মতো করে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কমিটি রয়েছে। সুতরাং সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে নানা প্রশ্ন মনে আসতে পারে। তবে এসব বিষয় সহজেই সমাধানযোগ্য এ কারণে যে, সবাই তো জ্ঞানচর্চা ও সামাজিক কল্যাণের লক্ষ্য নিয়ে সেচ্ছাসেবী হয়েই কাজে নেমেছেন। সুতরাং স্থানীয় উদ্যোগ ও কল্যাণ-কার্যক্রমকে জাতীয়ভাবে বৃহৎ কার্যক্রমে সহযাত্রী করলে সুফল ছাড়া বিতর্কের সম্ভাবনা দেখা যায় না। তাছাড়া জাতীয় কল্যাণ ও লাইব্রেরিগুলোর স্বার্থগত বিষয়ে বৃহৎ ঐক্য না হলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দাবি আদায় সম্ভব হবে না। তাই লাইব্রেরি কার্যক্রমকে অবশ্যই একটি আন্দোলনে রূপ দিতে হবে।

বাংলাদেশে গণগ্রন্থাগার সংক্রান্ত কিছু তথ্য:

লাইব্রেরি বিষয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন প্রণীত হয় ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। এরপরই বাংলাদেশে প্রথমে রংপুরে এবং ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে যশোরে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় 'যশোর ইনস্টিটিউট অ্যান্ড লাইব্রেরি'। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল, রংপুর ও বগুড়ায় এবং ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমান্বয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম গ্রাম-গঞ্জ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমল মিলিয়ে অসংখ্য বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে–যার সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের অধিক। পারিবারিক এবং এনজিও-র উদ্যোগেও অনেক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় সরকারি উদ্যোগও রয়েছে। উল্লেখ্য, লাইব্রেরি মূলত মুনাফাহীন সেবাদানকারী একটি প্রতিষ্ঠান।

সরকারি উদ্যোগে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে 'সোসাল আপলিফট' প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হয় এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ মার্চ ১০,০৪০টি বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় লাইব্রেরিটির দ্বারোদ্ঘাটন হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে এটি শাহবাগ এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে খুলনা ও চট্টগ্রামে এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহীতে বিভাগীয় লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হয়। এসময়ে 'বাংলাদেশ পরিষদ'-এর অধীনে জেলা ও মহকুমায় তথ্যকেন্দ্র ও লাইব্রেরি বিদ্যমান ছিল। ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে সরকার উক্ত বাংলাদেশ পরিষদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে কেন্দ্রীয়, বিভাগীয় ও জেলাসদর মিলিয়ে বর্তমানে

দেশে মোট ৭০টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে বিভাগীয় গ্রন্থাগার ৪টি এবং উপজেলা গ্রন্থাগার রয়েছে ২টি।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বুক সেন্টার, যা স্বাধীন বাংলাদেশে হয় 'বাংলাদেশ বুক সেন্টার'। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে একে আইনের মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করা হয় 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' নামে। এটি মুলত বেসরকারি লাইব্রেরিগুলোতে অর্থ ও বই অনুদান এবং লাইব্রেরিয়ানদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রকাশনা ও কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরস্কারও প্রদান করে।

তথ্য প্রযুক্তির অভাবিত অগ্রগতি: প্রথাগত গ্রন্থাগার টিকে থাকার চ্যালেঞ্জ

অধ্যাপক আফজাল রহমান

যুগ যুগ ধরে সভ্যতার অগ্রগতিতে বিপুল অবদান রেখেছে যে-গ্রন্থাগার, আজ সভ্যতার সুফল তথ্য-প্রযুক্তির প্রভূত উন্নয়নের মুখে সেই গ্রন্থাগার আজ সংকটের মুখে। উন্নত বিশ্বে এই সংকট এসেছে গত এক দশক আগে; তখন থেকেই তারা গ্রন্থাগারের উপযোগিতা বজায় রাখতে যুগের দাবীর আলোকে গ্রন্থাগারের ধরন ও কার্যপরিধি পরিবর্তন করতে শুরু করে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সে-সংকট অর্ধ দশক পরে আমলে নেওয়া শুরু হয়।

আমাদের সবরকম গ্রন্থাগার বিরাণভূমিতে পরিণত হবার প্রেক্ষাপটটি বিবেচনায় আনতে হবে প্রথমে। বাংলাদেশে কেবল পরীক্ষার উচ্চ নম্বরকে মেধা গণ্য করে তাকেই মানবসম্পদ উন্নয়নের একমাত্র মাপকাঠি করে নেওয়া হয়েছে। আজ পরীক্ষায় উচ্চ নম্বরখচিত মেধার উচ্চকিত উৎযাপনের ভিড়ে প্রজ্ঞা, মননশীলতা ও সৃজনশীলতার চাহিদা ও উপযোগিতা হারায়। বিরাণ হয়ে যায় জ্ঞানের আলয় গ্রন্থাগার–সেইসঙ্গে মননশীলতা-সৃষ্টিশীলতার সকল অঙ্গন গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ফলে এমন এক কঠিন সময়ে এসে দাঁড়িয়েছি আমরা।

উন্নততর মূল্যবোধের চর্চা, সামগ্রিক জীবনবোধের প্রেরণাদায়ী গ্রন্থাগার যদি রুগ্ন হয়ে যায় সে-সভ্যতা হয়ে যাবে প্রতিবন্ধী সভ্যতা। যে কারণে তথ্য-প্রযুক্তির অভাবিত অগ্রগতির যুগেও গ্রন্থাগারকে বিরাণ হতে দেয় নি পশ্চিমা বিশ্ব। আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। কিন্তু প্রতিবন্ধী সভ্যতার নানা বিকার আমরা প্রত্যক্ষ করছি জাতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে, নিদারুণ পীড়িত হচ্ছি; আর তখন আমরা ভাবতে শুরু করছি।

Artificial intelligence ডিভাইসগুলো (স্মার্ট ফোন, ট্যাব, কম্পিউটার, টিভি, ভিডিও গেম কনসল ইত্যাদি) আমাদের জীবনকে অধিগ্রহণ করে বসেছে। ব্যক্তির বস্তুজগতের জন্য নিরুঙ্কুশ মনোযোগ অবশিষ্ট নেই, কেননা ভার্চুয়াল জগৎ ব্যক্তির সকল মনোযোগ দখলে নিয়ে গেছে। প্রায় সব পেশার মানুষ দিন-রাতের বেশিরভাগ সময় AI ডিভাইসের বরাতে ভার্চুয়াল জগতের বাসিন্দা। সামগ্রিক জীবনবোধ বা উন্নততর জীবনের সাধনার ফুরসত নাই কারও। ফলে শ্রেয়বোধ, নৈতিক চেতনা ও উন্নততর জীবন-ভাবনার নিদারুণ সংকটের কালে অমন সকল শুভ বোধের সূতিকাগার গ্রন্থাগার আজ এক পীড়াদায়ক অবহেলার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না।

পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে আমাদের জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে। সে-দায় নিয়ে আমাদের গ্রন্থাগারগুলো কার্যকর রাখার বিষয়ে আমার আলোচনা বিস্তৃত হবে।

প্রথম যে বিষয়টি বিবেচনায় আনতে চাই তা হলো আমাদের লাইব্রেরিগুলো গড়ে উঠবার প্রধান অঙ্গীকার কী ছিল? সরকারি পর্যায়ে বা সামাজিক বা ব্যক্তি-উদ্যোগে গড়ে তোলা সকল গ্রন্থাগারের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল গণচৈতন্য উন্নয়ন। তার পাশাপাশি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক জীবন, বৌদ্ধিক জীবনমান উন্নয়ন এবং সমাজ উন্নয়নেও দায় বহন করে আসছে গ্রন্থাগারগুলো। কোনও পরিস্থিতিতেই গ্রন্থাগার তার চিরায়ত দায় অস্বীকার করতে পারে না। জাতি গঠনের যে-দায় গ্রন্থাগারের তা বজায় রেখে পশ্চিমা বিশ্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকের এই সংকট মোকাবেলা করতে হবে আমাদের। আমরা লক্ষ করব দেশেই কোনো কোনো উদ্যোক্তাগোষ্ঠী প্রচলিত গ্রন্থাগারকে যুগের দাবীতে পরিবর্তিত কাঠামোতে নিয়ে কাজের পরিধি বাড়িয়ে গ্রন্থাগারকে কার্যকর করেছেন। উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে অর্থ বিনিয়োগ করে আধুনিক গ্রন্থাগার গড়ে উঠছে আমাদের দেশেও। সেখানে বই পড়ার পাশাপাশি সামগ্রিক বিকাশের নানা আয়োজন যুক্ত করা হয়েছে। সারাদেশে এরকম সামাজিক উদ্যোগের বেশ কিছু পাঠাগার সময়ের চাহিদার সঙ্গে কর্মকৌশল পরিবর্তন করে কার্যকর রয়েছে।

দেশেই কার্যকর পাঠাগারগুলো উন্নত বিশ্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে যুগ-চাহিদার নিরিখে যে-সকল কর্মসূচি যুক্ত করেছে তা নিম্নরূপ:

১। সাপ্তাহিক স্টাডি-সার্কেল বা পাঠচক্র;
২। জাতীয় দিবস উদযাপনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন;
৩। মাদক, বাল্যবিবাহসহ নানা সামাজিক ইস্যুতে জনসচেতনতা সৃষ্ঠির বিভিন্ন আয়োজন;
৪। বাৎসরিক বইমেলা আয়োজন;
৫। বই পড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন;
৬। বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার আয়োজন;
৭। সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশ;
৮। মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা;
৯। মাসিক ধ্রুপদী চলচিত্র প্রদর্শনী;
১০। রক্তদান ক্যাম্প আয়োজন;
১১। স্থানীয় কোনও উন্নয়ন বা সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা সভা;
১২। জাতীয় নেতা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও মনীষীদের জন্ম-মৃত্যু দিবসে আলোচনার আয়োজন;
১৩। সদস্যদের নির্বাচিত ই-বুক, অডিও-বুক সরবরাহ;
১৪। গবেষণা সহায়ক সেল গঠন।

নীলফামারীর ডোমারের শহীদ ধীরাজ মিজান স্মৃতি পাঠাগার, গফরগাঁওয়ের মুসলেহ উদ্দিন পাঠাগার, ঢাকার দনিয়া পাঠাগার, যশোরের ডিহি ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরি, লক্ষীপুরের মাস্টার আইয়ুব আলী স্মৃতি গ্রন্থাগার, সিলেটের আরজদ আলী স্মৃতি গ্রন্থাগার, গোপালগঞ্জের

বীণাপানি গ্রন্থাগার, ঢাকার সীমান্ত পাঠাগার, পটুয়াখালীর আলোর ফেরী পাঠাগার, রসুলপুরের গণচৈতন্য উন্নয়ন পাঠাগার, ভূয়াপুরের গ্রাম পাঠাগারসহ বেশ কিছু পাঠাগারে উপর্যুক্ত কর্মসূচিগুলো পালিত হচ্ছে।

একটি দেশের আর্থসামাজিক সাংস্কৃতিক অবস্থার নিরিখেই গড়ে ওঠে সেই দেশের গ্রন্থাগার। তথাপিও জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক, প্রাযুক্তিক উন্নয়নে পদক্ষেপ নিতে পিছিয়ে থাকে না মুক্তিযুদ্ধের চেতনাপুষ্ট আমাদের এই সরকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সিলেবাসের পাঠ নিশ্চিত করে প্রজন্মকে একাডেমিক শিক্ষাদানের কাজটি করছে। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক দায়িত্বে রয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বেড়েছে। প্রতিটি জেলায় সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলো এখন জেলা শহরের একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপনা। ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি এখন সারা দেশে ছড়িয়ে গেছে।

এখন প্রশ্ন, এই বিপুল আয়োজন জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ার দায়মোচনে কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে? তথ্য-প্রযুক্তির অভাবিত উন্নয়নে এই সময়ে প্রচলিত সকল পাঠাগার প্রবল পাঠক-সংকটে পড়েছে। সমাজশক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেশ কিছু পাঠাগার এই সংকট মোকাবেলা করতে ব্যবস্থা নিয়েছে, অনেক পাঠাগার নতুন নতুন কর্মসূচিও যুক্ত করে নিচ্ছে। তাঁরা যুগ-চাহিদা নিরিখে কর্মসূচি বাড়িয়ে পাঠকদের সক্রিয় করেছে নানান পাঠ ও সহপাঠক্রমিক কর্মসূচিতে। গবেষণায় দেখা গেছে, সমাজশক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলো সময়ের প্রয়োজনে বদলে যাচ্ছে তাদের দেশী ও প্রবাসী পৃষ্ঠপোষকদের উন্নত মনোভঙ্গির সুবাদে।

এখন জেলা গণগ্রন্থাগারগুলোর কর্মপরিধি যুগ-চাহিদার নিরিখে বর্ধিত করা সময়ের দাবী হয়ে উঠেছে। সমাজশক্তির উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারসমূহে যে ১৪টি নতুন চর্চা চালু হয়েছে সেরকম পাঁচটি বিষয় যুক্ত করে হলেও জেলা গ্রন্থাগারগুলো প্রাণবন্ত করার সিদ্ধান্ত নেবার সময় এখন। মনে রাখতে হবে প্রযুক্তি সবার হাতে পৌঁছে গেছে, কিন্তু ব্যবহারকারী সবাই সমঝদার নয় বলে নানা অনাচার ঘটে যাচ্ছে। ফলে এই প্রজন্মকে সামগ্রিক জীবনবোধ ও উন্নত মনোভঙ্গির অধিকারী করতে তাদের পাঠচক্র ও সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্য দিয়ে বিকশিত করতে হবে। এই মৌলিক কাজটিতে জেলা গণগ্রন্থাগার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। জ্ঞানভিত্তিক সমাজ মানে যে-সমাজের মানুষজন সমঝদার, প্রগতিশীল।

প্রজন্মকে নানা পজিটিভ চর্চায় যুক্ত করে পূর্ণ জীবনবোধে প্রাণিত করা গ্রন্থাগারের চিরায়ত যে-দায় তা আজ নতুন বাস্তবতায় নতুন মাত্রায় বিন্যস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, সরকারি গণগ্রন্থাগারের কর্মকর্তা প্রয়োজনের তাগিদে কার্যপরিধি নিজের আগ্রহে বাড়াতে পারেন না। কিন্তু কথা হলো, সরকারি গণগ্রন্থাগারগুলো যেখানে জ্ঞানভিত্তিক উন্নত সমাজ গড়ার কাজ করছে সমাজশক্তিকে নিয়ে, সেখানে আর দশটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের

চেয়ে গণগ্রন্থাগারকে একটু রিলিফ মুডে রাখা দরকার কিনা তেমনটিও ভাবতে হবে। বোধকরি স্বাধীনতার পর একসময় কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রয়োজনে সরকারি-বেসরকারি সচেতন ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি সক্রিয় ছিল।

আজ যুগের দাবীতে গণগ্রন্থাগারের চিরায়ত দায় বেড়েছে, ফলে নতুন বাস্তবতায় নতুন নতুন সিদ্ধান্ত ও কর্মকৌশল নিতে প্রস্তুতি থাকতে হবে। জাতীয় জীবনে যেরকম নানা সংকীর্ণ অনাচার দেখে আমরা প্রায়ই পীড়িত হচ্ছি, তা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে আগামী দিন সারা দেশে আমাদের একটি সাংস্কৃতিক জাগরণ দরকার হবে। এই সাংস্কৃতিক জাগরণে গ্রন্থাগারের ভুমিকা অগ্রগণ্য।

একজন ইউরোপ-প্রবাসীর অর্থায়নে পরিচালিত একটি গ্রন্থাগারে কম্পিউটার স্থাপন করে গ্রন্থাগারকে ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে রেখে সদস্যদেও ই-বুক ও অডিও-বুক দিচ্ছে। অডিও-বুক তৈরিতেও প্রশিক্ষণ নিচ্ছে সদস্যদের কয়েকজন। কোনো কোনো পাঠাগার বিশেষ অ্যাপ. চালু করে কমিউনিটিকে যুক্ত করার মধ্য দিয়ে নানান বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করছে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার পাবলিক পাঠাগার রয়েছে সারা দেশে। নতুন নতুন পাঠাগার তৈরিও হচ্ছে গ্রামে ও শহরে। এখন প্রশ্ন হলো পাঠাগার গড়ে ওঠাই বড় কথা নয়। পাঠাগার পাঠকমুখর থাকা, অনুষ্ঠানমুখর করে রাখাটাই মৌলিক প্রশ্ন।

পাঠাগার আন্দোলনকারীগণ এসব বিষয় নিয়ে প্রতিনিয়ত ভাবছেন, কাজ করছেন। সরকারি গণগ্রন্থাগারে এ-সকল আধুনিক সেবা তথা কর্মসূচি চালু করা খুব কঠিন নয়। গণগ্রন্থাগারগুলোর নিজস্ব ছোটো হলরুম রয়েছে, সেখানে সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক ধ্রুপদী চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর নিয়মিত কর্মসূচি বা আয়োজন রাখা যায়। যেকোনো অনুষ্ঠান করা যায়। সেসব আয়োজনের জন্য প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে অর্থ সংগ্রহ করে ব্যয়ের বিধান যুক্ত করাও দরকার মনে করছেন গ্রন্থাগার আন্দোলনকারীদের একটি অংশ। সরকারি গণগ্রন্থারটিকে জেলা শহরের বুদ্ধিভিত্তিক চর্চা ও সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসাবে কর্মমুখর দেখতে চান সমাজশক্তি। সেরকম পরিবর্তন সময়ের দাবী।

গণগ্রন্থাগারকে যে-বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:
এক. বিভিন্ন বয়সের পাঠকদের গ্রন্থাগারে যুক্ত করা;
দুই. পাঠকদের চাহিদা ও প্রয়োজন উপলব্ধিতে নেওয়া;
তিন. সময়ের দাবী বিবেচনায় নিয়ে নতুন কর্মসূচি নেওয়া;
চার. তরুণ প্রজন্মের পাঠাভ্যাস বৃদ্ধিতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ;
পাচ. সমাজসেবী, বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ বৃদ্ধি;
ছয়. সমাজের নানা পেশার মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বাড়ানো
সাত. পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের মনোভঙ্গি সচল রাখা।

সাম্প্রতিক সময়ে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের পাঠক নানা জেলায় নানা সৃজনশীল কর্মসূচিতে যুক্ত হয়েছে যা খুবই আশাব্যঞ্জক বিষয়। সেসব আয়োজনে পরিবার-প্রধানরা ও সমাজশক্তি উৎসাহ দিচ্ছেন। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে জেলা গণগ্রন্থাগারের কাজের একটি সমন্বয় গড়ে উঠতে পারে। তাতে সমাজশক্তির আস্থা বাড়বে। সমাজে শুভবোধের চর্চা ও অনুশীলন বাড়াতে গণগ্রন্থাগার, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, বেসরকারি গ্রন্থাগার সবাই সক্রিয় হলে সমাজের বর্তমান পরিস্থিতি অবশ্যই বদলাবে। সরকারি-বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহকে কখনও এককভাবে, কখনো-বা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্র তৈরি করতে হবে। দেশের এই বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারা এক বড় চ্যালেঞ্জ। সর্বোপরি উন্নত সমাজের জন্য আবশ্যক যে-উন্নত মনোভঙ্গির মানুষ, সেই উন্নত রুচি ও বোধের মানুষ তৈরিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা চিরকালীন।

সরকারের অনেক মন্ত্রণালয় এ-বিষয়ে কাজ করছে। এই বিপুল জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপায়িত করার আর এই চ্যালেঞ্জ মোকবেলায় সরকারি, সামাজিক সকল প্রতিষ্ঠানকেই সর্বোচ্চ সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সেই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা অব্যাহত রাখতে হবে।

তথ্যপ্রযুক্তির যুগে গ্রন্থাগার

আমিরুল আলম খান

একুশ শতকে দুনিয়ার মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি আমূল বদলে গেছে। আর এ বদলে সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিঃসন্দেহে ডিজিটাল প্রযুক্তির। কম্পিউটার, মাইক্রোচিপস এবং উপগ্রহের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা এ-প্রযুক্তির সারকথা, স্বল্পতম পরিসরে বৃহত্তম ভৌতকাঠামো ধারণের সামর্থ্য ও অতি দ্রুত সেবা প্রদান। এ প্রযুক্তি পরিচালন সহজ, সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য। ডিজিটাল প্রযুক্তি–এককথায় অকল্পনীয় দ্রুততায় সারা বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান, তথ্য, তথ্যবিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ বা নতুন জ্ঞানের সৃজন, বিকাশ, স্থানান্তর, রূপান্তর ইত্যাদি সহজ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এই প্রযুক্তি জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সাধারণ, এমনকি আরণ্যক, জনবিচ্ছিন্ন মানুষের নাগালে এনে দিয়েছে। বলতে গেলে, বর্তমান বিশ্বে হেন কাজ নেই যেখানে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নেই! এ যুগের নাম এখন তথ্যপ্রযুক্তির যুগ।

জ্ঞানের বহু প্রাচীন সংরক্ষণাগার (Repository) হিসেবে গ্রন্থাগারের বিকাশ ঘটে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কয়েক হাজার বছরে যেমন বদলে গেছে বই বা গ্রন্থের সংজ্ঞা; আদল ও সংরক্ষণ-কৌশল; তেমনি বদলে গেছে গ্রন্থাগারের স্বরূপ এবং ব্যবহার-পদ্ধতিও। প্রাচীন আসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, গ্রিক বা মিশরীয় সভ্যতায় প্যাপিরাস, মাটি বা পাথরে, কিংবা লোহা, তামা বা সোনার পাতে লিখে রাজ-অনুজ্ঞা সংরক্ষণের রীতি থেকে আজকের ডিজিটাল যুগে গুগলড্রাইভে তথ্য সংক্ষরণ ও বিতরণ (save and desimination); কিংবা চীনে কাগজ আবিষ্কার বা মুদ্রণ-কৌশল আবিষ্কারের পর জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণে বই, খবরের কাগজ, রেডিও, টেলিভিশনযুগ পর্যন্ত যে-একক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা আবশ্যিক বিবেচিত হতো তার নাম গ্রন্থাগার। রাজদরবার, ধর্মালয় কিংবা বিদ্যায়তনিক গ্রন্থসম্ভার গুটিকয়েক মানুষের হাত থেকে সাধারণ মানুষের হাতের নাগালে আসে গণ-গ্রন্থাগার অভিধায়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো তাকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় (People's university) রূপে স্বীকৃতি দেয়।

কিন্তু আজকের যুগে বিশ্ব-রাজনীতি থেকে ঘর ঝাড়ু দেওয়ার কাজে যেকোনো সহায়তা পেতে মানুষ ডিজিটাল প্রযুক্তি যথা–বহুল কথিত সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল। ইন্টারনেট সংযোগসহ হাতে সাম্যান্য একটা স্মার্টফোন থাকলেই সবকিছু যেকোনো মানুষের আয়ত্তাধীন এখন। গত দশকের শেষভাগে আফ্রিকার নামিবিয়া মোবাইল-ইন্টারনেট সুবিধাকে সে-দেশের শিক্ষাবিস্তারে কার্যকরভাবে ব্যবহার শুরু করে।

যুগে যুগে ব্যবহারিক প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা বদলেছে; জ্ঞানচর্চা ও বিনোদনকে পৃথক ভাবার দিনও শেষ হয়ে গেছে। এই যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রথাগত গ্রন্থাগারের ধারণা ও চাহিদারও পরিবর্তন ঘটেছে। ভেঙে গেছে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অভ্যন্তরে তথ্যানুসন্ধানের

যাবতীয় সুবিধার ধরন। প্রশ্ন উঠেছে, এমন এক তথ্যপ্রযুক্তির যুগে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন কি ফুরিয়ে গেছে, না কি যুগের চাহিদা মিটিয়ে তা টিকে থাকতে পারবে?

বাংলাদেশে গণগ্রন্থাগারের ইতিহাস:

সারা দুনিয়ায় ছোটো-বড় মিলিয়ে ৩,১৫,০০০ গণগ্রন্থাগার আছে বলে একটি হিসেব পাওয়া যায়। এর মধ্যে ৭৩ শতাংশই আবার তথাকথিত পশ্চাৎপদ দেশগুলিতে, যেসব দেশ দ্রুত উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর (Tomas Doherty, 2014)। তার সঙ্গে পারিবারিক ও শিক্ষায়তনিক গ্রন্থাগার যোগ করলে সে-সংখ্যা নিঃসেন্দেহে প্রায় দ্বিগুণ, এমনকি ত্রিগুণ হতে পারে।

ব্রিটিশ পারলামেন্টে পাশ হওয়া পাবলিক লাইব্রেরি অ্যাক্ট, ১৮৫০ অনুসরণে বাংলাদেশে প্রাচীনতম পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় যশোরে, ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে (M. H. Khan, Public Libraries in Bangladesh, Int. Libr. Rev. (1984) 16)। এরপর ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে বরিশাল, বগুড়া ও রংপুরে আরও তিনটি পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখনও পর্যন্ত যশোর (ইনস্টিটিউট) পাবলিক লাইব্রেরিই দেশের সর্ববৃহৎ পাবলিক লাইব্রেরি হিসেবে স্বীকৃত। এখানে জ্ঞানের নানা শাখায় প্রায় ৭০ হাজার বইসহ রয়েছে বিপুলসংখ্যক পাণ্ডুলিপি, বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভ, সংবাদপত্র ইত্যাদি। লাইব্রেরি-সম্পাদক অধ্যাপক মোহাম্মদ শরীফ হোসেন ১৯৭০ দশকের শেষভাগে এখানে খুলনা বিভাগীয় আঞ্চলিক গ্রন্থসঞ্চালনকেন্দ্র 'বই ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (খান, আমিরুল আলম, ১৯৮৬)। কিন্তু প্রায় শতখানেক শাখা খুলেও এক দশকের বেশি তা চালু রাখা সম্ভব হয় নি।

কেমন চলছে এসব গণগ্রন্থাগার:

পাবনায় 'অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি' স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের বিপুল অর্থ-সহায়তায় যে ভবন, পুস্তক ও অন্যান্য ভৌত সুবিধা লাভ করেছে তার ব্যবহার সীমিত হয়ে গেছে–শুধু চাকরিপ্রার্থীদের চাকরির বিজ্ঞাপন খোঁজার কাজে। এমনকি রাজধানী ঢাকায় কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারেও ভোর থেকে লম্বা লাইনে ভিড় জমায় চাকরিপ্রার্থীরাই বেশি (সূত্র: বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ২ মে ২০১৭)। আর বিখ্যাত 'কুমিল্লা রামমালা পাবলিক লাইব্রেরি' বিপুলসংখ্যক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের ভার বহনের সামর্থ্য হারাচ্ছে মালিকানা বিষয়ক মামলায় জড়িয়ে! বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির পুরোনো জৌলুস নেই; খুলনা বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে পাঠকসংখ্যা কমেই চলেছে। দেশের অন্যতম প্রাচীন 'রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি' আমলাতন্ত্রের নিকৃষ্টতম সিদ্ধান্তের শিকার হয়ে একপাশে তার পুরোনো গৌরব ও ঐতিহ্য রক্ষার লড়াই করছে, অন্যদিকে সরকারের ক্ষমতা প্রদর্শনের দ্বন্দ্বে অর্থের শ্রাদ্ধসহ ধ্বংসোন্মুখ! কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি অভিভাবকহীন! নিয়মিত প্রকাশনা, সম্মাননা প্রদান এবং নৈমিত্তিক কার্যক্রমে এখনও সচল 'নারায়ণগঞ্জ সুধীজন পাঠাগার'; যদিও কালের যাত্রার ধ্বনি সেখানে ঝংকৃত নয়। গোপালগঞ্জের মুকসুদপর উপজেলায় 'বাঁশবাড়িয়া আহম্মদ আলী পারিবারিক লাইব্রেরি'টি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। জাতীয়

গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক ফজলে রাব্বি সাহেবের একান্ত প্রচেষ্টায় বিপুল মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহ সত্ত্বেও স্থানীয় শিক্ষার্থী বা শিক্ষকদের সেভাবে আকর্ষণ করতে পারছে না। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত নড়াইল জেলার 'লোহাগড়া রামনারায়ণ পাবলিক লাইব্রেরি'ও আর আগের মতো পাঠক আকর্ষণ করে না। লেখকের সরেজমিন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে কয়েকটি লাইব্রেরির বর্তমান দশা এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

ব্যতিক্রমধর্মী গ্রন্থাগার:

আলোকিত মানুষ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র' সারা দেশে গ্রন্থপাঠ আন্দোলন করে চলেছেন। বিশ্বের নির্বাচিত চিরায়ত গ্রন্থপাঠের এ মহৎ আয়োজনে এই প্রতিষ্ঠান ঢাকায় মূল কেন্দ্রের বাইরে ঢাকা জেলাসহ সারা দেশে ৫৬টি জেলায়, ২৫০ উপজেলায় মোট ১৮০০ লোকালয়ে ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি (আলোর পাঠশালা) পরিচালনা করে থাকে (দ্রঃ বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ওয়েবসাইট)।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে যশোরের 'ডিহি ইউনিয়ন পাবলিক লাইব্রেরি' দেশে ইউনিয়নভিত্তিক কমিউনিটি-লাইব্রেরি হিসেবে তৃণমূলে লাইব্রেরি-সেবা পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করে লাইব্রেরির প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পরিচালন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা চালায়। গ্রামীণ জনপদে যেখানে মানুষ সভ্যতার আলোবঞ্চিত–সেখানে প্রাথমিক থেকে উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করে, উচ্চতর স্তরে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের দীর্ঘমেয়াদি পাঠ্য ও সহায়ক গ্রন্থঋণ দিয়ে, এবং প্রান্তিক জনসাধারণের নৈমিত্তিক চাহিদা পূরণে যেমন: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, ক্ষুদ্রব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তার হস্ত প্রসারিত করে ১৯৯০ দশকেই এই লাইব্রেরি দেশে-বিদেশে সুনাম ও ইউনেস্কোর স্বীকৃতি অর্জন করেছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের 'ইউনেস্কো পাবলিক লাইব্রেরি ইশতাহার' মেনে 'ডিহি ইউয়িন পাবলিক লাইব্রেরি' প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল জনগণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণের একটি বাংলাদেশি মডেল তৈরি করার। কিন্তু একুশ শতকের প্রবল ডিজিটাল-প্লাবনে এই প্রতিষ্ঠানও পাল্লা দিতে পারছে না।

নিবেদিতপ্রাণ দুই বইপ্রেমী:

বাংলাদেশে জনগণের কাছে গ্রন্থসেবা পৌঁছ দিতে নিরন্তর প্রয়াসী দুজন নিবেদিতপ্রাণ মানুষের কথা উল্লেখ করতে আমরা যেন কখনও ভুল না করি। একক প্রচেষ্টায় এমন নজির সত্যিই বিরল। নিজের টাকায় রাজশাহীর ২০টি গ্রামে বইয়ের আলো পৌঁছে দিয়ে সবার মন জয় করেছেন 'পলান সরকার'। তিনি এদেশে এক প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। অন্যটি ঝিনাইদহ জেলায় 'মাতৃভাষা লাইব্রেরি'। এক নিবেদিতপ্রাণ যুবক 'এম আর টুটুল' একক প্রচেষ্টায় লাইব্রেরি আন্দোলনকে এক নতুন উচ্চতায় স্থাপন করেছেন। এমন বইপাগল মানুষ এদেশে আরও আছেন। আমাদের উচিত তাঁদের খুঁজে বের করে সম্মানিত করা।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ভূমিকা:

পাঠক এবং গ্রন্থাগারে সরাসরি বই পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ। একসময় সারা বছর দেশের কোথাও না কোথাও বইমেলার আয়োজন করত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। এখন সেখানেও ভাটার টান। খবর নিয়ে জানা গেছে, গত বছর এই প্রতিষ্ঠান সারা দেশে ১৬টি বইমেলা করতে পেরেছে। আর ওসমানী উদ্যানের রেলের জমি থেকে গ্রন্থকেন্দ্রের পঞ্চম তলায় স্থান পেয়েছে মহানগর পাঠাগার।

গণগ্রন্থাগারের পরিসংখ্যান:

বাংলাদেশে নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান পাওয়া দুষ্কর কাজ। বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র ভূখণ্ড হলেও এখানে জনসংখ্যা ১৬ কোটির ওপর। বর্তমান বিশ্বে '১১টি উদীয়মান অর্থনীতির দেশ'-এর একটি আমাদের বাংলাদেশ। বিপুল জনসংখ্যা-অধ্যুষিত দেশে সরকারি গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা মাত্র ৭৩! অর্থাৎ গড়ে ২২ লাখ মানুষের জন্য মাত্র একটি গণগ্রন্থাগার আছে (টমাস ডোহার্থি, ২০১৪)। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, বাংলাদেশ যে-তালিকা তৈরি করেছে সেই মোতাবেক দেশে মোট বেসরকারি পাবলিক লাইব্রেরির সংখ্যা হাজার দেড়েক। অন্যদিকে, বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সমিতির তালিকা অনুযায়ী দেশে সরকারি পাবলিক লাইব্রেরি ৭০, বেসরকারি ১৯৫৬। ঢাকা শহরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৩২টি ছোটো-বড় লাইব্রেরি আছে যেগুলি সর্বসাধারণ ব্যবহার করতে পারে (ছিদ্দিক, আশরাফুল আলম ২০১৭)। তবে এই সব পরিসংখ্যানই অসম্পূর্ণ। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা 'ব্র্যাক' সারাদেশে ২,৬৫০টি 'গণকেন্দ্র' গ্রন্থাগার পরিচালনা করে (টমাস ডোহার্থি, ২০১৪)। স্কুল-কলেজে এখন আগের মতো গ্রন্থাগার নেই, থাকলেও সচল নয়। নোট-গাইডনির্ভর লেখাপড়ার দৌরাত্ম্যে শিক্ষার্থীদের এখন কোচিং সেন্টারে ছুটতে ছুটতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। গ্রন্থাগারের চৌকাঠে পা রাখবে কখন?

কাণ্ডারিবিহীন নৌকা:

বাংলাদেশে পাবলিক লাইব্রেরি অনেকটা কাণ্ডারিবিহীন নৌকার মতো। কখনও তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, কখনও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, কখনো-বা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে তাকে জুড়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে বাংলা একাডেমি, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রসহ পাবলিক লাইব্রেরির কাণ্ডারি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। এই মন্ত্রণালয় জাতীয় বাজেটের এক শতাংশ বরাদ্দও লাভ করে না। অবশ্য আমাদের শিক্ষাখাতও ইউনেস্কো-স্বীকৃত মোট জাতীয় আয়ের (জিডিপি) ছয় শতাংশ দূরে থাক, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিশ্রুত চার শতাংশের অর্ধেক, অর্থাৎ দুই শতাংশের বেশি বরাদ্দ লাভ করে নি। এবং জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দের সর্বমান্য মানদণ্ড থাকলেও বাংলাদেশে তা কখনও ১২ শতাংশ অতিক্রম করে নি। লাইব্রেরি-উন্নয়নে বাজেট না হয় অনুল্লেখিতই রইল!

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের নিমিত্তে গড়ে তোলা উপজেলা ব্যবস্থায় প্রত্যেক উপজেলায় একটি করে 'উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গৃহীত হয় মধ্য-আশির দশকে। বলা

বাহুল্য, সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু তারও আগে, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ লাইব্রেরি কনসালটেন্ট 'জেমস পারকার' বাংলাদেশে ইউনিয়ভিত্তিক পাবলিক লাইব্রেরি গড়ে তোলার সুপারিশ করেছিলেন (পারকার রিপোর্ট, ১৯৮৭)। আর ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনকালে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে 'পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার' গড়ে তোলার আন্দোলন ছিল রাজনৈতিক ও শিক্ষা-আন্দোলনের মতই জনপ্রিয় শ্লোগান। হয়ত সেকথা স্মরণ করেই প্রমথ চৌধুরী লাইব্রেরিকে "শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি, আর হাসপাতালের চেয়ে একটু কম" প্রয়োজন বলেই গণ্য করেছিলেন। বলা বাহুল্য, 'পাড়ায় পাড়ায় পাঠাগার' আন্দোলন যত আবেদন ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, পরবর্তীকালের কোনো পদক্ষেপই তত সফল হয় নি। বাংলাদেশে ১৯৭০ দশক পর্যন্ত, এমনকি সরকারি পাবলিক লাইব্রেরিতেও পেশাদার, ডিগ্রিধারী লাইব্রেরিয়ান নিয়োগদান সম্ভব ছিল না! এখনও বাংলাদেশে পেশাদার উপযুক্ত লাইব্রেরিয়ানের সংকট কাটে নি।

বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি এবং ইউএস ইনফরমেশন সার্ভিস লাইব্রেরি (United States Information Service) এককালে খুবই কার্যকর সংগঠন ছিল। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত হলেও বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি–যেটি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়–আগের মতো পাঠক আকৃষ্ট করতে পারছে না (টমাস ডোহার্থি, ২০১৪)। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির অভিজ্ঞতার আলোকে ডোহার্থিও স্বীকার করেন যে, লাইব্রেরিগুলো আগের মতো পাঠক টানতে পারছে না। এর মূল কারণ, তাঁর মতে, প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ পাঠকদের পাঠাভ্যাসের ধরন বদলে দিয়েছে। তিনি লিখছেন:–

"Today, public libraries are at a turning point. The way we access and consume information has changed dramatically in the 21st century, and this presents major challenges and opportunities for public library systems across the world… The advent of new technologies has changed some of our reading habits."

অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা:

কিন্তু শুধু যে বাংলাদেশে পাবলিক লাইব্রেরি আন্দোলন মুখ থুবড়ে পড়েছে তাই নয়, বরং বিশ্বব্যাপী ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থাও ভালো নয়। ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন অর্থাৎ ডিজিটাল ব্যবস্থাপনায় কী এ সমস্যার সমাধান সম্ভব? এ বিষয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে উন্নত বিশ্বে। ভিভিয়েন ওয়ালার তার গবেষণায় (Legitimacy for large public libraries in the digital age) এসব বিষয় খতিয়ে দেখতে চেয়েছেন। একটু পিছনে ফিরে দেখি। এখন থেকে প্রায় ৪০ বছর পূর্বে এম হ্যারিস লক্ষ করেন–আরও ১০০ বছর পূর্বে লাইব্রেরিকে প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকতে হয়েছিল।। বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমরা হ্যারিসের বক্তব্যটি একটু দেখে নিতে পারি:

"The very existence of the public library appears in jeopardy; public librarians appear both concerned and confused. They find themselves asking, as did their predecessors over 100 years ago, what is the purpose of the public library?"

তিনি যা বলছেন তার সারকথা, সর্বযুগেই যেকোনো প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তীকালের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে টিকে থাকতে হয়। কিন্তু বহু দেশে যেসব সমস্যা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয় নি, তার মধ্যে অন্যতম হলো লাইব্রেরি-ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী অর্থাৎ ডিজিটাল করা।

অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া স্টেট লাইব্রেরির নতুন বিশাল ভবন দেখে ভাববেন না, এখানে সময় বাক্সবন্দী হয়ে আছে। নিচতলাতেই পাঠক বা ব্যবহারকারী ছাত্রদের জন্য এক-একটা কম্পিউটারে পড়াশোনার চমৎকার ব্যবস্থা, আরেকটি কক্ষে শিশুরা মনের আনন্দে ভিডিও-গেমও খেলতে পারে। সোভিয়েত রাশিয়া লাইব্রেরির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বেইজিংয়ে চীনের সেন্ট্রাল পাবলিক লাইব্রেরিকে যতদূর সম্ভব পরিবর্তমান প্রযুক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থশালার নতুন ভবনেও এসব ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রয়োজন উদ্ভাবনী ক্ষমতা আর সাহস:

এই উদ্বেগ ও বিমূঢ়তার কারণ, লাইব্রেরির সনাতন যে ধারণা আমাদের মনে গোপনে বসবাস করে, তার সঙ্গে ঐতিহ্যগতভাবে একটি ভবন, সারিবদ্ধ বইয়ের তাক আর চেয়ার-টেবিলে বসা পাঠকসম্প্রদায় যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কিন্তু ডিজিটাল যুগে ভার্চুয়াল লাইব্রেরিতে এই পরিকাঠামো প্রায় অকার্যকর। ছোট্ট একটি মেমোরিকার্ড যে-পরিমাণ তথ্য ধারণ করতে পারে তা হয়তো সনাতন পদ্ধতিতে বিপুল ব্যয়সাধ্য একটি ভবনে সংরক্ষিত সমুদয় তথ্যের সমান। সেটি একটি নোটপ্যাড বা মোবাইল ফোনে ঢুকিয়ে ইন্টারনেট থেকে রাজ্যের অজানা তথ্য সেখানে ডাউনলোড করা সম্ভব। আগে যেখানে লাইব্রেরি-ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন হতো ডজনখানেক লোক, সেই কাজও সহজে সম্পাদন করতে পারেন মাত্র একজন দক্ষ কর্মী! কেবল চেতনাগত পরিবর্তন, উদ্যম এবং উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে পুঁজি করে ডিজিটাল যুগে আরও কার্যকর লাইব্রেরি গড়ে বিশ্বব্যাপী তার সেবা বিস্তৃত করা সম্ভব! সবচেয়ে বড় কথা, এজন্য একজন উদ্ভাবনীক্ষমতাসম্পন্ন লাইব্রেরিয়ান হয়তো একপ্রস্থ পুস্তকের বস্তুগত ক্রয়ও নিষ্প্রয়োজন ভাবতে পারেন!

ভাবুন একবার, 'আমাজন ডট কম' সারা দুনিয়ায় বই পৌঁছে দিচ্ছে অনলাইনে! এদেশেও 'রকমারি ডট কম' বা 'পড়ুয়া' পাঠকের হাতে বই পৌঁছে দিচ্ছে। একটিও গাড়ির মালিক না হয়ে শুধু উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে পুঁজি করে 'উবার' সারা বিশ্বে অ্যাপভিত্তিক ভাড়ার ট্যাক্সির কেমন রমরমা ব্যবসা ফেঁদে বসেছে! আর বাংলাদেশের বাস-ট্রেনের টিকিট বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান 'সহজ ডট কম'-এ এখন দেড় কোটি ডলার লগ্নি করতে এগিয়ে আসছে চীনা আর সিঙ্গাপুরের নামকরা গোল্ডেনগেট নামের করপোরেট প্রতিষ্ঠান! তাহলে, অর্থও এখন সমস্যা নয়, যদি মাথায় বুদ্ধি থাকে!

কিন্তু আইনি জটিলতা কিছু থেকেই যাচ্ছে। উবার বা সহজ নাহয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, লগ্নিকরা টাকা তারা তুলে নেবে বিপুল পরিমাণ মুনাফা করে। কিন্তু পাবলিক লাইব্রেরি তো সরকারের সেবাপ্রদায়ী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেই ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দেই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে স্বীকৃতি পেয়েছিল। তারও পূর্ব থেকেই মার্কিন মুলুকেও পাবলিক লাইব্রেরির সেবা মুনাফাহীন।

ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল লাইব্রেরি:

কিন্তু কথা শুধু সেটাই নয়। কথা হলো, আজকের ডিজিটাল যুগে একজন পাঠককে লাইব্রেরি ভবন পর্যন্ত যেতে হবে কেন? যেখানে একটা ইন্টারনেট সংযুক্ত স্মার্টফোনেই জগতের তাবৎ তথ্য মেলে, সেখানে এ বিড়ম্বনা সইবে কেন পাঠক? যুক্তরাজ্যের অভিজ্ঞতা বলছে, যখন ঘরে বসেই মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ক আধুনিক জীবনযাপনের অতি জরুরি যাবতীয় সেবা পাচ্ছে, তখন সনাতন লাইব্রেরিকে অর্থায়ন করা অর্থহীন; বিশেষ করে, একদিকে যখন লাইব্রেরিগুলোর পরিচালনা ব্যয় বাড়ছে, অন্যদিকে পাঠকসংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। জনগণের করের ওপর এই চাপ কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে? এ বিতর্কের জবাব খুঁজতে গিয়ে তারা বারবার 'কমিউনিটি' অর্থাৎ নাগরিক বা স্থানীয় জনগণকে সংশ্লিষ্ট করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। 'আর্ট কাউন্সিল ইংল্যান্ড' এক ব্যাপকভিত্তিক গবেষণা (Envisioning the library of the future) চালিয়ে মতামত দেয়–

"The 21st century public library service will be one in which ælocal people are more active and involved in its design and delivery."

ক্যালিফোর্নিয়া পলিটেকনিক্যাল স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক রিবল যেমন মনে করেন–

"The demand for library services is slowly moving from print media to digital, but the relevance of libraries in the digital age lies in their ability to offer everyone access to all forms of media."

না, প্রিন্টমিডিয়া এখন অনেক বেশি দ্রুত ডিজিটাল মাধ্যমে প্রবেশ করছে। তাই তিনি যেসকল ধরনের মিডিয়ায় সকলের অভিগম্যতা নিশ্চিতের কথা বলেছেন সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। কিন্তু মনে রাখতে হবে, আজকের পৃথিবীতে যেমন মুদ্রিত সামগ্রীর জায়গা দখল করছে ভার্চুয়াল প্রযুক্তি, আগামি দিনে নতুন নতুন প্রযুক্তি এই ভার্চুয়াল বিশ্বকেও 'সেকেলে' ঘোষণা করবে।

মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল:

মানুষ অমৃতের সন্তান। রবীন্দ্রনাথ যেমন "মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল", "মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়ার" উল্লেখ করেছেন–তা এখন ভার্চুয়াল জগতে মুক্তিলাভ করেছে। দিব্যধামে বসবাসরত অমৃতের পুত্রদের জন্য এখন অমৃতলোকের প্রথম আবিষ্কর্তা মহাপুরুষদের কণ্ঠও ভার্চুয়াল লাইব্রেরিতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে! কালের সে যাত্রার ধ্বনি শ্রবণে উৎকর্ণ যে-কেউ তা শ্রবণ

করবে।

মার্কিন মুলুকে এ শতকের গোড়ার দিকেই Internet2 K20 প্রকল্প ১০০ 'জিবিপিএস' গতিসম্পন্ন ব্রডব্যান্ড সংযোগ দিয়ে এ ধরনের সুবিধা দেওয়া শুরু করে। ভারতের কেরালা রাজ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে স্যাটেলাইট সুবিধায় ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পরিচালিত হয় রাজ্যব্যাপী শিক্ষক-প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

বাংলাদেশের সম্ভাবনা:

বাংলাদেশ সরকার এটুআই (A2I) প্রকল্পাধীনে ইউনিয়ন পর্যায়ে "ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র" (Union Information Service Centres (UISCs) স্থাপনের মাধ্যমে ৪,৫৪৭টি ইউনিয়নে ডিজিটাল-সেবা পৌঁছে দিয়েছে। এই সেবাকেন্দ্রগুলি দেশের মানুষের তথ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অপরিমেয় সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এখন তাকে ফাইবার অপটিক্স নেটওয়ার্কের অধীনে আনার কাজ শুরু হয়েছে। তাই এখন ভাবতে হবে–সেগুলি কত বিচিত্র ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়। সেটি সম্ভব আরও এ কারণে যে, ১৬ কোটি মানুষের বাংলাদেশে প্রায় ১৪ কোটি মানুষই এখন মোবাইল ফোন সুবিধা ভোগ করে।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের অভিজ্ঞতা:

এক্ষেত্রে আমরা যশোর শিক্ষা বোর্ডের অভিজ্ঞতা খতিয়ে দেখতে পারি। খুলনা বিভাগের ১০ জেলা নিয়ে যশোর শিক্ষা বোর্ড কাজ করে। প্রায় সাড়ে তিন হাজার স্কুল, কলেজ এই শিক্ষা-বোর্ডের অধীন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই বোর্ড নিজস্ব অর্থায়নে তাদের সকল স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী-কর্মচারীদের ডাটাবেজ তৈরি করে। গুগলকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরিতে সংগৃহীত বইয়ের অনলাইন ক্যাটালগিং কেন্দ্রীয়ভাবে সম্পন্ন করে যশোর বোর্ড। সকল তথ্য যশোর শিক্ষা বোর্ডের সার্ভারে জমা হয়। ডাটা-নিরাপত্তার জন্য বোর্ড বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সার্ভারও ব্যবহার করে। এ কাজে আইসিটি মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের 'এটুআই' প্রকল্প সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করে। উল্লেখ্য, গুগল 'ডিউই দশমিক বর্গীকরণ' এবং 'সিয়ার্স লিস্ট অব সাবজেক্ট হেডিংস' বিনামূল্যে ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে থাকে। সেবা-ব্যবস্থা আরও একটু উন্নত করা গেলে এই বোর্ড তার অধীনে থাকা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত বইয়ের তথ্য এবং বইপত্র সহজে আদান-প্রদান করতে সক্ষম হবে। (খান, আমিরুল আলম, ২০১৪)!

এখন কল্পনা করুন, কোনো প্রতিষ্ঠান সংগৃহীত বইয়ের ই-সংস্করণ প্রকাশ করলে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে থাকা লাইব্রেরিসেবা কত সহজে সকল শিক্ষক ও বিদ্যার্থীর নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে:

যুগ বদলের সঙ্গে লাইব্রেরির ধারণা ও কাঠামোগত পরিবর্তন নিশ্চয়ই ঘটবে। কিন্তু, একথা নিশ্চিত করে উচ্চারণ করা যায়, যত দিন মানবসভ্যতা টিকে থাকবে, তত দিন লাইব্রেরির উপযোগিতা ফুরাবে না; তবে তার রূপান্তর ঘটবে। লাইব্রেরি হলো সভ্যতার মাপকাঠি। রসের সাগরে স্নান করিয়ে ওমর খৈয়াম যেমনটি বলেছিলেন–তার জুড়ি তামাম দুনিয়ায় নেই–"রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে যাবে, কিন্তু অনন্তযৌবনা বইটি ফুরাবে না, যদি তেমন বই হয়!" কিন্তু খৈয়ামও বলেন নি, বইটি তালপাতায়, না কি ভূর্জপত্রে, প্যাপিরাসে, দামী কাগজে, দামী রেশমবস্ত্রে লিখিত, না কি স্বর্ণপত্রে উৎকীর্ণ!

তা এ যুগের তরুণ প্রজন্ম কেন কাগজের পাতায় কালো অক্ষরে ছাপা বই নিয়ে মাথা ঘামাবে? তারা পড়বে ভার্চুয়াল বই, আর পড়বেও ভার্চুয়াল মাধ্যম অর্থাৎ ডিজিটাল ফরমেটে। হাতে থাকা একটা স্মার্টফোন, কিংবা অনাগত যুগে উদ্ভাবিত নতুন কোনো ডিভাইস সে ব্যবহার করবে পরম দক্ষতায়। আমাদের কালের রুচি দিয়ে তো আগামী প্রজন্ম চলবে না। যৌবনের ধর্ম নয় সেটা। তাই 'লাইব্রেরিকক্ষে পাঠকের দেখা মিলছে না' বলে আহাজারি করার কিছু নেই। বরং আসুন, আমরাও স্মার্ট হই, ডিজিটাল যুগে ডিজিটাল লাইব্রেরি গড়ে তুলি।

ডোহার্থির কথা ধার করে বলি, "to survive in the digital age and stay relevant, public libraries need to be brave and innovative. They must embrace both the physical and virtual." সৃষ্টিশীল উদ্ভাবন ও সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে, নতুন-পুরাতনের সমন্বয় ঘটিয়েই সকল যুগে সব সংকট মোকাবেলা করতে হয়। আর সেটা করতে নির্ভর করতে হয় কমিউনিটি তথা জনগণের সম্মিলিত সক্ষমতার সঙ্গে রাষ্ট্রের সামর্থ্যের যূথবন্ধন ঘটিয়ে। যখন রাষ্ট্র এবং জনগণ একাত্ম হয়ে কোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে, তখন কোনো কাজই অসাধ্য থাকে না। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়তে ডিজিটাল লাইব্রেরির বিকল্প নেই।

করণীয়:

দেশি-বিদেশি অভিজ্ঞতা যদি বাংলাদেশের পাবলিক লাইব্রেরিখাতে কাজে লাগানো যায়, তাহলে কেন্দ্রীয়ভাবে বাংলাদেশে প্রকাশিত বইয়ের ই-সংস্করণ করে তা সত্যি সত্যিই নানা বয়সী পাঠকের স্মার্টফোনের মাধ্যমে পৌঁছানো সম্ভব। এক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক তার জন্মসনদ অথবা নাগরিক পরিচয়পত্র ব্যবহার করে (অর্থাৎ নাগরিক আইডি নম্বর) বিনা পয়সায়, কিংবা শহর-গ্রাম, লিঙ্গ ও বয়সভেদে নির্দিষ্ট পরিমাণ 'ফি' দিয়ে তথ্য জানার সুযোগ পেতে পারে। সেক্ষেত্রে ক্রমশ ভবনকেন্দ্রিক লাইব্রেরির ধারণা বদলে গিয়ে এবং ভার্চুয়াল লাইব্রেরির ধারণা পরিপোষণ পেলে ডিজিটাল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করা সহজ হবে।

রাষ্ট্রীয় অর্থভাণ্ডার থেকে তেমন একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব বলেই এই নিবন্ধকারের ধারণা। আর সেটা করা গেলে সনাতন ও ভার্চুয়াল লাইব্রেরির সমন্বয়

সাধন যেমন সম্ভব, তেমনি এ দেশেও লাইব্রেরি খাতে যুগোপযোগী প্রাণসঞ্চার করা সম্ভব। এজন্য বর্তমানে লাইব্রেরি পরিচালনায় যে জাতীয় ব্যয়, তাও অর্ধেকে নেমে আসতে পারে। একবার একটি ন্যাশনাল ডিজিটাল ব্যাকবোন তৈরি করা গেলে সেটি আমাদের বহুমাত্রিক সুবিধা প্রদান করবে।

সতর্কতা:

তবে সকল সুফল-প্রদায়ী কর্মযজ্ঞেরই কিছু না কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকে। ডিজিটালাইজেশনের সবচেয়ে বড় সংকট ডিজিটাল ডিভাইড। সকলের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টির বদলে এই প্রযুক্তি বিশ্বকে এমন ভয়াবহরূপে বিভক্ত করে ফেলছে যে, সতর্ক না হলে বিশ্বব্যাপী বৈষম্য পর্বতপ্রমাণ হবে।

তথ্যসূত্র:

1. Khan, M. H. (1984), Public Libraries in Bangladesh, Int. Libr. Rev. (1984) 16
2. Doherty, T. (2014), Why do we still need public libraries in the digital age? britishcouncil.org/voices
3. Waller, V. (2008), Legitimacy for large public libraries in the digital age. LIBRARY REVIEW, Vol. 57 Issue 5
4. Harris, M. (1973), "The purpose of the American public library: a revisionist interpretation of history", in Totterdell, B. (Ed.), Public Library Purpose: A Reader, Linnet Books, London.
5. Rible, H,(2011) Why Libraries are Relevant in the Digital Age, https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi? article =1000&context=cesp

১. খান, আমিরুল আলম (১৯৮৬), স্বরবর্ণ, যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি জার্নাল

২. খান, আমিরুল আলম (২০১৪), বইয়ের আনন্দভুবনে ফেরার বাসনায়, *প্রথম আলো*, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৪

৩. ছিদ্দিক, আশরাফুল আলম (২০১৮), বাংলাদেশে পাবলিক লাইব্রেরির তালিকা

৪. পারকার রিপোর্ট, ১৯৮৭

সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে প্রাচীন গ্রন্থাগারের ভূমিকা: একটি বিশ্লেষণ

মো. রফিকুল ইসলাম

প্রকাশ: ৮ মে, ২০২২; লাইব্রেরিয়ান ভয়েচ (http://www.librarianvoice.org)

মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার বিকাশলাভ করেছে। সপ্তম শতাব্দীতে গান্ধার, তক্ষশীলা ও কাশ্মীর প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধবিহারে সুপরিচালিত গ্রন্থাগার ছিল। সেই সময়ে বিহার ও মন্দিরে গ্রন্থাগার ছিল এবং ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারও ছিল অসংখ্য। সুমেরিয়ানরা আনুমানিক ২,৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মন্দির ও রাজপ্রাসাদ বা ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন নগরী বোরিসপা-র গ্রন্থাগার ব্যাবিলনীয় সভ্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাটির ফলকে লেখা গ্রন্থগুলি নকল করে আসীরিয় আসুরবানিপাল তাঁর নিনভের গ্রন্থাগারটি সমৃদ্ধ করেছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিকদের গবেষণায় বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগারের পরিচয় পাওয়া যায়। যা প্রাচীন ব্যাবিলনে সেমিটিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম সারগনের রাজধানী আক্কাদে। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তদশ শতকে এই গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয়েছিল। ব্যাবিলনের মারি রাজ্যের রাজধানীর প্রাসাদের গ্রন্থাগারে কুড়ি হাজারেরও বেশি পোড়ামাটির ফলক পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া ও ব্যাবিলনিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বহু রাজ্যে সংগঠিত গ্রন্থাগারের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশ্বের প্রথম গ্রন্থাগারিকের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি খ্রিস্টপূর্ব সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের পতন হওয়া পর্যন্ত প্রায় দেড় হাজার বছর মেসোপটেমিয়া ও ব্যাবিলনীয় রাজ্যগুলিতে গ্রন্থাগারের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিক সম্রাটদের বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে ইউরিপিডিস ও অন্যান্য পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার নানা বিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল। অ্যারিস্টটলের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংগ্রহ ছিল যেমন বিপুল, তেমনই বৈচিত্র্যপূর্ণ। তাঁর গ্রন্থাগারে মানবজ্ঞানের সবগুলো শাখার উপর রচিত গ্রন্থ ছিল।

হেলেনীয় যুগে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া ও এশিয়া মাইনরের পারগমাম প্রভৃতি নগরে গ্রন্থাগার ছিল। আলেকজান্দ্রিয়াতে প্রথম টলেমি (খ্রিস্টপূর্ব ৩০৫-২৮৩) পণ্ডিতদের জন্য একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে টলেমিরা সেই গ্রন্থাগারকে আরও সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। এই গ্রন্থাগারে দু-লক্ষেরও অধিক গ্রন্থ ছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এর গ্রন্থসংখ্যা ছিল সাত লক্ষেরও বেশি এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় দ্বিতীয় গ্রন্থাগার সেরাপিয়াসে ছিল এক লক্ষেরও অধিক গ্রন্থ। গ্রন্থাগারগুলির সম্পদসমূহ ছিল সুবিন্যস্ত। আলেকজান্দ্রিয়া ও পারগমামের গ্রন্থাগারগুলি কয়েকশত বছর ধরে ধারাবাহিক সংগ্রহে পুষ্ট হয়েছে। পাঠকের ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থতালিকা প্রণয়ন করেছে। গ্রন্থ সম্পাদনা করে জ্ঞানচর্চার সহায়তা করেছে এবং অধিকসংখ্যক গ্রন্থাগার স্থাপন করে জ্ঞানের আলো বিকিরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে গ্রিক সংস্কৃতির দ্বারা রোমকরা প্রভাবিত হয়। রোমান অভিজাত ও সেনাধ্যক্ষের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠার অন্যতম সোপান বলে পরিগণিত হতো। সিসেরার (খ্রিস্টপূর্ব ১০৬-৪৩) একাধিক ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের সর্বত্র মূল্যবান গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। জুলিয়াস সিজার সাধারণ গ্রন্থাগারের চিন্তাভাবনা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর প্রজাদের মধ্যে গ্রিক ও রোমান সাহিত্যের ব্যাপক প্রচলন হোক। সকলেই শিক্ষিত হোক ও গ্রন্থপাঠে উদ্বুদ্ধ হোক। গ্রন্থপাঠ সাংস্কৃতিক চেতনা প্রসারে সহায়ক হোক। সেই উদ্দেশ্যে তিনি সব গ্রন্থাগারের দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে কেবল রোমেই পঁচিশটিরও বেশি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে রোমান সংস্কৃতিরও ব্যাপক আকারে প্রসার ঘটেছিল। আর ইতালি, গ্রিস, এশিয়া মাইনর ও উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি রোমান সংস্কৃতির দ্বারা পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং গ্রন্থাগার প্রচারের দ্বারা

সাংস্কৃতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল।
বাগদাদের স্বর্ণযুগে খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়ে আরবের ঐতিহাসিক ওমর-আল-ওয়াকিদির যে-পরিমাণ বই ছিল তাতে একশ কুড়িটা উট বোঝাই হয়ে যেত। ৮১৩ খ্রিস্টাব্দে হারুন-অর-রশিদের পুত্র খলিফা আল-মামুন 'জ্ঞানভাণ্ডার' নামে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে একে একে মাদ্রাসা স্থাপিত হতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীতে সেখানে ছত্রিশটি গ্রন্থাগার ছিল। এর মধ্যে একটির বইয়ের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সবই ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে মোগল-আক্রমণের ফলে ধবংস হয়ে যায়। এ-ছাড়াও আরবি সাহিত্যের রেনেসাঁ রচনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

তবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় আরব জাতি ইউরোপীয়দের তুলনায় অগ্রগামী। আব্বাসী খিলাফতের (৭৫০-১২৫৮) শুরু হতে সকল খলিফারাই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করার আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যান। ফলে প্রাচীন নগরী বাগদাদ ও বসরায় বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। যা আরব ও মুসলিম জাতির ঐতিহ্য ও গৌরবের বিষয় ছিল। কিন্তু আব্বাসীয়দের পতনকালে হালাকু খানের নেতৃত্বে তাতাররা হামলা, অগ্নিসংযোগ ও নদীতে নিক্ষেপ করে হাজার হাজার মূল্যবান গ্রন্থ ধবংস করেন–যা পৃথিবীর ইতিহাসে ন্যক্কারজনক ঘটনা।

মিশরের প্রায় সকল মসজিদের সঙ্গে ছোটো বা বড় অসংখ্য আধুনিক গ্রন্থাগার ছিল এবং সেগুলোতে কোরআন, হাদিস, ফিকাহ ও ইতিহাস বিষয়ক অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থও ছিল। তাছাড়া অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপিও সংরক্ষিত ছিল। তবে এসকল প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলোর সঙ্গে আধুনিক পাঠাগারের তুলনা করলে সেগুলোকে সর্বোচ্চ গ্রন্থ-সংরক্ষণাগার বলা যেতে পারে। আরবি ভাষা ও সাহিত্য সংরক্ষণে ইউরোপে অনেক বড় বড় গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। সেগুলো প্রাচীন আরবি ভাষা ও সাহিত্যের অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করে চলেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আধুনিক গ্রন্থাগারগুলো নিম্নরূপ:

১. বার্লিন গ্রন্থাগার, জার্মানি: যেখানে চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। ত্রিশ হাজার মূল্যবান পাণ্ডুলিপি রয়েছে। যার অধিকাংশই আরবি ভাষায় রচিত ছিল।
২. বন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার: তিন লক্ষ এশষট্টি হাজার ছয়শত তেষট্টিটি গ্রন্থ রয়েছে এবং এক হাজার নয়শ একান্নটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে।
৩. এস্কোরিয়াল গ্রন্থাগার, স্পেন: এই গ্রন্থাগারে পঁয়ত্রিশ হাজার পুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে চার হাজার ছয়শ আটাশটি পাণ্ডুলিপি ছিল।
৪. লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, লাইডেন: এই গ্রন্থাগারে দুই লক্ষ পুস্তক রয়েছে। এর মধ্যে তিন হাজার ছয়শ গ্রন্থ প্রাচ্য ভাষাসমূহে লিখিত এবং অধিকাংশই আরবি ভাষায় রচিত।
৫. লন্ডন গ্রন্থাগার: এটি মূলত ব্রিটিশ জাদুঘরের একটি গ্রন্থাগার। এখানে আশি হাজার গ্রন্থ রয়েছে। যার একটি বড় অংশ আরবি ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপি।

৬. অক্সফোর্ড গ্রন্থাগার, অক্সফোর্ড: এই গ্রন্থাগারটি ১৫৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর গ্রন্থের সংখ্যা মোট সাত লক্ষ। এ-ছাড়াও ৩৩ হাজার আরবি পাণ্ডুলিপিও সংরক্ষিত আছে।

প্রাচ্যের আরবি গ্রন্থাগার:

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে আরববিশ্ব পুনরায় আরবি ভাষা ও সাহিত্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে। এক্ষেত্রে মিশর ও সিরিয়া অগ্রগামী। ইস্তাম্বুলে অনেক প্রাচীন গ্রন্থাগার রয়েছে। কারণ ইস্তাম্বুলকে ইসলামী-বিশ্বের রাজধানী মনে করা হয়। ইস্তাম্বুলের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থাগারের নাম এবং প্রতিষ্ঠাকালসহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

গ্রন্থাগারের নাম	প্রতিষ্ঠাতার নাম	প্রতিষ্ঠাকাল (হি.)	গ্রন্থসংখ্যা
সালীম আগা গ্রন্থাগার	আলহাজ্জ সালীম আমিন	৯৫৫ হি.	০১,৩৮২
রুস্তম পাশা গ্রন্থাগার	শায়খ পাশা সদরুল আসবাক	৯৫৮ হি.	০০,৫৬০
আতিফ আফিনদী গ্রন্থাগার	মুস্তাফা আতিফ	১১০৪ হি.	০২,৮৫৭
আয়া সুফিয়া গ্রন্থাগার	সুলতান মাহমুদ আউয়াল	১১৫২ হি.	০৫,৩০০
আল ফাতিহ গ্রন্থাগার	সুলতান মাহমুদ আউয়াল	১১৫৫ হি.	০৬,৬১৪
ওলী উদ্দিন গ্রন্থাগার	শায়খ ওলী উদ্দীন	১১৮২ হি.	০৩,৪৮৪
আল উমুমিয়্যাহ গ্রন্থাগার	ওসমানী শাসকগণ	১২৯৯ হি.	৩৪,৫০০
ইয়ালদায গ্রন্থাগার	সুলতান আব্দুল হামীদ	১২৯৯ হি.	২৬,৭৬০
মাতহাফ গ্রন্থাগার	ওসমান শাসকগণ	১৩০৬ হি.	১৫,২৬০

মিশরের গ্রন্থাগার:

মিশরের বড় বড় গ্রন্থাগারগুলো কায়রোতে অবস্থিত ছিল। কোনো কোনো গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল। আর কোনো কোনো গ্রন্থাগার বিশেষ ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত। গ্রন্থাগারগুলো নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১. দারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা: মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। আরবি সাহিত্যের পুনর্জাগরণের কালে সরকারিভাবে এ-গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুহাম্মদ আলীর সময়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয় এবং ইসমাঈল পাশার আমলে অর্থাৎ ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে কাজের সমাপ্তি ঘটে। আর সেখানে আশি হাজার বই সংরক্ষিত রয়েছে।

২. মাকতাবাতুন আযহারিয়্যা: অন্যান্য মসজিদের মতো মিশরের আযহারেও প্রাচীন গ্রন্থাগার ছিল। প্রাচীনকালে শুরুর দিকে বইয়ের সংখ্যা ছিল একশ নিরানব্বইটি এবং এগুলো সবই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। পরবর্তীতে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে সরকারি নির্দেশে এ-গ্রন্থাগারকে আধুনিক গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করা হয় এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি সংগ্রহ করা হয়। যেখানে ছত্রিশ হাজার ছয়শ তেতাল্লিশটি বই রয়েছে। তার মধ্যে পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ছিল দশ হাজার নয়শ বত্রিশটি।

৩. মাকতাবাতুল আরুকাহ ফিল আযহার: এটি আযহারের অপর একটি গ্রন্থাগার। যা ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সেখানে ত্রিশ হাজার বই সংরক্ষিত রয়েছে।

৪ . মাকতাবাতুল মাসাজিদ ওয়া দারুল আছার: ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এ-গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠালাভ করে। সেখানে ত্রিশ হাজার পাঁচশ সাতষট্টিটি বই সংরক্ষিত রয়েছে।

৫. আল মাকতাবাতুল খেদীভিয়াহ: এটি মিশরে অবস্থিত এবং একটি বিখ্যাত গ্রন্থাগার। যা মুহাম্মদ আলী পাশার শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাছাড়া মিশরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। যেমন:

ক. মাকতাবাতু কুল্লিয়াতিল হুকূক: ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানে বিভিন্ন বিষয়ে উনিশ হাজার নয়শ পঞ্চাশটি বই সংরক্ষিত এবং শিক্ষার্থীদের গবেষণার জন্য স্বতন্ত্র হলরুমও ছিল।

খ. মাকতাবাতু কল্লিয়াতিত তিব: সেখানে চিকিৎসা ও পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক ফরাসি, ইংরেজি ও আরবি ভাষায় প্রায় দশ হাজার বই সংরক্ষিত রয়েছে। এ-গ্রন্থাগারটি মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত ছিল।

গ. মাকতাবাতুল জামি'আতিল মিসরিয়্যা: ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে এ-গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠালাভ করে। তবে এগারো হাজার নয়শ ত্রিশটি গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে। অধিকাংশ গ্রন্থই লেখক ও সাহিত্যিকদের উপহারস্বরূপ পাওয়া।

ডলবিয়া ও লেবাননের গ্রন্থাগার:

মিশর ও ইউরোপের ন্যায় সিরিয়া ও লেবাননেও বেশ কিছু প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। আরবি সাহিত্যেও পুনর্জাগরণে এসব গ্রন্থাগারের ভূমিকাও কোনো অংশে কম নয়। গ্রন্থাগারগুলো নিম্নরূপ–

ক. 'আল মাকতাবাতুল যাহিরীয়্যাহ', দামেস্ক, ১৮৭৮

খ. 'আল মাকতাবাতুল শারকিয়্যাহ', বৈরুত, ১৮৮০

গ. 'মাকতাবাতুল জামি'আতি বৈরুত আল আমরীকিয়্যাহ'

ঘ. 'মাকতাবাতুল মাদরাসাহ আল আহমাদিয়্যাহ', আলেপ্পো, সিরিয়া

ঙ. 'মাকতাবাতুল মাদরাসাহ আল রিদাইয়্যাহ', আলেপ্পো, সিরিয়া

চ. 'আল মাকতাবাতুল মারুনিয়্যাহ', আলেপ্পো ও সিরিয়া, ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দে এ-গ্রন্থাগারটি

খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাচীন পারস্যে ব্যক্তিগত এবং অনেক সাধারণ গ্রন্থাগার ছিল। সেদেশে জ্ঞানচর্চার বিশেষ কদর ছিল। বোখারাতে চিকিৎসক-দার্শনিক আবু-আলি-ইবন সিনা (অর্থাৎ অবিচেন্না ৯৮০-১২১৭ খ্রিস্টাব্দে) সুলতান ইবনে মনসুরের প্রাসাদ-গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেন, সেখানে একটা ঘরে আরবি ব্যাকরণ ও কবিতা এবং আরেকটা ঘরে আইনের বই; এমনিভাবে প্রতিটি বিষয়ের জন্য আলাদা কামরা ছিল। পণ্ডিত ইবনে আব্বাসের আমলে অর্থাৎ ৯৩৮-৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে চারশ উট বোঝাই পুঁথি ছিল। আর তার সূচি বা ক্যাটালগ ছিল দশ খণ্ডে। নিশাপুর ইস্পাহান, বসরা, সিরাজ ও মসুল প্রভৃতি প্রতিটি শহরে গ্রন্থাগার ছিল।

ইংল্যান্ডের গ্রন্থ-ইতিহাস বেশি পুরোনো নয়। ৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে রেনেভিস্ট বিশপ রোম থেকে বই সংগ্রহ করে তাঁর জন্মস্থান নর্দামব্রিয়াতে প্রতিষ্ঠিত ওয়্যার মাউথ মঠে একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। ৬৭০-৭৩৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সে-দেশে অনেক গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। ৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে নিনেমা'র আক্রমণের ফলে বহু সংগ্রহ নষ্ট হয়ে যায়। তার মধ্যে বিখ্যাত ইয়র্ক ও ক্যান্টারবেরি সংগ্রহও ছিল। দশম শতাব্দিতে উইনচেস্টার, উসেস্টার ও ক্যান্টারবেরি গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। ক্যান্টারবেরি ক্রাইস্ট চার্চের যে-গ্রন্থতালিকা এস্ট্রির প্রায়র হেনরি (১২৮৫-১৩৩১ খ্রিস্টাব্দে) প্রস্তুত করেছিলেন তাতে তিন হাজার বইয়ের নাম পাওয়া যায়।

মানবসভ্যতার প্রথম ঊষার আলো পড়েছিল মধ্যপ্রাচ্য ও মিশরে। ভারতবর্ষে মানবসভ্যতার উন্মেষকাল মধ্যপ্রাচ্যের কালসীমার প্রায় সমসাময়িক। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার থেকে আড়াই হাজার বছরকালের মধ্যে ভারতে সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ লাভ করে। ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা যে খুবই উন্নত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনকার জীবনযাত্রা ও বিভিন্ন ব্যবহার-সামগ্রী আসবাবপত্র ও উন্নত সংস্কৃতির জীবনধারায়। হরপ্পা ও মহেনজোদারোর স্বচ্ছল নাগরিক জীবনযাত্রা ও আর্থিক সঙ্গতিপূর্ণ গ্রামীণ সমাজ কেবল সভ্যতা নয় উন্নত সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয়ও বহন করে। সিন্ধুসভ্যতার সাংকেতিক চিত্রলিপি সমসাময়িক কালে খুবই আধুনিক ও অর্থবহ ছিল। প্রায় তিন শতকেরও অধিক চিত্রলিপি সিন্ধুসভ্যতার সময়ে ব্যবহৃত হতো। সহজেই অনুমান করা যায় যে, এতগুলি চিত্রলিপি দিয়ে লিখিত উপাদান তখন ছিল এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থাও ছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ও প্রতিকুল প্রাকৃতিক পরিবেশের ফলে উত্তরকালের জন্য রক্ষিত উপাদানগুলি বিলীন হয়ে যায়।

নালন্দার অধ্যাপকদের পাণ্ডিত্যের সুখ্যাতি ছিল। তাই সহস্র সহস্র বিদ্যার্থীর শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য একটি বিরাট পুস্তকভাণ্ডার নির্মাণ করে নালন্দা মহাবিহারের স্থাপয়িতা ও কর্ণধারগণ সংগঠনের দিক দিয়ে তাঁদের কর্মকুশলতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এক সুবিশাল অঞ্চল গ্রন্থাগারভবনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। গ্রন্থাগার-ভবনটি বহুতল বিশিষ্ট ছিল। এদের মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য ভবনের নাম যথাক্রমে রত্নদধি, রত্নসাগর ও রত্নরঞ্জক। রত্নদধি নয়তলা বিশিষ্ট ছিল। লামা তারানাথ ও

অন্যান্য তিব্বতীয় পণ্ডিত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে তাঁদের লেখার মধ্যে নালন্দার পুঁথি সংগ্রহের বিশালত্বের কথা উল্লেখ করেন। পরিব্রাজক উৎসিং এবং ইউয়ান চোয়াং এই নালন্দা মহাবিহার হতে যথাক্রমে ৪০০ এবং ২০০-র ওপর মূল গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করে নিয়ে যান। এই তথ্য থেকেই নালন্দা মহাবিহারের সংগ্রহের সংখ্যাধিক্যের কথা সহজেই অনুমান করা যায়। তেরো শতকে তুর্কি-আক্রমণের ফলে নালন্দা মহাবিহার ধবংসপ্রাপ্ত হয়। মহাবিহার ধ্বংসের সঙ্গে এর গ্রন্থাগারটিও অগ্নিদগ্ধ হয়ে যায়।
বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মহাস্থানগড় ও ময়নামতিতে বৌদ্ধবিহার ছিল। সেসকল বৌদ্ধ-বিহারগুলি আবাসিক ছিল এবং প্রত্যেকটিতে সুসংগঠিত সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হলো গ্রন্থাগার-আন্দোলনের স্বর্ণযুগ। তখন সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল।

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় যেসকল দেশ অগ্রণী ভূমিকায় ছিল তার মধ্যে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া), কানাডা, আমেরিকা ও ভারতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুসলমান রাজত্বকালে লিখনশিল্পের উন্নতির অন্যতম কারণ ইসলাম ধর্মের সার্বজনীনতা। সমাজের কোনো স্তরবিশেষে শিক্ষা সীমাবদ্ধ না থাকাতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে পুস্তক ব্যবহারে কোনো সামাজিক বাধা ছিল না। লিখনশিল্পের দ্রুত উন্নতির ফলে পুস্তক প্রণয়ন ও তার ব্যবহারও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মসজিদ, মাদ্রাসা ও মক্তবে কিছু কিছু পুস্তক-সংগ্রহ গড়ে ওঠে বলে জানা যায়।

মুসলমান বাদশাহদের মধ্যে অনেকেই পুস্তকের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তুঘলকের রাজত্বকালে রাজপ্রাসাদে গ্রন্থাগার বা কিতাবশালা ছিল। ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির রাজকীয় গ্রন্থাগারে ২৪,০০০ পুস্তক বা পুঁথি ছিল। হুমায়ূন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আলমগীর প্রমুখ সকল মোগল বাদশাহই পুস্তকের অনুরাগী ছিলেন। হুমায়ূন শেরশাহের 'সেরমণ্ডল' নামক বিশাল প্রসাদটিকে রাজকীয় গ্রন্থাগারে রূপান্তর করেন। আকবরের রাজত্বকালে রাজকীয় গ্রন্থাগারের প্রভূত উন্নতি হয়। আকবরের রাজকীয় গ্রন্থাগারে ২৫,০০০ বই ও পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত ছিল। টিপু সুলতানের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল। যা যুদ্ধের সময় লুণ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত এই সমৃদ্ধ সংগ্রহ ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং বর্তমানে তা লন্ডন শহরে কমনওয়েলথ অফিসের ইন্ডিয়ান অফিসের গ্রন্থাগারটিতে সংরক্ষিত রয়েছে।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান ও তথ্য-সংরক্ষণ প্রক্রিয়া উন্নত হতে থাকে। দেশে দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় নানা ধরনের গ্রন্থাগার। বর্তমান যুগকে এককথায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষের যুগ বলা যায়। মানুষ আজ পাতালপুরী থেকে আকাশে চড়ে বেড়াচ্ছে। মহাকাশ জয়ের নেশায় মত্ত। তাই মানুষ যতই উন্নতির শিখরে উঠছে, ততই গ্রন্থাগার-নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তার সাধনা, গবেষণা ও অনুসন্ধান ক্রমেই গ্রন্থাগারমুখী হয়ে উঠছে। বিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থাগারে বই ও পত্রপত্রিকা সংরক্ষণের পাশাপাশি ফিল্ম, ফিল্মস্ট্রিপ, ম্যাগনেটিক

টেপ, মাইক্রোফিস, মাইক্রোফিল্ম ও কম্পিউটার ইত্যাদি আধুনিক সামগ্রীতে সমৃদ্ধ ছিল। বর্তমানে তথ্য-প্রযুক্তিযুগে গ্রন্থাগারসেবার মান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগার-সফটওয়্যার গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন- Librarz Software: KOHA and GREENSTONE, DSpace and RFID -Digital Librarz Software ও ইন্টারনেট। এ-ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের উন্নতমানের Software গ্রন্থাগারে ব্যবহার করা হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

১. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সম্পাদিত, মুহাম্মদ সিদ্দিক খান রচনাবলী -১; ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪

২. সুলতান উদ্দীন আহমাদ, আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সিরিজ-৫: গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান স্বরূপ সন্ধানে; ঢাকা, প্রগতি প্রকাশনী, ২০০০

৩. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়্যায়; বৈরুত, দারুল ফিকর, ২০০৫

৪. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাহ আল আরাবিয়্যায়; বৈরুত, দারুল ফিকর, ৪র্থ খণ্ড, ২০০৫

৫. হান্না আল ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী; 'বৈরুত: আল মাতবা' আতুল বুলিসিয়্যায়, তা.বি.

ড. মো. রফিকুল ইসলাম
গ্রন্থাগার বিভাগের প্রধান
সাউদার্ন ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, চট্রগ্রাম

নতুনের আহ্বান ও অভিঘাত: ই-বুক, ই-লাইব্রেরি ও ওয়েব-ম্যাগাজিন

গোলাম কিবরিয়া পিনু

বলব, প্রযুক্তি এখন সর্বগ্রাসী নয়, সর্বব্যাপী হয়ে উঠছে। আমাদের জীবনকে সহজ ও গতিশীল করছে প্রযুক্তি। প্রযুক্তি আগেও ছিল, মানুষ তা ব্যবহার করেছে; কিন্তু এই সময়ে এসে প্রযুক্তির ব্যবহার বহু দিক থেকে বিস্তৃত হয়েছে, প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। কোথায় নেই প্রযুক্তি!

ইন্টারনেট-নির্ভর সামাজিক মাধ্যম, ইউটিউব ও সার্চ-ইঞ্জিনের মাধ্যমে মানুষের মতামত প্রদান ও তথ্য আদান-প্রদান খুব সহজ হয়ে উঠেছে। বই এখন কাগজে ছাপা না হয়ে, ই-ভার্সনে প্রকাশিত হচ্ছে, এতে নতুন প্রজন্মসহ অন্য বয়সের পাঠকও সহজে বই পড়তে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। কাগজের বই একসঙ্গে একখানে অনেকগুলো রাখা, বহুদিন ধরে সংরক্ষণ করা, প্রয়োজনের সময়ে বই দূরবর্তী অবস্থান থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, কষ্টকর হয়। এমন পরিস্থিতে ই-বুক শুধু জনপ্রিয় হচ্ছে না, তা বিভিন্ন কারণে ও সুবিধার ফলে গ্রহণযোগ্যও হয়ে উঠছে। বিশ্বের বড় বড় লাইব্রেরি ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা দিচ্ছে, পুরোনো সকল বই ই-ফর্মে রূপান্তরিত করে সংরক্ষণ করছে, পাঠকের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে, পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। যে কাগজের বই শিক্ষার এক মূল উপকরণ হিসেবে ব্যবহার হয়ে বিষয়-তথ্য ও জ্ঞান ছাত্রদের কাছে পৌঁছে যেত, সেই কাগজের বইয়ের বিষয় আজ নানা রকমের আকর্ষণীয় অলংকরণ, ভিডিও-ইফেক্টস, ছবি, রং দিয়ে আরও অনেক গুণ আকর্ষণীয় হয়ে শিক্ষার্থীর কাছে এসে যাচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন ফর্মে–প্রযুক্তির কল্যাণে। এই বাস্তবতা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে, এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতেই হবে।

জ্ঞানচর্চার জন্য বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। নানান বিষয়ের বই পড়ার জন্য লাইব্রেরির চেয়ে ভালো জায়গা আর কী হতে পারে? আধুনিক প্রযুক্তির এই যুগে নিজেকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি দুনিয়ার বিবিধ খোঁজখবরও রাখা জরুরি ও প্রয়োজনীয়। মুহূর্তেই বিশ্বের তথ্যভাণ্ডারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে এখন ব্যবহার হচ্ছে 'ই-লাইব্রেরি'। ই-লাইব্রেরি হচ্ছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত এমন এক আয়োজন, যেখানে মুদ্রিত বইয়ের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক বই বা ই-বুক পড়ার সুযোগ রয়েছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়ার যেকোনো জায়গার নির্দিষ্ট লাইব্রেরি বা প্রকাশকের ডাটাবেজে যুক্ত হয়ে ডিজিটাল প্রকাশনা পাওয়া যাচ্ছে। অনলাইনে পড়া যাচ্ছে বহু মূল্যবান বই, আবার কম্পিউটারে ডাউনলোড করেও পড়া যাচ্ছে। ফলে তা সহজ হচ্ছে–বেঁচে যাচ্ছে অর্থ, সময় ও স্থানের দূরত্ব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়সহ আরও কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু বিভাগ ই-লাইব্রেরি সীমিতভাবে চালু করেছে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমিসহ আরও কিছু

প্রতিষ্ঠান ই-লাইব্রেরির সেবা দিতে এগিয়ে এসেছে। জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার এক্ষেত্রে আশাজাগানিয়া ভূমিকা পালন করতে পাওে নি! বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সব শ্রেণীর বই অনলাইনে প্রকাশ করেছে। ইন্টারনেট থেকে যেকোনো সময়ে যে-কেউ প্রয়োজনীয় বইটি সংগ্রহ করতে পারবেন জাতীয় পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট থেকে।

'সেই বই ডট কম' বাংলা বইয়ের একটি অনলাইন ই-বুক লাইব্রেরি চালু করেছে। স্মার্টফোন বা ট্যাবে পড়ার উপযোগী ফ্রি এবং স্বল্পমূল্যের ই-বুকের এক বিশাল সংগ্রহ রয়েছে 'সেই বই ডট কমে'। এ-ছাড়া 'বইয়ের ঠিকানা', 'গ্রন্থ ডট কম', 'গুডরিডস', 'বইয়ের দোকান', 'ই-বুকস রিড', 'সোভিয়েত বইয়ের অনুবাদ', 'অনলাইন বুক পেইজ'সহ আরও বেশকিছু ই-লাইব্রেরি গড়ে উঠেছে। উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের সহায়ক ইংরেজি ভাষায় নানা বিষয়ের ৩৫ হাজারের বেশি বই দিয়ে সাজানো হয়েছে 'অনলাইন বুক পেইজ' নামের একটি ওয়েবসাইট। নিবন্ধন ছাড়াই যে-কেউ এই ওয়েবসাইট থেকে বই সংগ্রহ করতে পারবেন বিনামূল্যে। এ-ছাড়া আরও শিক্ষা-বিষয়ক বই নিয়ে ই-লাইব্রেরি বাংলাদেশে গড়ে উঠেছে।

বর্তমানে হাতের নাগালে চলে এসেছে তথ্যপ্রযুক্তি; এর বহুমাত্রিক ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। বই তো আর কেবল কাগজে ছাপা, বাঁধানো মলাটে সীমাবদ্ধ হয়ে আজ নেই। কাগজের বইয়ের পাশাপাশি ইলেকট্রনিক বা ই-বুক বা ডিজিটাল ভার্সনে বই পড়ার পাঠকসংখ্যা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্নত বিশ্বে ই-বুক এখন বেশ জনপ্রিয়। আমাদের দেশে ল্যাপটপ, ট্যাবলেট-কম্পিউটার, ই-বুক রিডার এবং সাম্প্রতিক সময়ের মোবাইল ফোনসেটগুলো ইলেকট্রনিক বই পড়াটাকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এমন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত এখন অনেকেই। কম্পিউটারে, ল্যাপটপে তো বই পড়া যায়ই, আবার বই পড়ার জন্য ট্যাব অথবা ই-বুক রিডারেরও ব্যবহার হচ্ছে। কাগজের বই অপেক্ষা দামে সস্তা ই-বুক। কয়েক হাজার ই-বুক ছোটো একটি ডিভাইসে সংরক্ষণ করা যায় বলে কাগজের বই অপেক্ষা অনেক হালকা, সর্বস্তরের পড়ুয়া বিশেষ করে ছাত্র এবং ভ্রমণকারীদের জন্য সুবিধাজনকও।

ডিজিটাল বিশ্বে ই-বুক একটি যুগান্তকারী উদ্যোগ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। নতুন প্রজন্মের কাছে ই-বুক ধারণাটি বইকে শুধু সহজলভ্যই করে তোলে নি, বইকে জনপ্রিয়ও করে তুলেছে। ই-বুকের উত্থানের ফলে পাঠাভ্যাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। অথচ ই-বুকের এ বিপুল সম্ভারে বাংলা বই কাঙ্ক্ষিতভাবে নেই বললেই চলে। ডিজিটাল বিশ্বে বাংলা বইয়ের অবস্থান বাড়াতে সরকারের ও সংশ্লিষ্টদের এগিয়ে আসতে হবে আরও। প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হলে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর ই-সংস্করণ অনলাইনে আমরা সহজেই পেতে পারি। দেশের সমৃদ্ধ লাইব্রেরির মূল্যবান গ্রন্থগুলোকেও পাঠকের কাছে সহজলভ্য করার পদক্ষেপ নেওয়াটা এখন জরুরি। একটি বইনির্ভর ও পাঠ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত নয়া প্রজন্ম সৃষ্টিতে এমন উদ্যোগ শুধু পরিপূরক নয়, গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। দেশে-বিদেশে অবস্থানরত বাংলাভাষীরা অনায়াসে তাদের পছন্দের গ্রন্থ যেন পাঠ করতে পারেন। দেশের

বিশ্ববিদ্যায়গুলো শুধু নয়, জাতীয় আর্কাইভসও তাদের সংগৃহীত দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর ই-বুক ও ই-লাইব্রেরি তৈরি করে বাংলাভাষী পাঠককে জ্ঞানের জগতে পৌঁছে দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

নতুন প্রজন্ম অবশ্য নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছে। কাগজের বই হয়তো আমাদের দেশে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে আরও বেশি আয়ু লাভ করলেও, তা একসময়ে সঙ্কুচিত হবে। আজ যেমন কাগজে মুদ্রিত দৈনিকের দিন ছোটো হয়ে আসছে, কাগজের দৈনিক বন্ধ হচ্ছে, অনেক উন্নত দেশে ই-ভার্সনে দৈনিক বের হচ্ছে। আমাদের দেশের সকল জাতীয় দৈনিকের ই-ভার্সন রয়েছে বলেই যখন ইচ্ছে তখনই পৃথিবীর যেকোনো দেশে অবস্থান করেই দেশের দৈনিক পড়তে পারছি। অন্যদিকে আজ অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা বহুবিধ সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। দৈনিকের সাহিত্যপাতা বা পত্রিকাও তাদের ওয়েব-ভার্সন রাখছে। সেকারণে একধরনের প্রতিযোগিতা থাকছেই।

অনলাইন সাহিত্যপত্রিকা বা ওয়েবম্যাগ তৈরি করার সুযোগ সহজ হওয়ায়, এমন মাধ্যম জনপ্রিয়ও হচ্ছে। এর কারণ বহুবিধ–মানুষ প্রযুক্তির সুযোগ পেয়ে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে তা পড়তে পারে সহজে, এর অলংকরণ ও ছাপা লিটলম্যাগের চেয়ে আরও আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব হচ্ছে, দ্রুত প্রকাশ করাও সম্ভব হয়, এবং লেখা নিয়ে মতামত ব্যক্ত করা যায়। ধীরে ধীরে কাগজে ছাপা লিটলম্যাগের জায়গাটা অনেকটা অনলাইন সাহিত্যপত্রিকা বা ওয়েবম্যাগ দখল করছে, তা ভবিষ্যতে আরও দখল করতে পারে। আমরা জানি–ইতোমধ্যে কাগজে ছাপা পত্রিকা ও সাময়িকী বিভিন্ন দেশে বন্ধ হয়ে গেছে। এই অভিঘাত নতুনের আহ্বান তৈরি করছে, তা তো আর রোধ করা যাবে না পুরোপুরি! তবে, অনলাইন সাহিত্যপত্রিকা সার্কুলেশনে অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে আছে, তবে বিভিন্নভাবে গ্রহণযোগ্য করার ওপরই তার আরও সফলতা নির্ভর করে।

অনেকের সঙ্গে আমি একমত নই যে–আজকের প্রজন্ম, আজকের তরুণেরা, আজকের লোকেরা পড়াশুনা কম করছে! তারা হয়তো কাগজের বই কম পড়ছে কিন্তু বিষয়-তথ্য-তত্ত্ব ও অন্যান্য বহুমুখী জ্ঞান আজ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ফর্মে ধারণ করা হয়ে থাকে–যা অবারিত রয়েছে ইন্টারনেটের দুনিয়ায়–তা থেকে তারা কাগজে ছাপানো বইয়ের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে পারছে সহজেই। এই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে আজকের শিশু-কিশোরেরা যে বিচিত্রমুখী জ্ঞানময় এলাকা দখল করতে পারছে সহজে, তা ১০-২০ বছর আগে সম্ভব ছিল না। এইকালের এই বাস্তবতাকে আমাদের আরও পজিটিভভাবে দেখতে হবে, ব্যবহার করতে হবে, এবং এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলাও করতে হবে।

সাহিত্যকে বাঁচাতে হলে চাই মানসম্মত পাঠাগার

মনসুর হেলাল

যেকোনো কাজের পূর্বশর্ত হচ্ছে সৃজনশীলতা। আর সে কাজটি যদি হয় পাঠাগারের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তখন এর সঙ্গে পঠনপাঠনের দিকটিও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। সেক্ষেত্রে বলা যায়, পাঠাগারে আসে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক। যারা তাদের মনস্তত্ত্বের অন্তর্নিহিত ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে চায় অপার আনন্দে। কারণ আমরা জানি, একটা সময় ছিল, পুস্তকপাঠে আনন্দ হতো। আনন্দের রেশ সমাজে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে এমনকি জীবনেও রাখত দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব। মনের কোনায় রেখে যেত পুস্তকের অন্তর্নিহিত বার্তা। এখনকার সমাজে পাঠক আছেন, বই প্রকাশিত হয় অজস্র, বিভিন্ন পাঠাগারে গিয়ে সেই বইয়ে মনোযোগী হয় বিদগ্ধ পাঠক। কিন্তু পাঠকের কাছে কোনও তথ্য নেই, সমাজ বাস্তবতায় তার কোনও প্রভাব নেই! নেই সুনির্দিষ্ট লেখকের নাম! লেখকেরা ভাবছেন এত বড় অপাঙ্‌ক্তেয় কথার অবতারণা কেন? তার মানে লেখার কি কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই পাঠকদের কাছে? এমনটা যদি ভেবে থাকেন পড়ার শুরুতেই, তবে আপনার এ ভাবনা উদ্রেককারী বাক্যগুলোর জন্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া উপায় নেই।

উপরে উল্লেখিত কথাগুলো মনগড়া নয়। এগুলো পাঠকের অভিব্যক্তি বর্তমান লেখকদের প্রতি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ কিংবা নাটক–কোনও কিছুই পাঠকের মনে ধরছে না। এটা কিসের সংকট? পাঠকের? না লেখকের লেখনির? বলা যদি হয় পাঠকের সংকট–তবে লেখক সম্প্রদায় একটু আত্মপ্রসাদ লাভ করতেই পারেন। তবে ইদানিং পাঠকরাও মূল্যায়ন করা শুরু করেছেন। আজ তারা দ্বিধাহীন চিত্তে বলছেন 'মানসম্মত বইয়ের অভাব আমাদের সাহিত্যকে অন্ধকারে তলিয়ে নিচ্ছে। মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করছে দেশিয় সাহিত্য থেকে।' এতটা বিষাক্ত তীরে আক্রান্ত হয়ে হয়তো লেখক নিজেকে সৃষ্টিশীল সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারেন। পাঠকের অভিযোগ হয়তো কষ্টও আনতে পারে লেখকের মনে। এমনটা হওয়া স্বাভাবিক। তবে মানসম্মত বই যে বাংলাদেশে হচ্ছে না, তা কিন্তু একদম ঠিক নয়।

সম্প্রতি 'জয়তী' নামের একটি পাক্ষিক পত্রিকার পক্ষ থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে 'বাংলাদেশের সাহিত্য বিষয়ে পাঠকের মতামত' শীর্ষক একটি জরিপ পরিচালনা করা হয়। ব্যাপক অর্থে জরিপকাজে কথাসাহিত্যিক আহমদ বশীর, কবি মনসুর হেলাল ও 'জয়তী' সম্পাদক মাজেদুল হাসান গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। এতে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, খুলনার ৬০০ জন শিক্ষক-শিক্ষার্থী-প্রকৌশলী-উকিল-সাংবাদিক-এনজিও কর্মীরা অংশ নেন। জরিপের উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমান বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণ কী ধরনের বই পড়েন, বইগুলো পড়ার জন্য কীভাবে নির্বাচিত করেন, বইগুলোর কথা কেন মনে রাখেন এ সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা লাভ করা। এ-ছাড়াও বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য এবং

ভারতীয় বাংলা সাহিত্য এ-দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি পাঠ করা হয়, তা নিরূপণ করা ছিল জরিপের লক্ষ্য। জরিপে ১১টি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল পাঠকের সামনে। প্রশ্নগুলোর উত্তর যা এসেছে তাতে আতঙ্কিত হওয়ার জোগাড়। পাঠক শুধুমাত্র সাহিত্য-বিমুখই নয়, বইপড়া থেকেই অবস্থান করছেন অনেক দূরে। এমন বাস্তবতায় একথা বলা অসঙ্গত হবে না, পাঠককে পাঠাগার অথবা লাইব্রেরিমুখী করা এখন জাতীয় দায়িত্ব বলেই আমি মনে করি। সারা দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে অসংখ্য পাঠাগার রয়েছে। এগুলোর পাঠকসংখ্যাও কম নয়, কিন্তু অভাব শুধু ওই একটি জায়গাতেই তা হলো সৃজনশীলতা।

এবার পূর্বে উল্লেখিত জরিপের প্রসঙ্গে আসি, প্রায় ৬০০ জন উত্তরদাতার সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পরিচালিত এ জরিপে দেখা গেছে ৮৪% উত্তরদাতা বই পড়েন। ১৬% উত্তরদাতা একেকারেই বই পড়েন না। এর মধ্যে উপন্যাস পড়েন ৬৪%, গল্পের বই পড়েন ৪৪%, রহস্য উপন্যাস পড়তে ভালোবাসেন ৩১%, কবিতার বই পড়েন ২৯%, প্রবন্ধ পড়েন ২১%, রম্যরচনা পড়েন ২১%, ভ্রমণকাহিনি পড়েন ১৮%, নাটক পড়েন ১৭%, শিশুসাহিত্য পড়েন ১২% এবং অন্যান্য বই পড়েন ৪% পাঠক।

পাঠক কোন বিষয়ের বই পড়তে ভালোবাসেন তা নিয়ে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল জরিপে। ১৫টি ক্যাটাগরিতে পাঠকের মতামত চাওয়া হয়। জরিপে দেখা গেছে, সামাজিক জীবনের বর্ণনামূলক বই পড়েন ৪৫%, যেসব বইয়ের মূলবস্তু থাকে প্রেম এমন বই পড়েন ৩৮%, বৈজ্ঞানিক বই পড়েন ৩০%, ইতিহাসাশ্রয়ী বই পড়েন ২৯%, রাজনৈতিক বই পড়েন ২৯%, দর্শনের বই পড়েন ২৩%, অনুবাদ বই পড়েন ২৩%, রূপকথার বই পড়েন ২৩%, ব্যঙ্গ-কৌতুকের বই পড়েন ২৩%, ধর্ম বিষয়ক বই পড়েন ১৯%, অর্থনৈতিক বই পড়েন ১৭%, খেলাধুলার বই পড়েন ১৭%, প্রকৃতি ও পরিবেশ নিয়ে লেখা বই পড়েন ১৬%, গবেষণামূলক বই পড়েন ১১%, আত্মজীবনীমূলক বই পড়েন ৪% পাঠক। জরিপে দেখা গেছে, গত পাঁচ বছরে সবচেয়ে বেশি বই পড়া হয়েছে কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের বই। একাকী হুমায়ূন আহমেদ জনপ্রিয়– ২০% পাঠক এ অভিমত দিয়েছেন। শতকরা ১% উত্তরদাতা যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা হলেন: প্রমথ চৌধুরী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, সত্যজিৎ রায়, সৈয়দ শামসুল হক, আরজ আলী মাতুব্বর, দস্তয়ভস্কি, নিকোলাই অস্ত্রভস্কি, রকিব হাসান, আর্থার কোনান ডয়েল, ড্যান ব্রাউন, মাহফুজুর রহমান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, রফিকুন নবী, আলী ইমাম, মুনির চৌধুরী, সফি উদ্দিন আহমদ, হরিশংকর জলদাশ, যতীন সরকার, সত্যেন সেন, সজল আহমদ, মিহির সেনগুপ্ত, তাহমিনা কোরাইশী। আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো–হিটলারের *মাইন ক্যাম্প* পড়েছেন ১%, ওমাবার *মাই ফাদারস ড্রিম* পড়েছেন ১% পাঠক।

জরিপে একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, পাঠক যে-বইগুলো পড়েছে তা কীভাবে তাদের হাতে এসেছে। এর কারণ হচ্ছে পাঠকের চাহিদা আছে কিন্তু যোগানের মাধ্যমটা কী তা পরীক্ষা করা। প্রশ্নের উত্তরে দেখা যাচ্ছে, পাঠকদের মধ্যে অধিকাংশই নিজের গরজে বই খুঁজে বের

করেছেন। জরিপে দেখা যায়, বই কিনে পড়েছেন ৩৫%, উপহার হিসেবে পেয়ে পড়েছেন ২৫% পাঠক, পাবলিক লাইব্রেরিতে বসে বই পড়েছেন ৫%, ধার করে পড়েছেন ২০%, অমর একুশে গ্রন্থমেলা থেকে কিনেছেন ২% পাঠক। আশ্চর্যের বিষয় হলো, দেশে আরও অসংখ্য পাঠাগার অথবা লাইব্রেরি থাকা সত্ত্বেও এগুলোর নাম তারা কেউ উল্লেখ করেন নি। এক্ষেত্রে একথা স্পষ্ট, পাঠাগার কিংবা লইব্রেরিতে যাওয়া নিয়ে কোনো বড় ধরনের গলদ রয়ে যাচ্ছে কি না?

দেশ-বিভাগের পর থেকে বাংলাদেশ এবং পশ্চিবঙ্গের ভাষা একই হলেও দুই ধারায় বয়ে যাচ্ছে সাহিত্য। এর পাঠকও আলাদা আলাদা। এ জরিপেও উঠে এসেছে সে-বিষয়টি। বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য পড়ে জরিপে অংশ নেওয়াদের মধ্যে ৩৫%, ভারতীয় বাংলা সাহিত্য পড়েন ২২% জন। জরিপে ব্যতিক্রমী একটি পাঠক-প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। যার সুচিন্তিত উপস্থাপনা সত্যিকার অর্থে এখনও আশান্বিত করে তোলে। পাঠক প্রতিক্রিয়াটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

"বাংলা সাহিত্য, না ভারতীয় সাহিত্য বেশি ভালো লাগে তা একবাক্যে বোঝানো সম্ভব নয়। কেননা, লক্ষ করলে দেখা যাবে–বাংলাদেশের সাহিত্যের বয়স ও ভারতীয় সাহিত্যের বয়সের ব্যাপক পার্থক্য। বস্তুত বাংলা সাহিত্য বলতে তো ভারতীয় বাংলা ও এই বাংলা একই ছিল; মাত্র ৪৬ বছর আগে বাংলাদেশের জন্ম এবং নতুন করে বাংলাদেশের সাহিত্য জগতের সৃষ্টি। বাংলা রেনেসাঁসের সময়টাতে বাংলা বলতে একটা অঞ্চলই ছিল, তাই তখন এ-সাহিত্যগুলো ছিল অধিকতর অর্থপূর্ণ–এই ৪৬ বছরের বাংলাদেশের সাহিত্যের থেকে। তাই আমার নিজের দেশ হলেও এখানে বাংলা সাহিত্যকেই অগ্রগণ্য হিসেবে দেখতে হয়। এ-ছাড়াও একটি বিষয় সততার সঙ্গে প্রকাশ করতে চাই, তা হলো বাংলাদেশের সাহিত্য আমার তুলনামূলক অনেক কম পড়া হয়েছে। কেননা সাহিত্য বলতে আমরা যে রবীন্দ্র, নজরুল, মানিক, তারাশঙ্কর বুঝি তারা তো ভারতীয় বাংলার-ই। তাই আলাদা করে বাংলাদেশের সাহিত্য না পড়ে বিচার করা অনুচিত। তবুও যে কতক বই পড়েছি, তার ভিত্তিতে বললে বলতে হয় বিশ্বসাহিত্যের সংস্পর্শ পাওয়ার পর আমাদের দেশের সাহিত্যগুলোকে খুবই সাধারণ মানের মনে হয়েছে।"

দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতা পড়েন অনেক উত্তরদাতা। এর মধ্যে প্রথম আলোর সাহিত্য পাতা পড়েন জরিপে অংশ নেওয়া ১৮%, সমকালের সাহিত্য সাময়িকী পড়েন ৬%, যুগান্তরের ৩%, কালের কণ্ঠের ২%, বাংলাদেশ প্রতিদিনের সাহিত্য পাতা পড়েন ২% পাঠক। এসব সাহিত্য পাতায় ছাপানো গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, অনুবাদ, রম্যরচনা, রহস্য উপন্যাস, নাটক, শিশু-সাহিত্যের পাঠক রয়েছে অনেক। জরিপে দেখা গেছে, এসব দৈনিকের সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত গল্প পড়েন ১৫%, উপন্যাস পড়েন ১৫%, কবিতা পড়েন ১১%, প্রবন্ধ পড়েন ৯%, ভ্রমণকাহিনি পড়েন ৯%, শিশুসাহিত্য পড়েন ৯%, অনুবাদ পড়েন ৫%, রম্যরচনা পড়েন ৫%, রহস্য উপন্যাস পড়েন ৫% উত্তরদাতা। তাছাড়া

ঈদসংখ্যা পড়েন ২% উত্তরদাতা। এসব পাঠকের অধিকাংশই কাছাকাছি কোনো পাঠাগারে অথবা লাইব্রেরিতে বসে পত্রিকা পাঠ করেন। আবার কেউ কেউ নিজেরা কিনে পড়েন।
বই ক্রয়ের অর্থ নেই এমন আছেন ১০% পাঠক, পড়ার সময় পান না এমন আছেন ৩%, বই পড়তে ইচ্ছে হয় না এমন ২%, এবং কাছাকাছি বই ক্রয়ের সুবিধা নেই তাই বই পড়তে পারেন না ১% উত্তরদাতা। এতে পরিলক্ষিত হয় জীবনযাত্রার মান এখনও বহুলাংশে নিম্ন আমাদের সমাজে। যার কারণে মানুষ নিজেকে সমৃদ্ধ করার চিন্তা করা তো দূরের কথা, বেঁচে থাকার সংগ্রামেই তাঁরা হাঁসফাঁস করছেন প্রত্যহ। মূলত তাঁদের জন্য বই পড়ার একমাত্র স্থান হলো পাঠাগার। কিন্তু অনেক পাঠাগারেই পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। আবার অনেক অঞ্চলে পাঠাগারই নেই। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে। বিশেষ করে এক্ষেত্রে রয়েছে বিশাল দায়িত্ব। কারণ জনমানসকে যদি শিক্ষিত করতে হয়, তাহলে শুধু পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞানই পর্যাপ্ত নয়। এর বাইরেও জ্ঞানের যে বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে তার সঙ্গেও সম্পর্ক থাকতে হবে। একথা আর নতুন করে বলার কিছু নেই। জরিপের ফলাফল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে অনেক সত্যকে। সাহিত্যপাঠে আমাদের পাঠকের মনোযোগ কতটুকু!

অথচ যে-দেশের সাহিত্যাঙ্গনে শওকত ওসমান, আবু ইসহাক, জহির রায়হান, শহীদুল্লাহ কায়সার, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, হুমায়ুন আজাদ, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, সৈয়দ শামসুল হক, হাসান আজিজুল হক, মাহমুদুল হক, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ প্রমুখ শক্তিমান লেখকের জন্ম। সে-দেশের পাঠকগোষ্ঠী তাদের বইয়ের স্বাদ আস্বাদন থেকে বঞ্চিত! আমাদের রস আস্বাদনের যে-মান, তাকে অতিক্রম করেই তো উল্লিখিত গুণিজন বাংলাদেশি সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল। তবে কেন তা পাঠক পড়ছেন না? এ প্রশ্নের জবাব দিতে হলে ফিরে যেতে হবে জরিপের ফলাফলের কাছে। তবে একটা বিষয় নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আমাদের সাহিত্যাঙ্গন দিনে দিনে পিছিয়ে যাচ্ছে কেবল রাজধানীকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার ফলে। রাজধানীর বাইরে প্রচুর পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না সমসাময়িক সাহিত্যকে। যার ফলে বই বিক্রির হার কমছে দিনকে দিন। কমে যাচ্ছে পাঠকশ্রেণী। ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতে প্রকাশনা জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন সৎ প্রকাশকেরা।

আমাদের সাহিত্যকে বাঁচাতে হলে সারা দেশে বই বিপণনের পাশাপাশি গড়ে তুলতে হবে আধুনিক সুযোগসুবিধা সম্বলিত মানসম্মত গণপাঠাগার। যেখানে শ্রেণী-পেশা ভেদে সব ধরনের পাঠক বই পড়ার অবাধ সুযোগ পাবেন। তাহলেই হয়তো আমাদের সাহিত্যের বন্ধ্যাত্ব কিছুটা ঘুচবে। তৈরি হবে লেখক-পাঠকের মেলবন্ধন। যা আমাদের প্রত্যাশা।

আপনার পাঠাগারের মূলনীতি আছে কি?

কাজী আলিম-উজ-জামান

একটা কথা আমরা আগেও শুনেছি, এখনও শুনছি, হয়তো ভবিষ্যতেও শুনব। তা হলো পাঠাগারে ঢের বই আছে, কিন্তু পাঠক তেমন নেই। পাঠকের অভাবে পাঠাগার গড়ের মাঠ হয়ে থাকে। কথাটি অবশ্যই সত্য। সরকারি গণপাঠাগারের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, তেমনই সত্য বেসরকারি কোনো গণপাঠাগারের ক্ষেত্রে।

কেন পাঠক নেই বা পাঠাগারের প্রতি পাঠক কেন আকর্ষণ অনুভব করে না, তা নিয়ে বিভিন্ন সভা-সেমিনারে আলোচনা কম হয় না বৈকি। এসব আলোচনায় বিশ্লেষণপূর্বক নানা কারণ উঠে আসে। এর কোনোটাই অপ্রাসঙ্গিক নয়। সবগুলোই গুরুত্বপূর্ণ। এ-লেখায় আমিও একটি বিষয় তুলে ধরার চেষ্টা করব। জানি না এটা বিজ্ঞজনের কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে।

পাঠাগার একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন। একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন পরিচালিত হওয়া উচিত কিছু মূলনীতি দ্বারা। এই মূলনীতি উৎসারিত হয় ওই সংগঠনের বিশ্বাস বা আদর্শের জায়গা থেকে। একজন সাধারণ ব্যক্তি কিংবা একজন পাঠক ওই সংগঠনের সদস্য নাও হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি ওই সংগঠনের মূলনীতির সঙ্গে অভিন্ন মনোভাব পোষণ করেন, তবে তাদের কাজের প্রতি তিনি একধরনের নৈকট্য অনুভব করবেন।
এবার সরাসরি প্রসঙ্গে আসা যাক।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আমাদের ঢাকা শহরে যে-পুরোনো পাঠাগারগুলো আছে, প্রতিটিরই রয়েছে জোরালো কিছু বিশ্বাস ও মূলনীতি। পুরান ঢাকার রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ও পাঠগৃহের কথা বলা যাক। রামমোহন রায় যখন কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচলন করলেন, তখন ঢাকায় এর রেশ এসে পড়ে। এ অঞ্চলে ব্রাহ্ম ধর্মমতের অনুসারীরাই এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং যারা এই আদর্শের মানুষ, তারা এই পাঠাগারের সভ্য হন। এর অর্থ এই নয় যে, সাধারণ পাঠকেরা পাঠাগারের সভ্য হয় নি। তারাও হয়েছে। তবে বিশ্বাসের মানুষেরাই ঝড়ঝাপটা থেকে পাঠাগারটিকে টিকিয়ে রেখেছেন, বোধকরি সাধারণ পাঠকেরা ততটা নন।

একই কথা বলা যায় রাজধানীর আরেকটি শতবর্ষী রামকৃষ্ণ মিশন পাঠাগারের ক্ষেত্রে। এই দুটো পাঠাগার এখনও টিকে আছে, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশন পাঠাগার তো বেশ শক্তভাবে টিকে আছে। পাঠকও যথেষ্টসংখ্যক আছেন বলা যায়। আবার ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন পাঠাগার নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি, ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সী লালবাগের গ্রন্থবিতান, আজাদ মুসলিম লাইব্রেরি, গেন্ডারিয়ার সীমান্ত গ্রন্থাগার–প্রতিটির মূলনীতি আছে। তবে এই চার

পাঠাগার, কারোর সঙ্গেই শক্ত রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিশ্বাস যুক্ত ছিল না। এবং তা না থেকেই কেবল মূলনীতি ও আদর্শ দিয়ে এই পাঠাগারগুলো দীর্ঘদিন পথ চলেছে। এর মধ্যে শতবর্ষী নর্থব্রুক অবশ্য হারিয়ে যাওয়ার দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। তার কারণ অবশ্য ভিন্ন।

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ঢাকায় বেশ কিছু পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। এরকম তিনটি পাঠাগারের কথা জানি। এগুলোতে খুব বেশি পাঠক নেই, তবে সক্রিয় নয় এটা বলা যাবে না। এর উদ্যোক্তাদের অনেকেই ওই রাজনৈতিক দলের আদর্শে বিশ্বাসী। ফলে তারা পাঠাগারটিকে সচল রাখছেন নানা উপায়ে। এর সঙ্গে সাধারণ পাঠক তো কিছু আছেই। যদিও সবসময় কেবল বিশ্বাস দিয়ে কাজ হয় না, কখনো কখনো ব্যক্তির ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, কোনো একটি বিশ্বাস বা আদর্শের সঙ্গে যেসব পাঠাগার প্রতিষ্ঠান যুক্ত আছে, তাদের মধ্যে এক ধরনের সক্রিয়তা আছে। তবে সব পাঠাগারকেই কোনো একটি রাজনৈতিক বা ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে, সেটা কোনো ভালো কথা নয় বরং সেটা না থাকা বরং মন্দ নয়।

২.

একটি কক্ষে শ-তিনেক বই আর চার-পাঁচখানা চেয়ার-টেবিল সাজিয়ে বসলে সেটা পাঠাগারের একটা আদল পায় বটে, তবে একে প্রকৃত পাঠাগার বলা চলে না। পাঠাগার কী, কেন–এটা আগে বুঝে নেওয়া খুবই জরুরি। আমি বা আমরা কেন পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে চাই, আমরা কি সমাজে কোনো অবদান বা ছাপ রাখতে চাই, আমাদের পাঠাগার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ নয় তো? নিজের মনকে এই প্রশ্ন করতে হবে। শুধু শুধু আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার অর্থ নেই।

পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আগে ঠিক করতে হবে এর মূলনীতি বা আদর্শ। এটাকে ঠিক গঠনতন্ত্র বলতে চাই না। আপনার মূলনীতি বা আদর্শই পাঠককে আকৃষ্ট করবে, পাঠককে বই পাঠে ও আলোচনায় উৎসাহিত করবে। আপনি বারবার আপনার মূলনীতির কথা প্রচার করবেন বিশ্বাসের সঙ্গে, আস্থার সঙ্গে।

গণপাঠাগার আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে আমি আপনাদের একটু সহযোগিতা করতে পারি। যেমন আপনার মূলনীতি কী হতে পারে? একটা মূলনীতি হতে পারে, আপনি আপনার পাঠাগারের মাধ্যমে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের পক্ষে সচেষ্ট হলেন। আপনার গণ্ডির মধ্যেই কাজ করতে পারেন। যারা আপনার পাঠাগারের পাঠক, তাদের সচেতন করলেন। হতে পারে আপনি নারী-অধিকার বা নারীশিক্ষা নিয়ে সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিলেন আপনার পাঠাগারের মাধ্যমে। আপনি কাজ করতে পারেন কৃষকের, শ্রমিকের বা খেতমজুরের অধিকার নিয়ে। তাদের সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের যুক্ত

করলেন।

অর্থাৎ মূল বিষয় হলো, বই পড়ে জ্ঞান লাভ করে তা একইসঙ্গে প্রয়োগিক জীবনে কাজে লাগানো বা সচেষ্ট হওয়া খুব জরুরি। বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞান লাভ করে খুব বেশি ফল নেই, যদি তা সমাজের মানুষের কাজে না লাগে। আরেক ধরনের মূলনীতি বা আদর্শে আপনি আস্থা রাখতে পারেন। যেমন রকমারি বইয়ের পাঠাগার না করে, করতে পারেন বিশেষায়িত পাঠাগার। আমাদের দেশে এ ধরনের পাঠাগারের সংখ্যা খুব কম। হতে পারে আপনি কবিতা-বিষয়ক একটি পাঠাগার করলেন, যাতে রাখলেন বাংলা ও ইংরেজি ভাষার নামী সব কবির কবিতার বই ও সমালোচনা।

একইভাবে হতে পারে গল্পবিষয়ক বইয়ের একটি পাঠাগার। একইভাবে উপন্যাস বা প্রবন্ধ বিষয়ে পাঠাগারও করতে পারেন। আবার সাহিত্যিক ধরেও করতে পারেন। করতে পারেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সব বই ও তাঁকে নিয়ে লেখা সেরা বইগুলো নিয়ে একটি পাঠাগার। কেবল গোয়েন্দা কাহিনীনির্ভর বইয়েরও একটি পাঠাগার করতে পারেন। সাহিত্য, সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী বই নিয়েও হতে পারে একটি পাঠাগার। হয়তো দূরদূরান্ত থেকে কোনো গবেষক নিবিষ্টমনে গবেষণা করার জন্য আপনার পাঠাগারটিকেই বেছে নেবেন।

প্রতি গ্রামে হোক একটি পাঠাগার

আবদুস ছাত্তার খান

বৃহৎ মঙ্গলের জন্য সমষ্টিকে নিয়ে কোনো কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার নামই আন্দোলন। বাংলার বেশির ভাগ মানুষের বাস গ্রামে। আর এই গ্রামের মানুষেরাই আমাদের উৎপাদক শ্রেণি। কিন্তু আমাদের সমাজে এই উৎপাদক শ্রেণিই আজকে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত ও অবহেলিত। তাদেরকে এই বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি দিতে বাইরে থেকে ধার করে আনা কিংবা চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়ন মডেলে সম্ভব নয়, সেটি আজ স্পষ্ট। অপর দিকে শহরের মানুষের আত্মকেন্দ্রিকতা, বিলাসিতা, সকলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা বা পরস্পর বিচ্ছিন্নতা ক্রমেই বাড়ছে। সে কারণে আমাদের সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো কোনো দিকনির্দেশনা পাচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ হিসেবে আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতা, পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি কারণকে মোটা দাগে চিহ্নিত করতে পারি। যা রোগের মতো আমাদের সমাজে ছড়াচ্ছে, অথচ পরম আদরের সাথে তাকেই আমরা লালন করছি। আত্মবিলাসি এই দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে এসে সমষ্টিকে নিয়ে বৃহৎ-এর মাঝে নিজেকে যুক্ত করে সকলের মঙ্গলের জন্যই চাই এক বৃহৎ আন্দোলন। আমরা তার নাম দিতে চাই 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন'।

যেভাবে শুরু

২০০৬ সালে ৭ জন মিলে শুরু করি অর্জুনা অন্বেষা পাঠাগারের কার্যক্রম। পরে যোগ দেন আরো অনেকে। এরই মাঝে বর্ষা মৌসুমে শুরু হয় যমুনার ভাঙ্গন। ঘর বাড়ি ভেঙ্গে অনেক মানুষ যেমন হয় সহায় সম্বলহীন তেমনি অনেক কৃষকের আবাদি জমিও যায় পানির তলায়। তাদের জন্যে কিছু একটা করতে মন চাচ্ছিল । ঢাকার একটা ভ্রমণ দলের (বিটিইএফ) সাথে যোগাযোগ ছিল। তারা কিছু করতে চায় এই অসহায় মানুষগুলোর জন্য। আমাদের এলাকা বন্যা কবলিত বিধায় তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে। প্রথমে তারা চিড়া, গুড়মুড়ি ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করতে চায়। আমরা তাদের বলি আপনাদের উদ্যোগটা মহতী এতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের এলাকার এ ধরণের সাহায্য মানুষের কোন উপকারে আসবে না। তার চেয়ে যদি বন্যা পরবর্তী কৃষি পুনর্বাসনে সহায়তা করেন তাহলে গ্রামের মানুষের অনেক উপকারে আসবে। তারা এতে রাজি হন।

পরে আমি আমার নিকট আত্মীয় দুইজনের সাহায্য চাই। তাদের বলি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের তালিকা করে দিতে। তারা একটা তালিকা করে । এতে বেশির ভাগ ছিল একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নাম। যেটা আমারা আশা করিনি। পরে পাঠাগারের সদস্যরা রাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা করে। এখানে একটা অভিজ্ঞতা হয়, তরুণরা অপেক্ষাকৃত নির্মোহভাবে কাজ করতে পারে।

টাকার পরিমাণ ছিল পঞ্চান্ন হাজার। আমার মত ছিল প্রতি পরিবারকে ১০০০ করে টাকা দিতে। কিন্তু তালিকায় অনেকের নাম থাকায় আমরা সমস্যায় পড়ে যাই। পরে এক সদস্য

গবেষনা করে বের করেন আমারা যদি ৫০০ টাকা করে দেই তাহলে ১১০টি পরিবারকে আমরা সহযোগিতা করতে পারবো এবং এ টাকা তাদের কাজেও আসবে। যেমন তখন বাজারদর অনুযায়ী ৩০০ টাকায় ৫ কেজি জালা (ধানের চারা গাছের স্থানীয় নাম) পাওয়া যেত। যা থেকে ৮/১০ মণ ধান পাওয়া সম্ভব হবে। ৪ সদস্যের একটি পরিবার যা দিয়ে অনায়েসে ১ মাস চালিয়ে নিতে পারবে। বাকি ২০০ টাকা সার ও জমি পরিচর্যার কাজে লাগবে।

আমাদের কঠিন শর্ত ছিল এ টাকা দিয়ে অবশ্যই কৃষি কাজ করতে হবে। পাঠাগারের সদস্যরা এ ব্যাপারে নজরও রাখে। প্রায় ৮০ভাগ লোক এ টাকার সঠিক ব্যবহার করেন আর বাকি ২০ ভাগ লোক আর্থিক অনটনের কারণে ঐ টাকা অন্য খাতে খরচ করে ফেলেন। ফসল উঠার পরে তারা নিজেরাই বলেছিল, তারা গড়ে ১০ মণ করে ধান পেয়েছিল। আর ঐ ধান থেকে যে খড় হয়েছিল তার মূল্যই হবে প্রায় ৫০০ টাকা।

২০০৭ সালে সিডর আঘাত হানে বিস্তীর্ণ দক্ষিণ অঞ্চলে। পাঠাগারের পক্ষ থেকে আমরা তাদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেই। সদস্যরা গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ৩০০০ টাকা ও ৫ মণ চাল উঠায়। কিন্তু বিপদ হয় এগুলো আমারা পাঠাবো কি ভাবে। পরে উপজেলা কর্মকর্তার সাথে কথা বলে সরকারের ত্রাণ তহবিলে জমা দিই। কিন্তু মনে সন্দেহ জাগে এগুলো যথাসময়ে যথাযথ লোকের কাছে পৌঁছবে কিনা?

তখন আমাদের মাথায় আসে যদি ঐ এলাকায় আমাদের পাঠাগারের মতো একটা সংগঠন থাকতো আর তাদের সাথে যদি আমাদের যোগাযোগ থাকতো তাহলে এই সামান্য কটা জিনিসই এই বিপদের দিনে কত না কাজে আসতো। আমাদের এই ভাবনা শেয়ার করি ঢাকার রর‍্যমন পাবলিকেশনের রাজন ভাইয়ের সাথে। ওনি আমাদেরকে আশ্বাস দেন। বলেন যত বই লাগবে নিয়ে যাবেন লজ্জা করবেন্ না। পরে আমরা লেগে যাই নানা জায়গায় পাঠাগার দেয়ার কাজে। কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, চাঁদপুর, নাটোর, বদলগাছি, মধুপুর, সখিপুর, ভূঞাপুরসহ নানা জায়গায় আমাদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠতে থাকে পাঠাগার। বিছিন্নভাবে যে পাঠাগারগুলো গড়ে উঠছে আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে থাকি। খাগড়াছড়ির অরং পাঠাগার এ রকম একটি পাঠাগার। আমারা যুথবদ্ধভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য একটি নাম নেই 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন'।

পাঠাগারগুলো গড়ে উঠে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে। এলাকার প্রয়োজন, চাহিদা, ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে স্থানীয়রাই সিদ্ধান্ত নেন কী হবে তাদের কর্ম পরিকল্পনা। কেমন হবে তাদের কার্যপদ্ধতি। যেমন জেলা ও থানা পর্যায়ে সাধারণ পাঠাগার থাকায় সেখানে পাঠাগারগুলো হয় বিশেষ ধরনের পাঠাগার। এরকমই একটি পাঠাগার হলো লাইসিয়াম গণিত ও বিজ্ঞান সংঘ। যেখানে আয়োজন করা হয় বিজ্ঞানের নানা সেমিনার, কর্মশালা, ম্যাথ অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞানমেলা এমনই নানা ধরনের আয়োজন।

সমস্যা যেমন সমাধানও তেমন

বাংলাদেশ সমতল ভূমির দেশ হলেও সর্বত্র এর ভূমিচিত্র এক নয়। ফলে দেশের এক অঞ্চলের সমস্যা বা সম্ভাবনার সাথে অন্য অঞ্চলের সমস্যা বা সম্ভাবনার রয়েছে বিস্তর

তফাৎ। যেমন যমুনার বিস্তীর্ণ চর এলাকার মানুষের যে জীবনযাত্রা, তারা প্রতিনিয়ত যে ধরনের সমস্যা বা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয় এবং এর থেকে উত্তরণে তাদের যে অভিজ্ঞতা তার সাথে কোনো মিল নেই বরেন্দ্র এলাকার মানুষের সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতার সাথে বা তা থেকে উত্তরণ কৌশলের। তেমনি সমুদ্র উপকূলবর্তী দক্ষিণাঞ্চলের সাথে হাওর বা পাহাড়ি এলাকার মানুষেরও সমস্যা বা সম্ভাবনাগুলোও এক নয়। অঞ্চলভেদে দেশের সমস্যাগুলো যেমন ভিন্ন ভিন্ন তেমনি তা থেকে উত্তরণের কৌশলও হতে হবে ভিন্ন ভিন্ন। হাজার হাজার বছর ধরে এ দেশের ভূমিপুত্ররা যেভাবে নিজেদের টিকিয়ে রাখার কৌশল উদ্ভাবন করেছে তার সাথে মেলবন্ধন ঘটাতে হবে আগামীর উন্নয়ন চিন্তাকে। কিন্তু কোনো ক্রমেই চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। কারণ অনুপ্রবেশকারী যতটুকু শৃঙ্খলা আনে তারচেয়ে বিশৃঙ্খলতাই তৈরি করে বেশি।

আমরাও দিতে পারি একটি পাঠাগার

অনেকেই প্রশ্ন করেন পাঠাগার দিতে পয়সা লাগে, জমি লাগে এসব আমরা পাবো কোথায়? হ্যা লাগে কিন্তু তার চেয়েও যেটা বেশি লাগে সেটা হলো ইচ্ছা শক্তি আর আন্ত:রিকতা। একটা পাঠাগার স্থাপনের প্রথম যা দরকার তা হলো সমমনাদের যুথবদ্ধতা। তারপর নিজেদের কাছে যে বইগুলো আছে তা একত্রিত করা। বিদ্যালয় বা করো বাড়ির পড়ার ঘরটাই হতে পারে পাঠাগার। সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য থাকতে হবে একটি কমিটি। বন্ধুরা এইতো হয়ে গেল একটি পাঠাগার। দেখেন এতোটুকু করতে আমাদের কতো টাকা লাগবে। তারপর যদি গ্রামবাসীর কাছে যান একটি করে বই কেনার টাকা (ধরেন ১০০টা)চান, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা ১০০ জনের নিকট দাবি করলে ২০ জন লোক অবশ্যই আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। তারপর ঈদ, পূজা-পার্বনে যখন গ্রামের কর্মজীবীরা গ্রামে আসবে তাদের নিকট গিয়েও যদি অনুরোধ করেন আমার মনে হয় সবাই আপনাদের হতাশ করবে না। মনে রাখবেন পাঠাগার একটি চলমান প্রক্রিয়া। এখানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বই সংযোযিত হবে। আর এভাবেই যদি আপনে লেগে থাকেন কয়েক বছর পর দেখবেন আপনাদের দেয়া এই পাঠাগারটিই আলো ছড়াচ্ছে আপনার গ্রামে।

আমরাও পারি এই আন্দোলনে যোগ দিতে

গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের মূল দর্শন হলো সমষ্টির মুক্তির ভিতরেই ব্যক্তির মুক্তি। আপনে যখন আপনার গ্রামের নানা সমস্যা সমাধানের জন্য সমমনাদের নিয়ে একটা পাঠাগার স্থাপন করবেন তখনই যুক্ত হবেন এই আন্দোলনের সাথে। গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের সাথে যুক্ত হতে ধরা বাধা কোন নিয়ম নেই ।গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন যেহেতু একটা চেতনার নাম তাই এর নেই কোন তথাকথিত সাংগঠনিক কমিটি, নেই কোন সংবিধান। কিন্তু বর্তমান প্রযুক্তির সহযোগিতায় আমরা যুক্ত হতে পারি অতি সহজেই। বলতে পারেন ফেইসবুকে গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন নামের যে পেইজ আছে তাই হচ্ছে আমাদের কার্যালয়। এখনেই আমরা যে কোন সময় যে কোন বিষয় নিয়ে করতে পারি মিটিং, করতে পারি আমাদের ভালো কাজের প্রচারণা। বিনে সুতায় আমরা যুক্ত হতে পারি একে অপরের সাথে। দাড়াতে পারি একজন আরেকজনের আপদে-বিপদে।

থাকবে বাধা অনেক :

কেউ ভাববেন না আপনে বললেন আর গ্রামের সকলেই রাজি হয়ে যাবে। বরং উল্টোটাও হতে পারে। আপনে সহজেই হতে পারেন তাদের মসকরার লক্ষ্যবস্তু। কেউ কেউ আপনাকে পরামর্শ দিতে পারে ু পাবনা থেকে ঘুরে আসতে। সবকিছু অপেক্ষা করে যদি আপনে শুরু করেন তবুও আপনে আপনার পাশে কিছু লোক পাবেন। তখন আপনে হবেন তাদের ইর্ষার বস্তু। নানা ধরণের অপপ্রচার ছড়াবে তারা আপনার বিরুদ্ধে। আপনে বাইরে থেকে কারি কারি টাকা নিয়ে আসছেন, আপনে মেম্বার চেয়ারম্যানে দাড়াবার মতলব করছেন। আপনার পরিকল্পনাকে ভণ্ডুল করবার জন্য স্থানীয় রাজনীতিবীদ ও প্রশাসন পদে পদে আপনাকে বাধার সৃষ্টি করবে। তখন আমাদের একটিই কথা ু ' যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে'। আরো বাংলায় বললে দাঁতে কামড় দিয়ে পড়ে থাকেন।

বর্তমান অবস্থা :

২০০৬ সালে অর্জুনা অন্বেষা পাঠাগার স্থাপনের মাধ্যমে শুরু হয় গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের কার্যক্রম। আজ প্রায় ১৬ বছর পরে গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের দর্শন বিশ্বাস করে এ রকম পাঠাগারের সংখ্যা ৭০ টি । আরো শত শত পাঠাগারের সাথে রয়েছে আমাদের যোগাযোগ। প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি কলেজে ২টি প্রাইমারি স্কুল। গ্রামীণ পর্যটন শিল্পকে বিকাশ করার জন্য অর্জুনাতে শুরু হয়েছে 'গ্রামে ঘুড়ি'র কাজ। গত ৫ বছরে প্রায় শত শত পর্যটক ঘুরে গেছে টাঙ্গাইলের প্রত্যান্ত গ্রাম অর্জুনায়। উপভোগ করেছে যমুনা পাড়ের অর্জুনা গ্রামের সৈন্দর্য। যাত্রীদের দূর্ভোগ লাঘবের জন্য নির্মিত হয়োছলো একটি যাত্রী ছাউনী । ২০০৬ সাল থেকে টাঙ্গাইলের অর্জুনা গ্রামে হয়ে আসছে বইমেলা। গ্রামবাসী এখন চাতক পাখীর মতো অপেক্ষায় থাকে কবে আসবে ফেব্রুয়ারি মাস, কবে শুরু হবে মেলা? এই বইমেলা যেন গ্রামবাসীর মিলনমেলা। যে মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা এই সময়ই বাপের বাড়ি আসে, আর ছেলেরা যারা চাকরি করে তারা এই সময়টাতেই বাড়িতে আসে। ফলে মেলাটা যেন আরেকটা ঈদ উৎসব গ্রামবাসীর কাছে।

আমাদের স্বপ্ন , আমাদের কলেজ

গ্রামের মানুষের দির্ঘদিনের স্বপ্ন ছিলো গ্রামে একটি কলেজ হবে। বারবার নদী ভাঙ্গনের শিকার গ্রামের মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ ছিলো না কলেজ স্থপনের । তাছাড়া গ্রামে কোন শিল্পপতি, আমলা বা জনপ্রতিনিধি নেই যারা সাহস দিতে পারে এই কলেজ স্থাপনের । আমরা অর্জুনা অন্বেষা পাঠাগার থেকে ২০১৩ সালে ঘোষণা দেই আমাদের গ্রামে আমরা একটি কলেজ স্থাপন করবোই । গ্রামের সভ্রান্ত হাজীবাড়ির লোকেরা কলেজের জন্য জমি দিতে আগ্রহী হয়। আমরাও উঠে-পড়ে লেগে লেগাম। সালটি ছিলো কবি গুরুর নোবেল প্রাপ্তীর শতবছর পূর্তি। তাই আমরা সিধান্ত নিলাম ২০১৩ সালেই ডিসেম্বর মাসে আমরা কলেজ স্থপন করবো । পাঠাগারের সদস্য ও গ্রামের যুব সমাজ নিজেরা মাটি কেটে দিলো ।

ফেইসবুকের বন্ধুদের নিক থেকে পেলাম অকুণ্ঠ সমর্থন। কেউ অনুদান , কেউ ধার দিয়ে আমাদের স্বপ্ন কে দাড় কঁরিয়ে দিলো । প্রথম থেকে অন্য কলেজের মাধ্যমে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থাকলেও ২০১৮ সালে কলেজটি কারিগরি শিক্ষাবোর্ডে থেকে পাঠদানের অনুমতি পায়। করনার ধকর পেরিয়ে কলেজ থেকে বের হয়ে গেছে প্রথম ব্যাচ। দ্বিতীয় ব্যাচের পরীক্ষা আগামী নভেম্বরে।
কলেজে রয়েছে ১৫০ প্রজাতির ফলদ, ভেষজ, বনজ বৃক্ষের বাগান, ১০টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ একটি আধুনিক ল্যাব। যেখনে গ্রামের তরুণ তুরণীরা পাচ্ছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।

আগামীর পরিকল্পনা :
আমরা স্বপ্ন দেখি গ্রামে গ্রামে পাঠাগার স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিনে সুতায় একটা নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে, আপদে-বিপদে একজন আরেকজনের পাশে দাড়াতে, নিজেদের ইতিহাস-সংস্কৃতি রক্ষায় নিজেদের ভূমিকা রাখতে। তাই আমাদের পরিকল্পনা হলো আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে প্রতিটি ইউনিয়নের কোন না কোন গ্রামে একটি করে পাঠাগার স্থাপিত হবে।
গ্রামে গ্রামে পাঠাগার করতে গিয়ে আমরা যে জিনিসটার অভাব চরমভাবে লক্ষ্য করেছি তা হলো শিশু-কিশোরদের মান সম্পন্ন বইয়ের খুব অভাব। অথচ গ্রামের পাঠাগারের পাঠকই হলেন এই শিশু কিশোররা । কারণ মোটামুটি এসএসসি পরীক্ষা দেয়ার পর হয় উচ্চ শিক্ষা না হয় চারকরির খোঁজে তাদরে গ্রামের বাইরে চলে আসতে হয়ে। ফলে এই শিশু-কিশোররাই হলো তাদের মূল পাঠক। কিন্তু মা সম্পন্ন বইয়ের অভাবে বা তাদের বইয়ের অতি উচ্চ মূল্যের কারণে পাঠাগারের সংগঠকদের চাহিদা মতো বই সংগ্রহ করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। ফলে তারা পাঠকও টানতে পাচ্ছে না । পরে একটা সময় দেখা যায় অনেক সংগঠকই আর পাঠাগার চালাতে পাচ্ছে না । তাই আমরা সিধান্ত নিয়েছি ডিসেম্বরে পাঠাগার সম্মেরনের আগে আমরা একটা প্রকাশনা সংস্থা গড়ে তুলবো । সেখান থেকে না লাভ, না লোকশান এই নীতির ভিত্তিতে সুলভ মূল্যে মানসম্পন্ন বই প্রকাশ করবো ।

সারা দেশের পাঠাগার সংগঠক ও পাঠাগার সুহৃদদের মধ্যে আন্ত:যোগযোগ স্থাপন, পাঠাগারের সমস্যা, সম্ভাবনা, প্রতিকূলতা , তা থেকে উত্তরণের উপায় ইত্যাদি নান বিষয় নিয়ে আগামী ডিসেম্বরে ভূঞাপুরের অর্জুনা গ্রামে আমাদের স্বপ্নের কলেজ প্রাঙ্গনে তিনদিনব্যাপী আবাসিক পাঠাগার সম্মেলন আয়োজন করতে যাচ্ছি। আশা করি এই সম্মেরনের পর সারা বাংলাদেশে পাঠাগার সংগঠকদের মঝে একটা প্রাণের জোয়ার সৃষ্টি হবে।

গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের ঘোষণা
আমরা আমাদের অবস্থান দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি। গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন শুধু পাঠক তৈরির আন্দোলন নয়। পাঠক যেমন তৈরি হবে একই সাথে তারা হবে সমাজমনস্ক। গ্রামের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা। তারপর সকলকে নিয়ে স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে সবচেয়ে সস্তায়, সহজ বিকল্প উপায়ে অতিদ্রুত তার সমাধান করা। কোনোভাবেই সরকার বা অন্য কোনো

সংগঠনের দিকে তাকিয়ে থাকা যাবে না। যেমন দক্ষিণাঞ্চলে বন্যা বা জলোচ্ছ্বাসের কারণে মাঝে মাঝে বাঁধ ভেঙ্গে লোনা পানি আবাদি জমিতে ঢুকে পড়ে। এতে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। যদি দ্রুত বাঁধ মেরামত করা না হয় তবে প্রতিদিন জোয়ারের পানি প্রবেশ করে এবং জমির লবণাক্ততা বাড়িয়ে দেয়। ফলে জমির দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হয়। কিন্তু এ সময়ই যদি একদল উদ্যোগী মানুষ একত্রিত হয়ে গ্রামের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে বাঁধ মেরামতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে তবে তা অতি সহজে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প শ্রমেই দ্রুত মেরামত করা সম্ভব। যা আমরা মাঝে মাঝে বিভিন্ন দৈনিকে সচিত্র প্রতিবেদন আকারে দেখতে পাই। এখন আমরা ঐ স্বল্প অথচ সংঘবদ্ধ মানুষগুলোর নিরন্তর প্রচেষ্টাকেই আমরা নাম দিতে চাই 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন'। কারণ ঐ মানুষগুলোর কাছে পুরো গ্রামটাই একটা পাঠাগার। গ্রামের মানুষগুলো হলো বই। আর কলম হলো গ্রামের প্রাকৃতিক সম্পদ। যা দিয়ে সে রচনা করতে পারে গীতাঞ্জলির মতো এক একটা গীতাঞ্চল।

বন্ধু তুমি পাশে থেক

আপনেও হতে পারেন আমাদের স্বপ্নের সারথী। বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠা পাঠাগারগুলোতে বই দিয়ে, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে, আমাদের স্বপ্নের কলেজের পাশে দাড়িয়ে, এই আন্দোলনের কথা প্রচার প্রচারণা চালিয়ে আপনেও হতে পারেন আমাদের আন্দোলন কর্মী।

সাক্ষাৎকার

যথোচিত উদ্যোগের অভাবই তরুণদের বইবিমুখতার মুখ্য কারণ:

মিনার মনসুর

[কবি ও গবেষক মিনার মনসুর। দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করেছেন। বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুলাই চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার বরলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পড়াশোনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতি-সচেতন কবি নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি করেছেন কবিতায়।
পঁচাত্তর-পরবর্তী চরম প্রতিকূলতার মধ্যে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেছেন 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ' শিরোনামে বই। তাঁর উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত গ্রন্থ 'শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আত্মকথা' (১৯৯৫); 'মুক্তিযুদ্ধের উপেক্ষিত বীর যোদ্ধারা' (২০০৮), 'বাংলাদেশের সমাজ, রাজনীতি ও উন্নয়ন: বিশিষ্টজনের ভাবনা' (২০১০)।
বঙ্গবন্ধুর শতবর্ষে কাজ করছেন বইপড়া কর্মসূচি, পাঠাগার আন্দোলন ও প্রতিযোগিতা নিয়ে। অন্যদিকে বইমেলা হওয়া না হওয়া নিয়ে লেখক-পাঠকদের মধ্যে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া চলছে। এ নিয়ে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক হিসেবে তাঁর ভাবনাসহ সামগ্রিক বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন কবি **ইমরান মাহফুজ**।]

সামাজিক মুক্তিতে বইয়ের ভূমিকা সম্পর্কে কতটা অনুভব করেন। তথা জ্ঞান ও মননশীলতার উৎকর্ষ সাধনে বই কতটা সহায়ক?

মিনার মনসুর: খুব সংক্ষেপে বললে, তথ্যপ্রযুক্তির এই মহাবিপ্লবের কালেও বইয়ের বিকল্প কেবল বই, বই এবং বই। এটি কোনো আবেগের কথা নয়, দেশকাল নির্বিশেষে দীর্ঘ পথ হেঁটে অনেক অভিজ্ঞতার আগুনে দগ্ধ হয়ে এটাই হলো বিশ্ব মানবগোষ্ঠীর সর্বজনীন ও সর্বসম্মত অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞান। শত শত বছর ধরে এটা প্রমাণিত যে, সামাজিক মুক্তি শুধু নয়, দৃশ্য-অদৃশ্য যত ধরনের শৃঙ্খল মানবসমগ্রের অগ্রযাত্রাকে পদে পদে বাধাগ্রস্ত করেছে এবং করছে। তা থেকে মুক্তির মন্ত্র নিহিত আছে কেবল বইয়ের নিরাবেগ বক্ষে। বাইরের সব আলো নিভে গেলেও বইয়ের আলো কখনোই নির্বাপিত হয় না।

বই প্রকাশনা শিল্পকে উৎসাহিত ও লাভজনক শিল্পে পরিণত করতে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আপনার সময়কালে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে?

মিনার মনসুর: প্রথমেই বলে রাখতে চাই যে, এটি একটি বিশাল, বহুমাত্রিক ও দীর্ঘমেয়াদী কাজ। সরকারের একার পক্ষে কখনোই তা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে প্রকাশকদের ভূমিকা মুখ্য হলেও লেখকসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সমন্বিত ও আন্তরিক উদ্যোগ দরকার। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের প্রকাশনা খাতের ব্যাপক সমৃদ্ধি সত্ত্বেও এক্ষেত্রে কার্যকর, সুচিন্তিত ও দূরদর্শী উদ্যোগের অভাব অত্যন্ত প্রকট।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিবছর প্রকাশকদের কাছ থেকে কয়েক কোটি টাকার বই ক্রয় করে তা আট শতাধিক বেসরকারি গ্রন্থাগারে অনুদান হিসেবে বিতরণ করে থাকে। পাশাপাশি, বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন করা হয়। উৎসাহিত করা হয় বইমেলা ও বইভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণে। দেশের বাইরে ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা, কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলাসহ বেশ কিছু বইমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগও সৃষ্টি করা হয়। উদ্দেশ্য একটাই, সেটি হলো প্রকাশনা শিল্পের বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন।

ঢাকার মতো বইমেলা সারা দেশে হয় না। তথাপি মেলাকেন্দ্রিক বইপ্রেমকে কীভাবে দেখছেন?

মিনার মনসুর: আমাদের প্রকাশনা খাতের শিল্প হয়ে ওঠার পথে যে ক'টি অন্তরায় রয়েছে; তার মধ্যে এই 'মেলাকেন্দ্রিক বইপ্রেম' অন্যতম বললে বোধ করি খুব একটা বাড়িয়ে বলা হবে না। অমর একুশে বইমেলা নিঃসন্দেহে আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার অন্যতম বৃহৎ ও মহৎ উৎস। উৎসবও বলা চলে। তবে ভুললে চলবে না যে, এটি নিছক বইয়ের মেলা মাত্র নয়। বরং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও অঙ্গীকারের মিলনমেলাও বটে। একুশের প্রভাতফেরিকে ঘিরে যার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি; যার সূত্রপাত সেই পঞ্চাশের দশকে–বইমেলা শুরু হওয়ার বহু বছর আগে এবং আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি রচনার ক্ষেত্রেও এর নিয়ামক ভূমিকা অনস্বীকার্য।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, অমর একুশের এই চেতনাধারার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গেছে সৃজনশীলতার বিশাল এক কর্মযজ্ঞ–যার নাম অমর একুশের বইমেলা। মাসব্যাপী এই বইমেলা আমাদের প্রকাশনা খাতের জন্যে বিশাল প্রণোদনা হিসেবে কাজ করছে সন্দেহ নেই। ফলে বহু বছর ধরে প্রকাশকদের সাংবাৎসরিক কর্মতৎপরতার একটি উল্লেখযোগ্য অংশই বাস্তবায়িত ও পরিচালিত হয় এই বইমেলাকে ঘিরে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, প্রকাশনাকে পরিপূর্ণভাবে শিল্প হয়ে উঠতে হলে অবশ্যই এই নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে হবে। বছরব্যাপী বই প্রকাশ ও বিপণনের বিকল্প পন্থা খুঁজে বের করতে হবে।

সম্প্রতি জেনেছি, বেসরকারি গ্রন্থাগারের জন্য একজন করে হলেও অন্তত গ্রন্থাগারিক সরকারি সম্মানির আওতাভুক্ত হবেন। সে-বিষয়ে কিছু বলবেন?

মিনার মনসুর: বর্তমানে ব্যক্তি বা পারিবারিক উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি পাঠাগারগুলো সচল রাখা যে কতটা কষ্টসাধ্য, তা আমরা সবাই কম-বেশি জানি। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তিল তিল করে যে পাঠাগারগুলো গড়ে তোলা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে সেসব পাঠাগারের দরজা খোলা রাখার মতো কর্মী খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়েছে। এর পেছনে যে-আর্থসামাজিক বাস্তবতা রয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমি এমন অনেক পাঠাগারের কথা জানি, যার উদ্যোক্তারা সারাদিন চাকরি করে সন্ধ্যায় এসে পাঠাগারের দরজা খুলে বসেন। নিজেরাই দৌড়ঝাঁপ করে বই সংগ্রহ করেন। কিন্তু বেশিরভাগ

পাঠাগারের পক্ষে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। সমস্যাটি সম্পর্কে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংসদীয় কমিটিসহ আমরা সবাই অত্যন্ত সচেতন। বিশেষ করে এ ব্যাপারে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ আন্তরিকভাবে কার্যকর কিছু করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন শুরু থেকেই। এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। তিনি খুব উদ্যমী মানুষ। আমাদের চেষ্টা অব্যাহত আছে।

গত বছর 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শিরোনামে প্রতিযোগিতা শেষ করেছেন। এতে তরুণদের মধ্যে নতুন কী আলো দেখেছেন?

মিনার মনসুর: আমি অভিভূত বললে কমই বলা হয়। এটি ছিল একটি পরীক্ষামূলক কর্মসূচি। আপনি জানেন, করোনার কারণে ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে বিশ্বজুড়েই একটা অচলাবস্থা চলছে। আমাদের বিদ্যালয়গুলো বন্ধ। পাঠাগারগুলোয় ধুলো জমছে। লাখ লাখ কিশোর-তরুণ শুধু যে ঘরবন্দি হয়ে পড়েছে তা-ই নয়, আগে থেকেই কিশোর-তরুণদের বইবিমুখতার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোয় তাদের আসক্তি বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে। এদিকে বহুল প্রত্যাশিত মুজিববর্ষকে সামনে রেখে গৃহীত আমাদের প্রায় সব কর্মসূচিই স্থগিত হয়ে গেছে।

এরকম দম বন্ধ করা একটি অবস্থায় রাজধানীর স্বনামখ্যাত ১০টি পাঠাগারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা পরীক্ষামূলকভাবে 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' কর্মসূচিটি গ্রহণ করি। আমরা তিনটি গ্রুপে স্কুলের শিক্ষার্থীদের বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী', কলেজের শিক্ষার্থীদের 'কারাগারের রোজনামচা' এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের 'আমার দেখা নয়াচীন' বই তিনটি পড়তে দেই। আমাদের টার্গেট ছিল ১৫০ জন শিক্ষার্থী। করোনার কারণে শিক্ষার্থীরা আদৌ এ ব্যাপারে আগ্রহী হবে কি না তা নিয়ে আমাদের শঙ্কা ছিল। কিন্তু বাস্তবে কয়েক গুণ বেশি শিক্ষার্থীর সাড়া আমরা পেয়েছি। বই তিনটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা যে-পাঠপ্রতিক্রিয়া লিখেছে, দেশবরেণ্য তিনজন বিচারক তা মূল্যায়ন করেছেন। তাঁরা হলেন–অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন ও মুক্তিযুদ্ধ-গবেষক মফিদুল হক। তিন জনই অভিভূত হয়েছেন এবং একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, কিশোর-তরুণরা বই পড়তে চায় না বলে যে অভিযোগটি প্রায়শ আমরা করে থাকি; তা সত্য নয়। বস্তুত যথোচিত উদ্যোগের অভাবই তরুণদের বইবিমুখতার মুখ্য কারণ বলে আমাদের মনে হয়েছে।

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে ও জনসাধারণকে উৎসাহিত করতে গ্রন্থকেন্দ্রের নতুন আর কী কী পরিকল্পনা আছে?

মিনার মনসুর: এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক একটি প্রশ্ন। বলতে পারেন, এটিই গ্রন্থকেন্দ্রের মূল কাজ। মূলত এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই গ্রন্থকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। গ্রন্থকেন্দ্রের বয়স এখন পঞ্চাশের বেশি। কিন্তু এক্ষেত্রে কাজ তেমন হয় নি কিংবা হলেও তা সমাজে স্থায়ী কোনো প্রভাব তৈরি করতে পারে নি।

মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এই মহালগ্নে আমরা এখন সেদিকেই সর্বাধিক মনোযোগ দেওয়ার সর্বাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছি, যদিও এক্ষেত্রে জনবলসহ নানা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, ইতোমধ্যে আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছি খুবই সফলভাবে। অতি সম্প্রতি বেসরকারি পাঠাগারগুলোকে সম্পৃক্ত করে 'পড়ি বঙ্গবন্ধুর বই, সোনার মানুষ হই' শীর্ষক জাতির পিতার তিনটি গ্রন্থপাঠ কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। এতে বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ১৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে 'মুজিব শতবর্ষে শত পাঠাগার'–এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের একশটি সেলুনে 'সেলুন লাইব্রেরি' চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'মুজিববর্ষের অঙ্গীকার/গ্রামে গ্রামে পাঠাগার'–এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে আমরা বইপড়া কার্যক্রমকে সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। বই শুধু পাঠালেই হবে না, সব বয়সী মানুষকে বইমুখী করার জন্য সুচিন্তিত উদ্যোগও থাকতে হবে। আমরা সেদিকটাতেই বেশি মনোযোগ দিচ্ছি।

এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি– 'সচরাচর কবি-সাংবাদিকদের দিয়ে প্রশাসনিক কাজ হয় না' বলে জনশ্রুতি আছে। কিন্তু আপনি সেই প্রবাদবাক্য ভুল প্রমাণ করেছেন। কীভাবে সম্ভব?

মিনার মনসুর: সেটি কতটা পেরেছি কিংবা আদৌ পেরেছি কি না আমি নিশ্চিত নই। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, নিয়ত বা উদ্দেশ্যর সততা, সুদৃঢ় সংকল্প ও কর্তব্যনিষ্ঠা থাকলে যেকোনো কঠিন কাজই সফলভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব। আমার দীর্ঘ ও বিচিত্র কর্মজীবনে আমি বারবার তার প্রমাণ পেয়েছি।

দ্বিতীয়ত, যে জিনিসটি দরকার সেটি হলো আত্মবিশ্বাস। সেই আত্মবিশ্বাস আসে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে, শিক্ষা থেকে এবং অবশ্যই অক্লান্ত শ্রম, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় থেকে। কাজ বলি আর দায়িত্বই বলি–তাকে ভালোবাসতে হয়, উপভোগ করতে হয়। এক্ষেত্রে গীতায় যাকে 'নিষ্কাম কর্ম' বলা হয়েছে সেই দীক্ষাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আমার মনে হয়েছে।

আমার বিশ্বাস, আমাকে যারা চেনেন-জানেন তারা একবাক্যে সাক্ষ্য দেবেন যে, আমার এ-ক্ষুদ্র জীবনের সব পর্যায়ে সব কাজে আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন বা অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। আমি কখনও জ্ঞানত ব্যক্তিগত লাভালাভ, প্রাপ্তি বা খ্যাতির পেছনে ছুটি নি।

আপনি পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে চরম প্রতিকূলতার মধ্যে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেছেন 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ'। অনেকে বলেন এ অসামান্য কাজের স্বীকৃতি হিসেবে আপনি গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক। কীভাবে দেখেন বিষয়টি?

মিনার মনসুর: আপনি জানেন, 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ' পঁচাত্তর-পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশিত প্রথম সংকলনগ্রন্থ। এ-গ্রন্থটি প্রকাশ করার আগে ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর তৃতীয় শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমরা 'এপিটাফ' নামে

একটি লিটলম্যাগ বের করেছিলাম। লেটারপ্রেসে মুদ্রিত সেই ম্যাগাজিনটির প্রচ্ছদ জুড়ে ছিল বঙ্গবন্ধুর ছবি ও বাণী। ভেতরে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বেশ কিছু গদ্য ও কবিতা। ভাবুন তো একবার, সপরিবারে জাতির পিতাকে নৃশংসভাবে হত্যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ঘাতকরা যখন ক্ষমতায়–তাদের জিহ্বা তখনও রক্তলোলুপ, সেই সময়ে ১৮ বছর বয়সী সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত দুজন তরুণ স্বনামে, স্বঠিকানা ব্যবহার করে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এ ধরনের কাজ করছে! এর জন্যে কতটা দায়বদ্ধতা, দেশাত্মবোধ ও দুঃসাহস লাগে, তা এখন অনুমান করাও কঠিন। কোনো ধরনের প্রাপ্তির প্রত্যাশা তো দুরস্ত, আমরা আমাদের জীবনটাকেই বাজি ধরেছিলাম তখন।

ঠিক স্বীকৃতি কিনা জানি না, তবে মুজিববর্ষ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর এ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে আমার উপর অর্পিত দায়িত্বটি আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমরা মুক্তিযুদ্ধের সন্তান। সেই শৈশবেই বই, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ–এই তিনকেই শিরোধার্য করেছিলাম। এখন কর্মজীবনের শেষ পর্যায়ে এসে এরকম একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করতে পারছি, যেখানে এ-তিনের অচ্ছেদ্য যোগ রয়েছে–এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কী হতে পারে!

পড়েছেন বাংলায়, লেখেন কবিতা, করেছেন গবেষণা ও সাংবাদিকতা। গ্রন্থকেন্দ্রের দায়িত্বকে কেমন উপভোগ করেন?

মিনার মনসুর: কাজটি কঠিন ও শ্রমসাধ্য হলেও দায়িত্বটি সত্যিই আমি উপভোগ করছি। কেন উপভোগ করছি তা আমি আগেই বলেছি। কাকতালীয় বিষয় হলো, আমি আমার সামান্য জীবনে যা যা করেছি, শিখেছি এবং স্বপ্ন দেখেছি–সবকিছুর সঙ্গেই দায়িত্বটির নিবিড় যোগ রয়েছে।

দায়িত্ব নেওয়ার পর আপনার লেখালেখি, গবেষণা ও সম্পাদনার কাজ কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

মিনার মনসুর: একটি সংস্থার প্রধান নির্বাহীকে নানা ধরনের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে হয়। বিপুল সময় ও শ্রম দিতে হয় এ-দিকটায়। তার ওপর তো সংস্থার বার্ষিক কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব থাকেই। থাকে জাতির স্বপ্ন ও প্রত্যাশার আলোকে প্রতিষ্ঠানটিকে সঠিক পথনির্দেশনা দেওয়ার স্বকীয় সৃজনশীল কিছু ব্যাপারও। পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে এসব দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমার পড়া, লেখাসহ সৃজনশীল ও সামাজিক কাজে একেবারেই সময় দিতে পারছি না। এর জন্য তীব্র মনোকষ্ট আছে। তবে এটাকে ঠিক ক্ষতি বলতে চাই না, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব পালন করতে পারছি–এও তো কম গৌরবের বিষয় নয়।

রাষ্ট্রের বহুমাত্রিক সংকটে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা নিয়ে আপনার মতামত জানতে আগ্রহী–

মিনার মনসুর: দেখুন, আমরা যখন শিক্ষাজীবন শুরু করি তখন সারা দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল হাতেগোনা কয়েকটি। এখন তা শত ছাড়িয়ে গেছে। অথচ সেরকম কোনো গবেষণাকর্ম কি চোখে পড়ছে? এমনকি এই যে মুজিববর্ষ চলছে, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও দর্শন নিয়ে কি উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয়েছে? আপনি দেখবেন, যখন দেশে মাত্র চার-পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, তার প্রভাব সারা দেশ অনুভব করেছে। আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ও সংগ্রামকে প্রাণসঞ্চার করেছে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কিন্তু এখন? আমার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যায় বাড়লেও তারা তাদের যথাযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারছে না। কেন পারছে না, সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গই ভালো বলতে পারবেন।

‘গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন সবার সঙ্গে সবাইকে সংযুক্ত করে গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাবে’

–খান মাহবুব

শ্রুতি লেখক: সাদিয়া ইসলাম শান্তা

[১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের রক্তঝরা সময়ে ৩ মে নানাবাড়ি টাঙ্গাইলের করাতিপাড়ায় প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং শিক্ষক খান মাহবুবের জন্ম। স্বাধীনচেতা ও অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী খান মাহবুব কিশোর বয়স থেকেই টাঙ্গাইলের সংস্কৃতি অঙ্গনের পরিচিত মুখ। বিতর্ক, কবিতা, বক্তৃতায় রয়েছে অসংখ্য পুরস্কারের স্বীকৃতি। তিনি টাঙ্গাইল শহরের সরকারি বিন্দুবাসিনী স্কুল থেকে এসএসসি ও সরকারি এম এম আলী কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেন। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে কলেজ পর্যায়ে বিতর্কে অর্জন করেছেন জাতীয় পুরস্কার। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে অর্থনীতির প্রতিবেদন ও ফিচার লিখে জাতীয় পত্রিকায় পরিচিতি অর্জন করেন। নিজেকে যুক্ত করেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের বিতর্ক প্রতিযোগিতার একজন সংগঠক হিসেবে। তিনি ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে নিজ উদ্যোগে গড়ে তুলেছেন পলল প্রকাশনী ও ছোঁয়া এ্যাড. নামে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

খান মাহবুব দেশের প্রকাশনা শিল্পের একজন সুপরিচিত ব্যক্তি। বহুমাত্রিক লেখালেখি থাকলেও তিনি প্রকাশনা ও আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক লেখালেখিতে অধিক আগ্রহী। ‘এসময়ের অর্থনীতি’ খান মাহবুবের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এ ছাড়া তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে একাধিক গ্রন্থ। রচিত গ্রন্থ–‘বইমেলা ও বই সংস্কৃতি’, ‘বই’, ‘বইমেলা ও প্রকাশনার কথকতা’, ‘গ্রন্থচিন্তন’, ‘টাঙ্গাইল জেলা পরিচিতি’, ‘টাঙ্গাইলের অজানা ইতিহাস’, ‘আটিয়ার ইতিহাস’, ‘জানা-অজানা মালয়েশিয়া’, ‘পথে দেখা বাংলাদেশ’ ও ‘রোহিঙ্গানামা’ ইত্যাদি পাঠকমহলে সমাদৃত।

প্রকাশনা জগতে তিনি একজন নেতৃস্থানীয় সংগঠক। বই, বই প্রকাশনা ও বইমেলা সংক্রান্ত জাতীয় আয়োজনের বিভিন্ন দায়ি'ত্ব কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে খান মাহবুবের। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন স্টাডিজ বিভাগ চালুর ক্ষেত্রে ছিল তাঁর বিশেষ ভূমিকা। বর্তমানে বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। লেখকদের সংগঠন ‘লেখক সম্প্রীতি’র মহাসচিব তিনি। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পরিচালিত সাংস্কৃতিক সমীক্ষার টাঙ্গাইল জেলার গবেষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালার ‘প্রবাদ-প্রবচন’ গ্রন্থে রয়েছে খান মাহবুবের সংগৃহীত টাঙ্গাইল জেলার প্রবাদমালা। সম্প্রতি খান মাহবুবের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে ‘টাঙ্গাইল জেলার স্থাননাম বিচিত্রা’। শিল্পমনা খান মাহবুব বাংলা একাডেমি, ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটসহ অনেক প্রতিষ্ঠানের

সদস্য।]

সম্প্রতি পাঠাগার আন্দোলন, বই ও প্রকাশনার নানা বিষয় নিয়ে সাহিত্য সমালোচক ও প্রাবন্ধিক **লাবণী মণ্ডলের** সঙ্গে কথোপকথনে নিজের মতামত তুলে ধরেছেন খান মাহবুব। নিচে সে-কথোপকথন প্রকাশ করা হলো।

লাবণী মণ্ডল: 'পাঠাগার' শব্দটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
খান মাহবুব: শাব্দিক অর্থ তো এর ভেতরেই নিহিত। পাঠের 'আগার' হচ্ছে পাঠাগার। যেখানে পাঠের ব্যবস্থা থাকে। আমরা যেটিকে লাইব্রেরি বলি, পাঠাগারের ইংরেজি প্রতিশব্দ। পাঠাগারের রকমফেরও আছে। এখনো পাঠাগারের যে সংস্কৃতি আছে, সেটি হচ্ছে–পাঠাগারে একটা বিশাল বইয়ের সমারোহ থাকে। তবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে এ ধারা বদলে যাচ্ছে। এখন আর এত টাকা, এত জায়গাজুড়ে পাঠাগার হবে না। এখন পাঠাগার হবে অনেকটা এমন–লক্ষ লক্ষ বইয়ের দরকার নেই। বইগুলো আসলে ডিভাইসে চলে আসবে। দুইজন লোক থাকবে, তারা ডিভাইস নিয়ে বসে থাকবে–সার্ভারে কানেক্ট করে দেবে আপনাকে। সেখান থেকে সব বই পড়ার সুযোগ থাকবে। যা-ই হোক, এখনো গতানুগতিক ধারার পাঠাগার থাকছে। তবে এসব পাঠাগারের গতানুগতিক ক্যাটালগ ও ইনডেক্সিং সিস্টেম কিন্তু উঠে গেছে বলা যায়।

লাবণী মণ্ডল: আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং সৃজনশীল মানুষ গঠনে পাঠাগারের ভূমিকা কতটুকু?
খান মাহবুব: যে-কোনো জাতিরাষ্ট্র বিনির্মাণে পাঠাগার খুব দরকার। মানুষের দুই ধরনের ডেভলপমেন্ট আছে–একটি ভিজিবল, আরেকটি ইনভিজিবল, যেটাকে আমরা বেশি গুরত্ব দিই না। যেমন–এই যে মানুষের মনোজাগতিক যেসব বিষয় আছে–মনের গঠন, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি। মানুষের সঙ্গে মানুষের পার্থক্যটা হয় তাঁর আচরণ, রুচির মধ্য দিয়ে। সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই মানুষকে অন্যদের থেকে আলাদা করা যায়। এর জন্য কিন্তু পাঠাগারটা দরকার এবং এটাকে বলা হয়–গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক অস্ত্রাগার, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, আরও অনেক কিছু বলা হয়। পাঠাগার সম্পর্কে বই-পুস্তকে অনেক স্তুতিবাক্য আছে–পাঠাগার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে। এ রকম অনেক স্তুতির কথা বলতে পারি।

পাশ্চাত্য উল্লেখ করে আমরা যাদের কথা বলি, তারা রুচিতে, মননে কতটা উৎকর্ষ। আমরা যত যা-ই বলি না কেন, আমাদের পূর্ববঙ্গে যে-জাগরণের কথা আমরা বলি, সেটা কিন্তু হয়েছে অনেকের মাধ্যমে। আরবরা এসেছে, তার আগে সনাতনরা ছিল; পাল, মুঘল ছিল; কিন্তু রেনেসাঁসটা আসলে ঘটেছে উপনিবেশিক আমলে। উপনিবেশ যে অনেক খারাপ, এ নিয়ে অনেক কিছু বলা সম্ভব। ইউরোপীয় সংস্কৃতিকেই আমরা আধুনিকতা বলি, সেইটা কিন্তু ইউরোপ থেকে এসেছে। তারা কিন্তু একটা ঋদ্ধ জনপদ ছিল এবং ঋদ্ধতার একটা মূল কারণ

ছিল– তারা কেবল ম্যানুয়াল ফিডে আগায়নি; পাঠাগার আন্দোলনের মতো বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট এবং শিল্পের উৎকর্ষতার সঙ্গে যান্ত্রিক উৎকর্ষতার মিশ্রণে তারা ঋদ্ধ হয়েছে। ইউরোপে যে দুই ধরনের উৎকর্ষতা হয়েছে, তার একটি হলো শিল্পবিপ্লব, আরেকটি হলো সামাজিক বিপ্লব বা রেনেসাঁস। এর জন্য কিন্তু পাঠাগারটা খুব দরকার। একটা সময় ইউরোপে যখন পাঠাগার করা হলো, দেখবেন সেসব জায়গায় অনেক তুষারপাত হয়। সেখানকার জীবনটা কিন্তু আমাদের লো-ল্যান্ডের মতো না। মানুষ খুব জড়থবু হয়ে থাকে। ইউরোপের পাঠাগারগুলোর ছাদ প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু। এর মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে একটা আর্দ্রতার ব্যাপার আছে এবং মানুষ রাস্তাঘাটের দিকে না যেয়ে পাঠাগারের দিকে এল। ঝড়ের সময়ে আশ্রয়ণ এবং একটু একটু করে মানুষকে আকৃষ্ট করে পাঠক করার জন্য তারা বই-পুস্তকের সঙ্গে পরিচয় করালো। যা-ই হোক আমাদের এই পাঠাগার কিন্তু ইউরোপের সেই রেনেসাঁসেরই উত্তরসূরী।

ইংল্যান্ডে যখন গণগ্রন্থাগার আইন হলো ১৮৫০ সালে, তারপর থেকেই কিন্তু এইখানে পাঠাগার আন্দোলনটা হলো এবং এখানকার এলিট শ্রেণীটা কিন্তু বুঝতে পারল যে, এখানে যদি আমরা ব্যবসাও করতে চাই–টিকে থাকার মতো একটা শান্তি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ দরকার। উপদেশ কিন্তু তাদেরই দেশ, তাদেরই শাসন; এলাকার জনগণকে তো খালি শোষণ করলে হবে না, ন্যূনতম একটা শান্তি তো বজায় রাখতে হবে। এজন্যই নাগরিকত্ব সুবিধার জন্য পঞ্চাশের পরে চুয়ান্ন সালে যশোর ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ঢাকায় ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরি, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি, এ রকম ১২ থেকে ১৪টা লাইব্রেরি গড়ে ওঠে। এগুলো শতবর্ষী লাইব্রেরি।

আমাদের দেশের পাঠচিত্রে এই লাইব্রেরি আরও বেশি দরকার। মানুষের প্রথম চাহিদাটা হলো জৈবিক চাহিদা। এরপর ধীরে ধীরে তার চাহিদা উচ্চমার্গের দিকে যায়। সভ্যতা-সংস্কৃতির সেই উচ্চপর্বে যেতে কিন্তু আমাদের পাঠাগার লাগবেই। বই-পুস্তকের মাধ্যমে আর কিছু না হোক, একটা মানুষ তো হাজার মানুষ হয়ে যাওয়ার একটা সুযোগ পায়। অনেকের সঙ্গে যোগসূত্র হয়, মানুষের গণ্ডিটা বড় হয়ে যায়। মানুষের রুচি-সংস্কৃতির একটা পরিবর্তন হয়। এই যে আমরা যান্ত্রিকভাবে যে-উন্নয়নের কথা বলি–ইট-বালু-সিমেন্টের অবকাঠামো বুঝি। এইগুলো কিন্তু পরের বিষয়। মানুষের যে ভেদিমূল, তাঁর চিন্তা-সংস্কৃতি, এর উন্নয়নের জন্য আপনার পাঠাগার দরকার। মানুষকে তো থামতে জানতে হবে, না হলে এই যে মানুষের অস্থিরতা, নৈরাজ্য, মানুষের ধনসম্পদ দখল করা। এই যে সামাজিক স্থিতির কথা বলি, মানবিকবোধ-ধর্মের দোহাই দিয়ে তো এগুলো হবে না। তাহলে তো প্রতিনিয়ত গজব পড়তে হবে, তাই না!

সৃজনশীল মানস গঠন ও মানুষের সৃজনশীলতা গড়তে পাঠাগার ভীষণ জরুরি। এভরি ম্যান হ্যাস আ গ্রেট পটেনশিয়ালিটি। প্রতিটা মানুষের কিন্তু একটা স্পেস লাগে। মানুষের সৃজনশীল হওয়ার জন্য অনেকগুলো বিষয় দরকার। আপনাকে যদি দিনভর খাদ্য সংস্থানে,

বেঁচে থাকার সংস্থানেই চলে যায়; তাহলে আপনি কীভাবে সৃজনশীলতার চর্চা করবেন। আপনাকে বেড়াতে হবে, ঘুরতে হবে, তার জন্য পরিবেশ লাগবে। প্রকৃতির সঙ্গে আপনি যদি নদী না দেখেন, নদী নিয়ে লিখবেন কীভাবে। আপনি যদি পাখি না দেখেন, পাখি নিয়ে কী লিখবেন। আমার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছি। আমি যে-পরিবেশ দেখেছি জেলা শহর থেকে, এই প্রজন্ম তার কিঞ্চিৎ পরিমাণ পাচ্ছে না। আমার বাবা-দাদা যেটা পেয়েছে, যেমনটা তাদের কাছে শুনেছি–নৌকা নিয়ে নদী থেকে নৌকা বোঝাই করে মাছ মেরে এনেছে। আমরা এমনভাবে না মারলেও বড়শি দিয়ে মাছ ধরেছি। এটা এখন রূপকথার মতো! এই যে জুঁই, জবা, কামিনী, কেয়া–এই ফুলগুলোর নাম আমরা এখন আর জানিও না! বাড়ি বলতে কিছু লেখা নাই, একটা উঠান, ছোটো একটা বাগান এইসব জিনিস কনসেপ্ট আছে। তাহলে যিনি সৃজনশীল মানুষ হবেন, তাঁর জন্য তো পাঠাগারটা আবশ্যক। এটা তো ভাত কাপড়ের মতোই দরকার। আমরা তো আসলে বড় একটা ভুল পথে পরিচালিত। কারণ আমাদের শিখানোই হয় পরিবার থেকে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে–বড় হওয়া মানে অনেক টাকার মালিক হওয়া, পুঁজির সঞ্চায়ন করা। কিন্তু আমাদের সমাজ-পরিবেশ শিখিয়েছে–ভেদহীন মানুষ হও, সৎ, সংবেদনশীল মানুষ হও, কমিটমেন্টাল মানুষ হও। এইসব জিনিসগুলো যে আমরা শিখিনি, তাহলে আমরা যা শিখেছি, তার গোড়ায় গণ্ডগোল। একটা মানুষ মনোজগতে যে যাপন করবে, সে সুযোগ তো সমাজে নেই। এই ক্রিয়েটিভিটির স্পেসটা সমাজে নেই। এই স্পেসটার জন্যই পাঠাগারের মতো বিষয়গুলো জরুরি। কাগজে যেভাবে লিখি বা মুখে যেভাবে বলি–ভেদহীন সমাজ, মানবিক সমাজ, প্রাকৃতিক সমাজ, অগ্রায়নের সমাজ, সমতার সমাজ–তার জন্যেই কিন্তু পাঠাগার আন্দোলনটা দরকার।

লাবণী মণ্ডল: আপনি একটি সৃজনশীল প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত। একইসঙ্গে চিন্তাশীল লেখালেখি ও গবেষণায় যুক্ত রয়েছেন। প্রকাশনার সঙ্গে পাঠাগারের সম্পর্কের বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

খান মাহবুব: প্রকাশনার সঙ্গে তো পাঠাগার অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। প্রকাশক হিসেবে যদি বলি–ভালো বইয়ের জন্য ভালো পাণ্ডুলিপি লাগে। আর ভালো পাণ্ডুলিপি হওয়ার জন্য ভালো চিন্তা লাগবে, ভালো চিন্তার খোরাক লাগবে, ভালো পঠন লাগবে। মননশীলতার পূর্বসূত্র পঠন। ভালো চিন্তা করার জন্য যে আপনার মানসিক পটভূমি দরকার, তার জন্য কিন্তু পাঠাগার আবশ্যক।

লাবণী মণ্ডল: মানুষ পাঠবিমুখ হচ্ছে, শুধু ছুটছে মানুষজন। এ থেকে মুক্তি কীভাবে মিলবে?

খান মাহবুব: ছোটোবেলায় আমাদের শেখানো হয় অমুকে দেখ কত বড় হয়েছে, কত বড় গাড়ি কিনেছে। এই যে মানুষজন বাচ্চার কাঁধে এতগুলো বই ঝুলিয়ে দিয়েছে, এত বইয়ের দরকার নেই তো। অন্যের সঙ্গে তুলনা দেওয়াটা কিন্তু মানুষকে এক ধরনের খারাপের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। তাকে প্রতিযোগিতার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে। সেটা কিন্তু অসম একটা প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ তাকে তো জীবনযাপন করার সুযোগ দিচ্ছি না। শুধু চাওয়াগুলো প্রতিনিয়ত জ্যামিতিক হারে বাড়ছে মানুষের। ধরুন, একজন মানুষের একটা বাড়ি, একটা

গাড়ি, দশ কোটি টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স, প্রতি মাসে দুই লক্ষ টাকা আয় তার কেন দরকার। তাতেও কি স্বস্তি মিলবে? সমাজ কিন্তু তাকে থামতে দিচ্ছে না, প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলছে। সে প্রতিযোগিতা হলো অসম, অনৈতিক প্রতিযোগিতা, বিবেকবর্জিত প্রতিযোগিতা। যেমন–ইউরোপীয় শহরে কিন্তু আপনি ইচ্ছা করলেই এক সঙ্গে পাঁচটা বাড়ি বানাতে পারবেন না, আবার বেশি আয় করলে আপনাকে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে।

আমাদের সামাজিক-রেনেসাঁস দরকার। তার জন্য গোটা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার। মানুষের চাওয়া, শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে সবকিছুর মৌলিক পরিবর্তন দরকার। সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই তা সম্ভব। তবে পরিবর্তন আসবেই। তবে আপাতত তেমন কোনো আশার আলো দেখছি না।

লাবণী মণ্ডল: রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অনেক মেগা প্রজেক্ট চলছে। সেইসঙ্গে আবার মসজিদ, মন্দির, গির্জা নির্মাণের টাকা রাষ্ট্রীয়ভাবে দেওয়া হয়। করোনাকালে পাঠাগার ও প্রকাশনা খাত ভীষণভাবে আক্রান্ত হয়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এসব ক্ষেত্রে তেমন কোনো অনুদান দেখা যায়নি...

খান মাহবুব: আপনি সুন্দর, যৌক্তিক একটা কথা বললেন। রাষ্ট্র কোথায় অগ্রাধিকার দিবে, কোথায় বাজেটের বরাদ্দ বেশি, সেটা দেখলেও বোঝা যায়–আমরা কোনদিকে যাচ্ছি। এখানে কোনো মন্ত্রী বা এমপির কাছে গিয়ে বলবেন, একটা পাঠাগার করতে চাই, বা একটা এলাকাভিত্তিক ইতিহাস নিয়ে বই করতে চাই–সেটিতে কিন্তু আগ্রহী হবে না। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আমি একটা রাস্তা করতে চাই, ড্রেন করতে চাই; তাহলে দেখবেন যে, তারা টাকা ঢালবে, উদ্বোধন করবে; নিজের নামে ফলক তৈরি করবে। একটা হাস্যকর বিষয় যে গ্রামে একটা কালভার্ট তৈরি করতেও তিন-চার কোটি টাকা লাগে। আমি অনেকবার জাতীয় গ্রন্থাগারের সদস্য ছিলাম, অনেক ধরনের একাডেমিক বাজেট মিলে পাঁচ কোটি টাকা! এখানে তো পাঁচশ কোটি হওয়া দরকার। বেসরকারি লাইব্রেরিগুলোর জন্য তো সরকারি তেমন কোনো অনুদানই নেই। যা অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়, তা খুব হাস্যকর! একটা তৃতীয় ক্যাটাগরির লাইব্রেরির অনুদান পঞ্চাশ হাজার টাকা। প্রথম ক্যাটাগরি হলে ৬০-৭০ হাজার টাকা।

বেশিরভাগ পাঠাগারে কিন্তু সরকারি কোনো অনুদান নেই। বাংলাদেশে তিন হাজার লাইব্রেরির মধ্যে দেড় হাজার লাইব্রেরিতে বছরে তিন লক্ষ টাকা দিতে পারে। বাংলাদেশে ৫৭-৫৮টা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে, কিন্তু এর তেমন কোনো কাঠামো দাঁড়ায়নি। না আছে পড়ানোর যোগ্যতা, না আছে কোনো স্ট্রাকচার, না আছে ছাত্র!

লাইব্রেরি নিয়ে গভর্মেন্টের সুন্দর সুন্দর কথা আছে; কিন্তু মূল যে প্রভাবক ফান্ড–সেটি কিন্তু খুবই কম। এদিকে নজর দিতে হবে। শিল্পকলা, নাচ-গানের জন্য যে অনুদান রয়েছে, লাইব্রেরি জন্য তার কিছুই নেই। যে কারণে এত বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা করেও বাংলাদেশে কেউ পাঠাগার আন্দোলন গড়ে তোলার সাহস পায় না। এটা তো

আলটিমেটলি রাষ্ট্রেরই দায়।

লাবণী মণ্ডল: আপনি জেলা শহরের মানুষ। এইচএসসি পর্যন্ত ওখানেই ছিলেন। সে সময়ে কি পাঠাগার ছিল কিংবা নিয়মিত যাওয়া হতো; সে স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাইছি।
খান মাহবুব: আমাদের পরিবার খুব কালচারাল ছিল। আমিও সেই পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছি। ক্লাস থ্রি-ফোর থেকে কালচারাল সবকিছুর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। এইচএসসিতে পড়া অবস্থায় শিক্ষা সপ্তাহে থানা-জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছি, গোল্ড মেডেল পেয়েছি। আমাদের কিন্তু উপশহরে বাসা। জেলা শহর থেকে আড়াই মাইল দূরে।

আমাদের পাঠাগারটির নাম ছিল রমেশ হল। আমাদের কেন্দ্রই ছিল ওই পাঠাগার। আবৃত্তিচর্চা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এসবের মধ্যেই বেড়ে ওঠা। বৃহস্পতিবার বিন্দুবাসিনী সরকারি স্কুলের লাইব্রেরি খুলে দিত। হুড়হুড় করে ঢুকে পড়তাম। সে অন্যরকম আনন্দানুভূতি।
স্কুল থেকে মুকুলিকা বের হতো। শশধর সাহা স্যার ওই কাজে লিড দিতেন। আমাদের সে কী উৎসাহ! একটা কবিতা প্রকাশের জন্য স্যারের কাছে ম্যাও-ম্যাও করেছি। স্যার খুব রাগী ছিলেন। মাঝে-মধ্যে বলতেন, তোর কবিতা হয়নি। আবার কেটে-কুটে সুন্দর করে ছেপে দিত। স্কুলের ক্লাব ছিল নবারুণ, ত্রিশালয়। বিভিন্ন ক্লাবের মধ্য দিয়ে আন্তঃপ্রতিযোগিতা হতো। ক্লাস সেভেন-এইট থেকেই কিন্তু বাঙালির বেদিমূলের বই শরৎ-বিভূতি-মানিদের বই পড়ে ফেলেছি। লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে অনেক সুহৃদের ব্যবহার করতাম, যাতে একটু বেশি সময় থাকতে দেয়।
টাঙ্গাইল সাধারণ গ্রন্থাগারে যেতাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পত্রিকা পড়তাম। তাতে অন্যরকম আনন্দ ছিল। মানুষের ভিড় লেগে থাকত। সিনিয়ররা সব দখল করে থাকলেও, আমরা কয়েকজন যেতাম। চিত্রালী, পূর্বাণী এগুলোর প্রতি খুব আগ্রহ ছিল। থরে থরে বই ছাপানো, দেখতেও তো ভালো লাগত। এখন সে অনুভূতি কাজ করে কি না।

এখনকার শিশুদের ঘাড়ে এত ব্যাগের বোঝা, ওরা কখন অন্য বিষয়ে ভাববে! আমাদের শৈশব কেটেছে মাঠে। আমার বন্ধু-বান্ধবরা নিয়মিত খেলত, আমরা দুয়েকজন যেতাম। একটা মানুষ বিকালে মাঠে না গিয়ে বাঁচে সেইটা তো চিন্তা করতে পারিনি। আট থেকে নয় ফুট একটা বারান্দায় দাঁড়িয়ে মানুষের জীবন কাটে কীভাবে! হাত-পা ছিল শক্ত, খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে কেটে রক্ত বের হয়ে যেত, কোনো ব্যাপার না।

লাবণী মণ্ডল: দেশে বেশ কিছু বিশেষায়িত গ্রন্থাগার থাকলেও, গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা গুটিকয়েক। যেমন–রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি, অথচ এখানে গণগ্রন্থাগার মাত্র একটি। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে কেমন উদ্যোগ থাকা দরকার?
খান মাহবুব: পাঠাগার-গ্রন্থাগার থাকলেও গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা গুটিকয়েক। তা ছাড়াও স্পেশাল লাইব্রেরি আছে। চিকিৎসার মান যাই হোক না কেন ঢাকা শহরে কিন্তু সরকারি

হাসপাতাল রয়েছে। শরীরের চিকিৎসার জন্য তা থাকলেও, মনের চিকিৎসার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। পাঠাগার বিষয়টি তো একেবারেই নগণ্য। সরকার চাইলে উদ্যোগ নিয়ে ঢাকা শহরে বিশটা পাঠাগার করতে পারে; কিন্তু লাইব্রেরি না করলে তো ভোটের রাজনীতি পিছিয়ে যাবে না, সরকারের রাজনীতি পেছায় ড্রেন, মসজিদ, মন্দির নির্মাণ আটকে গেলে!

লাবণী মণ্ডল: ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ব্যক্তি উদ্যোগে অনেক পাঠাগার গড়ে উঠছে। সেগুলো টিকিয়ে রাখা অনেকটাই দুরূহ হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে প্রকাশনাগুলো কেমন ভূমিকা রাখতে পারে?

খান মাহবুব: পাঠাগার সময় ও মানুষের তাগিদেই গড়ে ওঠে। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে কেউ এটাকে পেশা হিসেবে নিয়েছে, কেউ নেয়নি। এইসব কারণে পাঠাগারগুলো কিন্তু অনেক অপূর্ণাঙ্গতা নিয়ে গড়ে উঠেছে। কোনো মানুষের কিছু টাকা আছে, তিনি ভাবলেন–একটি পাঠাগার হয়তো গড়ে তোলা যায়। অনেকে আবার খুব সিস্টেমেটিক লাইব্রেরি করেছে, গুছিয়ে করেছে। কিন্তু আর্থিক বুনিয়াদ ছাড়া প্রতিষ্ঠান চালিয়ে নেওয়া মুশকিল। একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানোর চেয়ে, চালিয়ে নেওয়া কঠিন। ইমোশন দিয়ে একটা জিনিস গড়ে তোলা যায়, কিন্তু দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে হলে তো পুঁজির দরকার। এটাই দীর্ঘমেয়াদে টিকে থাকার জন্য সমস্যা।

অথচ পাঠাগার কিন্তু একটা ইউনিক জায়গা হতে পারে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে সবার যাওয়ার সুযোগ নেই। পাঠাগার কিন্তু সবার জন্য উন্মুক্ত। এই যে আমাদের পরিবারের সমস্যা, তার মূল কারণ হলো আমাদের বিচ্ছিন্নতা–এটি নিত্যনতুন সমস্যা সৃষ্টি করে। বই এমন একটা জায়গা, যেখানে নিজের দুঃখ-কষ্ট থেকে মানুষ বের হতে পারে। সমাজের ক্ষেত্রেও একই বিষয় প্রযোজ্য।

প্রকাশকরা অনেকভাবেই পাঠাগারে সহযোগিতা করতে পারেন। পাঠাগারগুলোতে আমরা আর্থিকভাবে কিছু সহযোগিতা করতে পারি। তবে আর্থিকভাবে খুব বেশি সহযোগিতা করা প্রকাশকদের জন্য সবসময় সম্ভব হয় না। অথচ আমাদের অনেক বই কিন্তু গুদামঘরে পড়ে আছে। তার একাংশ আমরা পাঠাগারগুলোতে দিতে পারি। আমি মনে করি, আমার অন্য ব্যবসার চেয়ে প্রকাশনায় যদি বেশি লাভ করতে চাইতাম, তাহলে অন্য ব্যবসায় যেতে হতো, তাহলে ফাস্টফুডের দোকান করতাম।

লাবণী মণ্ডল: গ্রামীণ সমাজে যেখানে শিক্ষার সুযোগ অনেক কম, সেখানে পাঠাগার সামাজিক পরিবর্তনে কেমন ভূমিকা রাখতে পারে?

খান মাহবুব: শহরে কাঠামোবদ্ধ পড়াশোনার সুযোগ বেশি, গ্রামীণ সমাজে তা অনেকাংশেই কম। দেখা গেল, পরিবার শিক্ষার ভূমিকাটা বুঝছে না, ১০-১৫ বছর হয়ে গেলেই কৃষিকাজে যুক্ত করেন। সে ক্ষেত্রে পাঠাগার থাকলে কিন্তু একটা বড় সুবিধা হয়। এটা কিন্তু একটা সেকেন্ড এডুকেশন সেন্টার। অর্থাৎ এখানে শুধু স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীরাই নয়; যারা স্কুল-কলেজের থেকে ড্রপআউট হয়ে গেছে, তারাও পড়তে পারে, যেতে পারে, আনন্দ ভাগাভাগি

করতে পারে। হয়তো সে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা এগিয়ে নিতে পারবে না; কিন্তু তার মনোভুবনটা গড়ে উঠতে পারে পাঠাগারের মাধ্যমে। সে ক্ষেত্রে কিন্তু পাঠাগার ভূমিকা রাখতে পারবে। শুধু তা-ই নয়, অনেকেই কর্মে ঢুকে গেছেন, পড়াশোনা শেষ করেননি; পাঠাগার থাকলে কিন্তু অবসরে পত্রিকা পড়বে, আড্ডা দিবে, সংযোগ বাড়বে।

অনেকেই মনে করেন হুমায়ূন আহমেদ কিংবা ইমদাদুল হক মিলনের সাহিত্য পড়ে কোনো লাভ হবে না–এগুলো স্থূল সাহিত্য। ঠিক আছে, তাদের সাহিত্য হয়তো অনেক কিছু বানাবে না, কিন্তু পড়ার অভ্যাস তৈরি করবে। গ্রাম-মফস্বলের অনেক মানুষ কিন্তু এ সাহিত্য পড়েই অভ্যাস তৈরি করতে পেরেছে। আরেকটা বিষয় হলো–আজ যে হুমায়ূন আহমেদ পড়বে, তার বোধ কিন্তু আরও শাণিত হবে, এর পর সে কিন্তু হুমায়ুন আজাদ-আহমদ ছফাও পড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে আশা জাগানিয়া ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রামীণ সমাজে এখনও একটা বড় বিষয় রয়ে গেছে। আমাদের নগরসমাজে মানুষ খুব ব্যস্ত থাকে, ছুটে চলে শুধু; কিন্তু গ্রামীণসমাজে এত ব্যস্ততা নেই। কৃষিশ্রমিকদের কাজশেষে অবসর থাকে, দোকানে আড্ডা দেয়; রাজনীতিক আড্ডা দেয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই এতে থাকে। পাঠাগার থাকলে কিন্তু সবাই পাঠাগারমুখী হবে–সেই চেষ্টাটুকু করা জরুরি। এটা করলেই রুচির পরিবর্তন আসবে। তাহলেই বড় লাভটুকু আসবে, মানুষ বইমুখী হবে। বিশ্বের অনেক দেশে সেটি রয়েছে। সেখানে আরাম-আয়েশে বই পড়া যায়, গল্প-আড্ডায় মশগুল থাকা যায়। এখানে সে পরিবেশ দিতে পারলে, মানুষের চিন্তা-চেতনার মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব। পাঠাগারগুলোর সংখ্যা বাড়াতে হবে, বইয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। গ্রামে পাঠাগার গড়ে তুলতে হলে, কৃষি বিষয়ক বইটা জরুরি। তা হলে গ্রামের লোকজন নিজের প্রয়োজনেই আসবে। যে গ্রামের যেমন প্রয়োজন, তেমন বই রাখলে কৃষকরা উপকৃত হবে। কৃষি উপকৃত হবে। এভাবে ভাবতে হবে। এজন্য আমাদের গ্রামীণ সমাজে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। দিনকে দিন সমাজ গহীন অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে, পাঠাগার এর থেকে মুক্তি মেলাতে পারে।

লাবণী মণ্ডল: গ্রামে পাঠাগারগুলোতে পাঠকদের বেশির ভাগই শিশু-কিশোর। কিন্তু তাদের মানস গঠনের উপযোগী বই অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো ভাবনা বা উদ্যোগ রয়েছে কি?

খান মাহবুব: শিশুদের জন্য যে ধরনের বই দরকার, সে ধরনের বইটা আসলে নেই। শিশুতোষ বই আধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের প্ল্যাটফর্ম দরকার, তেমন অবকাঠামোও নেই। আমরা বলি যে, কিছু বই আছে–যার মানে আমরা নির্দিষ্ট কিছু বই পড়েছি। আমি খুব বেশি দূরে যাব না, প্রতিবেশী মালয়েশিয়ার কথা বলব। শিশুরা সবসময় রকমারি এবং বৈচিত্র্যময় বিষয় পছন্দ করে। শিশুদের আমরা খেলনা দেই কেন? আমি-আপনি বইয়ের প্রতি যেভাবে আকর্ষণবোধ করতে পারি। শিশুর জন্য যে বই এবং পরিবেশ দরকার, কোনোটাই কিন্তু আমাদের নেই। এ কাজে এক নম্বরেই থাকবে লাইব্রেরি। মালয়েশিয়ায় দেখা যাবে পাঠাগারে শিশুরা খেলছে, চারদিকে দেখছে, মানে এটা হলো দশজনের একটা সিনেমা। এটা যেন এক আনন্দঘর। খেলনা থেকে শুরু করে এর মধ্যে

ভিজুয়াল দেখবে; এর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় থেকে শুরু করে অনেককিছুই থাকবে। বই দেখে কতক্ষণ পড়বে আর শুনবে; আর যদি টিভিটা ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে এগুলোই দেখবে। আমাদের এই বইগুলোর জন্য পাঠাগারে আলাদা করে শিশু কর্নার নেই। পাঠাগারের ভেতরের পরিবেশও শিশুদের মতোই হতে হবে। চেয়ার-টেবিল থেকে শুরু করে সবখানে একটা রঙের ছোঁয়া থাকতে হবে। ছয়-সাত বছরের বাচ্চা শিশুরা খেলবে-লাফাবে সে পরিবেশটা তাদের হবে।

লাবণী মণ্ডল: প্রতিটি গ্রামে পাঠাগার গড়ে তোলার একটি প্রচেষ্টা 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন'। গত ১৬ বছর ধরে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্যোগকে আপনি কীভাবে দেখছেন?
খান মাহবুব: এ ধরনের কাজে একটা বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকার–কাজটা কে করল না করল, সেটা দেখার বিষয় না। গ্রাম পাঠাগার এ রকম একটা আলোর বাতিঘর। যে বিচ্ছুরণ করার জন্য চেষ্টা করছে। এ রকম হাজারো গ্রাম পাঠাগার হতে হবে, বিভিন্ন নামে হোক। বিভিন্ন ধরনের হবে। আবার এর মধ্যে একটা মূল লক্ষ্যের মধ্যে সবার একটা ঐক্য দরকার। সেটাকে ঘিরে 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন' সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়া দরকার। আমরা যারা সমাজে এমন উদ্যোগের পাশে আছি, তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া দরকার। এটিকে ছড়িয়ে দেওয়া দরকার।

আমি ধরে নিচ্ছি গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন হামাগুড়ি দিচ্ছে। যেসব মানুষ সামাজিক ভিত্তিতে তার হাত ধরতে পারে, তাদের এর সঙ্গে যুক্ত করা দরকার। শক্ত একটা হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে নিজের শিরদাঁড়া সোজা করা যায়। এই সামাজিক আন্দোলনটা ব্যক্তিগত কয়েকজনের নয়। এটা তো মূল ধারার আন্দোলন। যখন সামাজিক পর্যায়ে কাজ হবে, সেই কাজটা কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়েও প্রভাব ফেলবে।

আমরা দূরে থেকে বাহবা দিলে হবে না, আমাদের যে যতটা পারি, সামর্থ্য অনুযায়ী এই কাজে হাত বাড়াতে হবে। পাঠাগার আন্দোলন অনেক রকমের হতে পারে। প্রত্যেকটারই মূল উদ্দেশ্য হলো–পাঠাগার আন্দোলনটা সচল করা, জাগ্রত করা, এইটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যে ফর্মটি ছড়ানো হোক না কেন সেটাকে আমাদের এগিয়ে নিতে হবে এবং প্রত্যেকটার মধ্যে একটা আন্তঃসংযোগ যেন হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। একেকটা প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য থাকতে পারে; কিন্তু মূল লক্ষ্য একটাই। নৌকা বাইচে বৈঠা কিন্তু সবাই চালায়, পেছনের নিশান ধরে একজন বসে থাকে, সে কিন্তু নৌকাটা একটা গন্তব্যের দিকে নিয়ে যায়। সেরকম হালটা ধরে সবার যে শক্তিটা, সেইটা একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। সেরকমভাবে গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন সবার সঙ্গে সবাইকে সংযুক্ত করে গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাবে। সব শেষে বলব, সমাজ এ রকম থাকবে না–সমাজ পরিবর্তন হবে, এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার পরিবর্তন হবে। বিপ্লব যে হবে না, সে তো আর দিব্যি কেটে বলতে পারি না।

পাঠাগার আন্দোলন, প্রকাশনায় পাঠাগারের ভূমিকা এবং মানসম্মত বই তৈরিতে প্রকাশনার ভূমিকা:

কামরুল হাসান শায়ক

কামরুল হাসান শায়ক। যিনি বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। তাঁর প্রকাশনা পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লি. দেশের অন্যতম প্রকাশনাসংস্থা। এ ছাড়াও প্রথম চেইন বুক স্টোর পিবিএস এবং বিশ্বমানের প্রিন্টিং প্যাকেজিং ইন্ডাস্ট্রির মাধ্যমে প্রকাশনাশিল্পে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। যিনি প্রকাশনাকে দেখেন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির সম্মিলন হিসেবে। ভাবেন শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে, তরুণদের গড়ে ওঠার সাহিত্য নিয়ে রয়েছে তাঁর একান্ত ভাবনা। তিনি ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনে (আইপিএ) বাংলাদেশের স্থায়ী সদস্যপদ অর্জন এবং এশিয়া প্যাসেফিক পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশনে বাংলাদেশের প্রকাশকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রাখছেন ভূমিকা।

তিনি লিখছেন প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বই এবং শিশুদের নিয়ে তাঁর রয়েছে নতুন ভাবনা। যে ভাবনায় নিজেকেও সম্পৃক্ত করেছেন। শিশুদের নিয়ে রয়েছে তাঁর প্রকাশনায় গুরুত্বপূর্ণ বই এবং তিনিও লিখেছেন। তাঁর সৃষ্টিসমূহ–পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতকরণ, সম্পাদনা, প্রুফরিডিং, মুদ্রণশৈলী, নান্দনিক প্রকাশনার নির্দেশিকা, পুস্তক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্যকুমারী ও এক আশ্চর্য নগরী, জেমি ও জাদুর শিমগাছ।

পাঠাগার আন্দোলন, প্রকাশনায় পাঠাগারের ভূমিকা এবং মানসম্মত বই তৈরিতে প্রকাশনার ভূমিকা নিয়ে সম্প্রতি তিনি কথা বলেছেন সাহিত্য বিশ্লেষক ও প্রাবন্ধিক **লাবণী মণ্ডলের** সঙ্গে।

লাবণী মণ্ডল: পাঠাগার–এ শব্দটিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?
কামরুল হাসান শায়ক: পাঠাগার মূলত তথ্য, জ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পদের সংগ্রহ ও সংরক্ষণশালা। আধুনিক যুগে তথ্য-সম্পদের আপাতত দুটি ফর্ম বেশ দৃশ্যমান। একটি মুদ্রিত ফর্ম, অপরটি ইলেক্ট্রনিক ফর্ম। পাঠাগার বা ইংরেজি Library শব্দটি ল্যাটিন Liber (book) শব্দ থেকে এসেছে। পাঠাগার বলতে সাধারণত যেখানে পর্যাপ্ত তথ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পদ সংগৃহীত, সংরক্ষিত থাকে এবং চাহিদা অনুযায়ী পাঠক সেখান থেকে তা সংগ্রহ করতে পারে, সমৃদ্ধ হতে পারে তাকেই বোঝায়। পাঠাগার মানুষের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন। মানুষের জানার তৃষ্ণা মেটাতে এবং উন্নত সংস্কৃতি বিকাশে লাইব্রেরি বা পাঠাগার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

লাবণী মণ্ডল: আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং সৃজনশীল

মানুষ গঠনে পাঠাগারের ভূমিকা কতটুকু?

কামরুল হাসান শায়ক: আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে পাঠাগার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। শক্তিশালী উন্নত সংস্কৃতির সভ্যতা বিকাশে পাঠাগার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমরা যে আজ বাংলাদেশে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখছি, তার সফল বাস্তবায়নে পাঠাগারের বিকল্প নেই।

সৃজনশীল মানুষ গঠনে পাঠাগারের নিরেট ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষ জন্ম অবধি প্রাকৃতিকভাবে দুটো মৌলিক ক্ষুধায় আক্রান্ত হয়। একটি দৈহিক, অপরটি মানসিক। যে যেমন সুষম ও স্বাস্থ্যকর খাদ্য গ্রহণ করবে, সে তেমনই দৈহিকভাবে সুস্থ ও পরিপাটি থাকবে। একইভাবে মানসিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে যত সমৃদ্ধ পাঠাগারের সান্নিধ্য পাবে, সে তত বেশি মানসিকভাবে সমৃদ্ধ ও সুস্থ থাকবে, তথা সৃজনশীল হয়ে উঠবে। সাম্প্রতিক সময়ে পাঠাগারগুলো বইপাঠের পাশাপাশি বিভিন্ন সৃজনশীল কর্মকাণ্ড অনুশীলনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। যেমন–বইপড়া প্রতিযোগিতা, গল্পবলা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তিসহ বিচিত্র সৃজনশীল অনুশীলন মানুষের মেধা ও মননের উৎকর্ষ বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

লাবণী মণ্ডল: আপনি একটি সৃজনশীল প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত। একই সঙ্গে চিন্তাশীল লেখালেখি ও গবেষণায় যুক্ত রয়েছেন। প্রকাশনার সঙ্গে পাঠাগারের সম্পর্কের বিষয়টি কীভাবে দেখেন?

কামরুল হাসান শায়ক: প্রকাশনাসংস্থা, পাঠাগার এবং পাঠকের মধ্যে ত্রিমাত্রিক একটি আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। তবে এই সম্পর্কের রসায়নটি যত বেশি ঋদ্ধ হবে, ফলাফলও তত বেশি ভালো হবে। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে পাঠাগারের নিবিড় সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তোলা সম্ভব, আর এটি সম্ভব হলে এর ফল ভোগ করবে পাঠক তথা জ্ঞানপিপাসু মানুষ। প্রকাশনা সংস্থাগুলোর সঙ্গে পাঠাগারগুলোর যে পরিমাণ সম্পর্কের গভীরতা এবং সমঝোতা প্রয়োজন তা এখনও হয়ে ওঠেনি। যার ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ পাঠাগারই সমৃদ্ধ পাঠাগারের স্বীকৃতি পায়নি। পাঠকও পাঠাগারমুখী হচ্ছে না। পাঠাগারগুলোতে প্রচুরসংখ্যক মানসম্পন্ন বই সংগ্রহে প্রকাশনা সংস্থাগুলো বহুমুখী সহযোগিতাই করতে পারে। পাঠাগারগুলোতে সমৃদ্ধ বই সংগ্রহের পাশাপাশি সৃজনশীল কর্মকাণ্ড অনুশীলন চালু করাও প্রয়োজন। এসব কর্মকাণ্ডেও প্রকাশনা সংস্থা সহযোগিতা করতে পারে।

লাবণী মণ্ডল: শিল্প-সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে পাঠাগারের সম্পৃক্ততার বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?

কামরুল হাসান শায়ক: আমি তো মনে করি শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পাঠাগার মুখ্য অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারে। সারাদেশে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সব পর্যায়ে পাঠাগার আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠলে, তাদের কর্মসূচির মধ্যে অনিবার্যভাবে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুশীলনের বিষয়টি চলে আসবে। এই অনুশীলন যত বেশি বেগবান হবে, তত বেশি আমাদের কাঙ্ক্ষিত সোনালি প্রজন্মের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়ে উঠবে। তাই শিক্ষা,

শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে পাঠাগারের সম্পৃক্ততার বিষয়টিকে আমি খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করি।

লাবণী মণ্ডল: দেশে বেশ কিছু বিশেষায়িত গ্রন্থাগার থাকলেও, গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা গুটিকয়েক। যেমন–রাজধানী ঢাকার জনসংখ্যা প্রায় আড়াই কোটি, অথচ এখানে গণগ্রন্থাগার মাত্র একটি। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে কেমন উদ্যোগ থাকা দরকার?

কামরুল হাসান শায়ক: বাংলাদেশে পাঁচ প্রকার গ্রন্থাগারের সঙ্গে আমরা বেশ পরিচিত। ক. জাতীয় গ্রন্থাগার, খ. গণগ্রন্থাগার, গ. শিক্ষায়তন গ্রন্থাগার, ঘ. বিশেষায়িত গ্রন্থাগার এবং ঙ. ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার।

কার্যপরিধি বিবেচনায় গণগ্রন্থাগারের বিস্তৃতি ও সক্রিয় কার্যক্রম আমাদের সৃজনশীল শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কারণ গণগ্রন্থাগারের কার্যপরিধির মধ্যে রয়েছে: ক. তথ্যমূলক ভূমিকা, খ. শিক্ষামূলক ভূমিকা, গ. সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ভূমিকা, ঘ. সুনাগরিক জ্ঞান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি, ঙ. বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি, চ. কুসংস্কার, কূপমণ্ডুকতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিলোপ এবং ছ. মেধা ও মননশীলতার চর্চা।

গণগ্রন্থাগারের উল্লেখিত কার্যপরিধির আলোকে একটি আলোকিত বিজ্ঞানমনস্ক উন্নত সংস্কৃতির বাঙালি প্রজন্ম গঠনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ঢাকা শহরের প্রতি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে গণগ্রন্থাগার গড়ে তোলা উচিত। সারা দেশেও একইভাবে প্রতি ইউনিয়নে, ওয়ার্ডে গণগ্রন্থাগার গড়ে তোলার সুচিন্তিত প্রকল্প নেওয়া উচিত।

লাবণী মণ্ডল: ঢাকা ও ঢাকার বাইরে ব্যক্তি উদ্যোগে অনেক পাঠাগার গড়ে উঠছে। সেগুলো টিকিয়ে রাখা অনেকটাই দুরূহ হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে প্রকাশনাগুলো কেমন ভূমিকা রাখতে পারে?

কামরুল হাসান শায়ক: ব্যক্তি উদ্যোগে নির্মিত ও পরিচালিত পাঠাগারগুলোকে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো অনেকভাবেই সহযোগিতা করতে পারে। যেমন: ক. প্রায় সময়ই প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ওয়্যারহাউজের স্থান সংকুলানের জন্য দীর্ঘদিনের অবিক্রিত অনেক বই ওয়েসটেস হিসেবে ড্যামেজ করে বা ওজন দরে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করে, গ্রন্থাগারগুলোর সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ থাকলে প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে এই বইগুলো নামমাত্র মূল্যে গ্রন্থাগারগুলো সংগ্রহ করতে পারে–অনেক ক্ষেত্রে বিনামূল্যেও সংগ্রহ করতে পারে; খ. গণগ্রন্থাগারগুলো প্রকাশনা সংস্থাগুলোর কাছে সৌজন্য কপি চেয়ে আবেদন করতে পারে; গ. প্রকাশনা সংস্থাগুলোর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি করে পাঠাগারগুলো সর্বোচ্চ কমিশনে সারা বছর তাদের চাহিদামতো বই কিনতে পারে; ঘ. পাঠাগারগুলো যৌক্তিকভাবে প্রকাশনাসংস্থা বা সমিতির কাছে আর্থিক অনুদানের জন্য আবেদন করতে পারে; এবং, ঙ. পাঠাগারগুলো অনেকসময়ে প্রকাশনা সংস্থাগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে সৃজনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনার উদ্যোগ নিতে পারে।

লাবণী মণ্ডল: গ্রামীণ সমাজে যেখানে শিক্ষার সুযোগ অনেক কম, সেখানে পাঠাগার সামাজিক পরিবর্তনে কেমন ভূমিকা রাখতে পারে?

কামরুল হাসান শায়ক: প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রদত্ত তথ্যমতে বাংলাদেশে বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ১ লাখ ৩৩ হাজার। মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ২০ হাজার ৮৪৯টি। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অর্ধেকের বেশি সরকারি। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহর কিংবা গ্রাম যেখানেই অবস্থান করুক ন্যূনতম ৫০০ বই সংবলিত একটি পাঠাগার এবং একজন গ্রন্থাগারিক সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বরাদ্দ রয়েছে বলে জানি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক পাঠাগারের জন্য সরকারের সিদ্ধান্ত এবং বাজেট যদি সঠিক ও যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, তাহলে গ্রামীণ সমাজেও পরিবর্তনের ছোঁয়া ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হওয়ার কথা। পাশাপাশি সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে প্রতি ইউনিয়ন বা ওয়ার্ডে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে বা নামকরণে পাঠাগার প্রকল্প নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ডভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত পাঠাগার কার্যক্রম নিঃসন্দেহে সামাজিক পরিবর্তনে বৈপ্লবিক ভূমিকা রাখবে বলে বিশ্বাস করি।

লাবণী মণ্ডল: প্রতিটি গ্রামে পাঠাগার গড়ে তোলার একটি প্রচেষ্টা 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন'। গত ১৬ বছর ধরে এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্যোগকে আপনি কীভাবে দেখছেন?

কামরুল হাসান শায়ক: প্রতিটি গ্রামে পাঠাগার গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অত্যন্ত ইতিবাচক এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। তবে এই মহতী কর্মপ্রচেষ্টার সক্ষমতা, দুর্বলতা, সম্ভাবনা এবং প্রতিবন্ধকতাগুলো নিয়ে গভীরভাবে গবেষণা করে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে কাঙ্ক্ষিত ফল ঈপ্সিত সময়ের মধ্যে পাওয়া সম্ভব বলে মনে করি।

আমি গত প্রায় এক দশক যাবৎ এই গ্রামীণ পাঠাগার আন্দোলনের প্রচেষ্টা দেখে আসছি। মাঝে একবার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁদের কর্মযজ্ঞ এবং উদ্যমে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু তারপর সেই যোগাযোগটা অব্যাহত থাকেনি। তবে তাঁদের প্রচেষ্টা অত্যন্ত পরিকল্পিত ও বাস্তবানুগ হলে ঈপ্সিত লক্ষ্যে তাঁরা পৌঁছবেন নিঃসন্দেহে।

লাবণী মণ্ডল: গ্রামে পাঠাগারগুলোতে পাঠকদের বেশিরভাগই শিশু-কিশোর। কিন্তু তাদের মানস গঠনের উপযোগী বই অপ্রতুল। এক্ষেত্রে আপনাদের কোনো ভাবনা বা উদ্যোগ রয়েছে কি?

কামরুল হাসান শায়ক: বাংলাদেশে গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনকে বেশ প্রশংসার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন। এই সংগঠনটি বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সঙ্গে সমন্বয় করে কিছু কিছু উদ্যোগ নিতে পারে। তেমনি একটি উদ্যোগ হতে পারে গ্রামীণ পাঠাগারগুলোতে মানসম্পন্ন শিশু-কিশোর উপযোগী বইপ্রাপ্তির অপ্রতুলতা দূরীকরণ। সারা দেশের গ্রামীণ পাঠাগারগুলোর সঙ্গে প্রকাশকদের নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠেনি। 'গ্রাম পাঠাগার আন্দোলন' নামের সংগঠনটি এই

নেটওয়ার্কিং-এর কাজটি এগিয়ে নিয়েছে। আমি তাই গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করব পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সঙ্গে বেশ কিছু উদ্যোগ যৌথভাবে নেওয়ার। এতে গ্রামীণ পাঠাগারগুলো অবশ্যই অনেক সহযোগিতা পাবে। সমাজের অগ্রসরমুখী পরিবর্তনের গর্বিত অংশীদার বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতিও হতে চায়।

লাবণী মণ্ডল

তাঁর জন্ম টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামে। সবুজের মাঝে বেড়ে ওঠা এ লেখক ভালোবাসেন প্রাণ-প্রকৃতি ও মানুষের গল্প বলতে। দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত রয়েছেন প্রকাশনাশিল্পে। তিনি বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা ও অনলাইন মাধ্যমে সাহিত্য ও বই আলোচনা এবং প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে থাকেন। ইতোমধ্যে যৌথ সম্পাদনায় তাঁর পাঁচটি বই প্রকাশিত হয়েছে।]

পাঠাগারে বহুমাত্রিক সংকটঃ কোন পথে আলো

ইমরান মাহফুজ

চারদিকে বেশ কিছু ভাল কাজ দৃশ্যমান হয়েছে। রাষ্ট্র-সরকার জনকল্যাণমুখী ভাবনায় তা-ই করার কথা। তবে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নে সব সময়ে ভূমিকা রাখে শিক্ষা ও সংস্কৃতি। এ প্রেক্ষিতে মহামান্য সরকারও বিভিন্ন আলাপ আলোচনায় সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্যকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন। কিন্তু কাজ করতে গেলে হতাশ হতে হয় সংস্কৃতিজনদের। এর মধ্যে চলতি বছর ৯ জুন ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট উত্থাপিত হয়। বাজেটের নাম দেওয়া হয়েছে 'কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন।'

বাজেটের আকার হলো ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার। এতে সংস্কৃতি খাতে ৬৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। যা গত অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৫৮ কোটি টাকা বেশি। ২০২১-২২ অর্থবছরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত বাজেট ছিল ৫৮৭ কোটি টাকার। পরবর্তীতে ৮ কোটি টাকা কমে সংশোধিত হয়ে ৫৭৯ কোটি টাকায় রূপ নেয়।

অর্থমন্ত্রী বাজেট-বক্তৃতায় বলেছিলেন, সরকার বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নাটক ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের সৃজনশীল উন্নয়ন ও বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু, বাস্তবতায় কেবল হতাশা জমে থাকে আমাদের!

সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণে রাষ্ট্রযন্ত্রের যে-প্রয়াস থাকা উচিত, তা একেবারেই ক্ষীণ; একেবারে নিভু নিভু প্রদীপের মতো; সব মুখে মুখে বুলি কাজেতে নেই! অনেকটা 'কাজীর গরু কেতাবে আছে, গোয়ালে নেই' প্রবাদের মতো। বিষয়টি চিন্তাশীল সমাজের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক।

দেশব্যাপী সংস্কৃতিচর্চাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথেষ্ট নয় বলেও জানায় সংস্কৃতিজনরা। সম্প্রতি 'সংস্কৃতিকর্মী সমাবেশ' আয়োজন করে উদীচী। সমাবেশে বক্তারা সংস্কৃতি খাতে জাতীয় বাজেটের ন্যূনতম ১ শতাংশ বরাদ্দের দাবি জানান। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি গোলাম কুদ্দুছ বলেন, চিন্তা ও মননগত উন্নয়ন না ঘটলে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন দিয়ে রাষ্ট্র অগ্রসর হবে না।

আচ্ছা পুরোনো দিনে আমরা কেমন ছিলাম–ইতিহাসের দিকে চোখ রাখলে (বাংলাদেশ প্রথম গেজেটিয়ার) একটি জেলার (কুমিল্লা) চিত্র পাই: ১৯৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দে এই জেলায় ৫৬টি গ্রন্থাগার ও ক্লাব ছিল এবং তাদের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩৯,৩৯০ টাকা। এই পরিমাণের মধ্যে সরকারি রাজস্ব থেকে এসেছিল ৬,৭২০ টাকা, জেলা তহবিল থেকে ২৪,১০০ টাকা এবং চাঁদা বাবদ ৮,৫৫০ টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালের গ্রন্থাগার ও ক্লাবগুলোর সদস্য ছিল ৫,৭১৫। ১৯৬৫-৬৬ সালে এ সংখ্যা ছিল ৪,৫০৩ (কুমিল্লা জেলা গেজেটিয়ার/১৯৮১)।

নিশ্চয় স্বীকার করি, জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে বিনোদনের কায়দা। সঙ্গে বেড়েছে আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সেটাই দেখব এখন–কেবল চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় (১টি পৌরসভা ও ১৩টি ইউনিয়ন) বিভিন্ন মানের ও মননের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে প্রায় ৫৭২টি, মসজিদ আছে ৪০০-র অধিক, মন্দিরও আছে প্রায় ১০০। উপজেলায় শিক্ষার হার ৮০.৩২%।

অন্যদিকে উপজেলায় সাহিত্য-সংস্কৃতির সংগঠন, ক্লাব, পাঠাগার, লাইব্রেরি কয়টা আছে? তার হিসাব প্রশাসনিকভাবে কারও জানা নাই। আমার জানামতে ৩টি সংগঠন আছে, ৬টি পাঠাগার আছে, যারা নিয়মিত-অনিয়মিত কাজ করছেন। ২৭১.৭৩ বর্গ কিলোমিটারের মধ্যে প্রায় ৬ লাখের অধিক জনসংখ্যার জন্য ৬টি পাঠাগার কি যথেষ্ট? ঢাকা ছাড়া এই চিত্র প্রায় সারা দেশের...।

চিরায়ত দৃশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে–মসজিদ মাদ্রাসায় যায় মুসলমান, মন্দিরে যায় হিন্দুরা। কিন্তু একটা সাহিত্য-সংস্কৃতির সংগঠনে, ক্লাবে, পাঠাগার বা লাইব্রেরিতে যে-কেউ যেতে পারেন, যায়। এই জায়গায় আমাদের কাজ করতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ ভালো বই বা পাঠাগারে চর্চা হয় সামাজিক মূল্যবোধের, ভূমিকা রাখে নৈতিকতা বিকাশে। দেশ, সমাজ, পরিবারকে এবং প্রাণচঞ্চল জীবনকে ভালোবাসতে শেখায়।

সাম্প্রদায়িক চিন্তা দূর করতে সুস্থ সংস্কৃতিচর্চার কথা সরকার বারবার বলছেন; তাহলে সংস্কৃতি কোথায় চর্চা হচ্ছে, হবে? সেই খবরগুলো রাখতে হবে। আমাদের পরিবারগুলো ভেঙে গেছে। গ্রাম ছাড়াও স্কুলের খেলার মাঠ ভরাট করে ভবন নির্মাণ হচ্ছে। ভুবনে থাকছে না সাধারণ কেউ–সবাই অসাধারণ হয়ে উঠছে। এইভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছি শান্তি, পিছিয়ে পড়ছে মানুষ? তা কতটা–এটা সবার জানা।

পৌরসভা, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে বাজেটের কত ভাগ আমরা সংস্কৃতির জন্য বরাদ্দ দিয়েছি? আমাদের আর্থিক সামর্থ্যর ঘাটতি আছে–এই কথা বলে পার

পাওয়ার সময় এখন আর নেই। অর্থনীতি বেশ মোটাতাজা, বাজেটের আকারও বিশাল। সরকারি উদ্যোগে সারা দেশে পাঁচশরও বেশি মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে; পাশাপশি মন্দির ও গির্জাও হোক। মহাশূন্যে যাচ্ছি আমরা, পদ্মায় সেতু করছি–সবই ভালো। অথচ সংস্কৃতি খাতে বাজেটের এক শতাংশ বরাদ্দ হয় না? সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে হলে, বিস্তার ঘটাতে হলে, অর্থায়ন অবশ্যই করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি অন্যদেরও এগিয়ে আসতে হবে।

খ

বলা যায় বহুমাত্রিক সংকটের সমাজে আমরা বাস করছি। নানান চিন্তায় মানুষ আজকাল বিপর্যস্ত হয়ে পার করছে দিনরাত; প্রাক্তন শিক্ষক, সচিব, ব্যবসায়ী মারা যাচ্ছেন; স্বজন-সন্তান কাছে নেই; নিঃসঙ্গতায় কেউ কেউ আত্মহত্যা করছেন; হায় শান্তি! আচ্ছা কীভাবে শান্তি আসবে? কে দেবে দুদণ্ড শান্তি–জানা নেই। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে প্রমথ চৌধুরীর কথা–তিনি বলেছিলেন, 'লাইব্রেরি হচ্ছে এক ধরনের মনের হাসপাতাল।' আসলে এখনো বইয়ের একটি চিন্তা, কাহিনি কিংবা চরিত্র আপনাকে নিয়ে যাবে দূর থেকে বহুদূর! জটিল অবসাদ থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি দিতে পারে একটি মনের মতো বই বা একটি কবিতা!

এখন কবিতা ও কবিরা কেমন আছেন? কেমন আছে তাদের প্রিয় লাইব্রেরি বা পাঠাগারগুলো? এই নিয়ে সংবাদপত্র ডেইলি স্টারে গত ৩০ মে ২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে এক দীর্ঘ প্রতিবেদন–'গ্রন্থাগারিক সংকটে পাঠাগার, দিনদিন কমছে পাঠক।' যতটা জানা যায়, বইকে ঘিরে সারা দেশে রয়েছে অসংখ্য পাঠাগার, তবে কমছে পাঠক। কারণ হিসেবে উঠে আসছে–বেসরকারি বেশিরভাগ পাঠাগারে নেই গ্রন্থাগারিক, পাঠকের চাহিদামতো বইয়েরও সংকট; ব্যক্তিগত উদ্যাগে গড়ে ওঠা পাঠাগারে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও খুব কম; পাঠাগারগুলোর হয় নি আধুনিকায়নও। অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত বেশিরভাগ পাঠাগারও থাকে বন্ধ।

বিস্তারিত দেখে বলা যায়–সংকট দেখি সবর্ত্র! আমাদের আলো কোথায়, কোথায় আমাদের বাতিঘর? প্রসঙ্গত, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী সেখানে বলেন, "সবাই বলছে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কোন দিকে? মনে রাখতে হবে উন্নয়নের বিরাট একটা অংশ সংস্কৃতি, সংস্কৃতির অংশ পাঠাগার। পাঠাগার মানুষকে নানান বিষয় জানতে-বুঝতে ভূমিকা রাখে। আধুনিক যুগে মানসিক স্বাস্থ্য ছাড়া কোনো উন্নয়ন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। আর মানসিক স্বাস্থ্য সুন্দর রাখতে গভীরভাবে কাজ করে বই ও পাঠাগার, তথা সংস্কৃতির অবিরাম চর্চা।"

তিনি আরও বলেন, "ব্যক্তিগত উদ্যাগে গড়ে ওঠা পাঠাগারগুলোর দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই নিতে হবে, বরাদ্দ বাড়াতে হবে। সেইসঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের বারবার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর পাঠাগারগুলো টিকিয়ে রাখতে সমাজের অন্যদেরও এগিয়ে আসতে হবে।"

কথাসাহিত্যিক ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালনা পরিষদের সদস্য সেলিনা হোসেন বলেন, "পাঠাগার নিয়ে সরকারের বাজেট বাড়ানো নৈতিক দায়িত্ব। তা না হলে সমাজে অন্ধকার নেমে আসবে। গণমানুষের প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতিচর্চা আর কত নিজের থেকে করবে? বেসরকারি পাঠাগারের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিয়ে ভাবা উচিৎ।"

প্রতিবেদক জানাচ্ছেন–সারা দেশে সরকারি গ্রন্থাগার আছে ৭১টি। এর বাইরে বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিচালিত ১ হাজার ৫৩২টি গ্রন্থাগার সরকারিভাবে নিবন্ধিত। বাংলাদেশ গ্রন্থসুহৃদ সমিতির প্রকাশনা থেকে পাওয়া যায়–বেসরকারি গ্রন্থাগার আছে ১ হাজার ৩৭৬টি। পাঠাগার আন্দোলন বাংলাদেশ নামক সংগঠন দাবি করছে, কেবল ৪৭টি জেলায় ২ হাজার ৫০০টি পাঠাগার আছে। তবে দেশে গ্রন্থাগার বা পাঠাগার কতটি, সে হিসাব সরকারি কোনও সংস্থার কাছে নেই।

গণগ্রন্থাগার সমিতি দেশের সব গণগ্রন্থাগারের তথ্যসংবলিত গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রও নতুন করে নির্দেশিকা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানা গেছে। সরকারি ৭১টি গ্রন্থাগারকে দেখভালের দায়িত্বে আছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর। বেসরকারি গ্রন্থাগারকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। দুটো প্রতিষ্ঠানই সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন।

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়সূত্রে জানা গেছে, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোকে সরকার বার্ষিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। এর মধ্যে অর্ধেক টাকা চেকের মাধ্যমে এবং অর্ধেক টাকার বই গ্রন্থকেন্দ্র থেকে সরবরাহ করা হয়। গত বছর দেশের ১ হাজার ১০টি বেসরকারি পাঠাগারকে ক, খ, গ–৩টি শ্রেণীতে ভাগ করে অনুদান দেওয়া হয়। গত অর্থবছরে 'ক' শ্রেণীর এক একটি পাঠাগার বছরে ৫৬ হাজার টাকা, 'খ' শ্রেণীর পাঠাগার ৪০ হাজার টাকা এবং 'গ' শ্রেণীর পাঠাগার ৩৫ হাজার টাকা অনুদান পেয়েছে। মোট বাজেট ছিল ৪ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রসূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের ১৫ জানুয়ারি থেকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র ৫৮৭টি পাঠাগারকে তালিকাভুক্ত করেছে। এই তালিকাভুক্তি সনদ কেবল সরকারি

অনুদানপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে কাজে লাগে। এ-ছাড়া পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক একবার প্রশিক্ষণ করতে পারেন। অনুদান না পেলে বই উপহার পেতে পারেন।

অন্যদিকে পাঠাগার উদ্যোক্তরা দীর্ঘদিন ধরেই অনুদান বাড়ানোর দাবি জানিয়ে আসছেন। তারা বলেন–পাঠাগারের ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, গ্রন্থাগারিকের বেতনসহ ঢাকায় একটি পাঠাগার পরিচালনার ব্যয় মাসে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা। ঢাকার বাইরে জেলা বা উপজেলা সদরে তা ১০ হাজার টাকার কম নয়। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র থেকে যে সহায়তা দেওয়া হয়, তা একটি পাঠাগারের ২ মাসের খরচও হয় না। বেসরকারি পাঠাগারগুলোর উদ্যোক্তারা অন্তত একজন গ্রন্থাগারিকের বেতন সরকারিভাবে দেওয়ার জন্য দাবি জানিয়ে আসছে। কিন্তু কোনও সাড়া পাচ্ছে না।
'পাবলিক লাইব্রেরি' এখন 'ভাগাড়' শিরোনামে খবরে বলা হয়, মৌলভীবাজারের 'কুলাউড়া পাবলিক লাইব্রেরি' নামটি এক সময় সিলেট বিভাগসহ বিভিন্ন এলাকার বইপ্রেমীদের 'বাতিঘর' হিসেবে পরিচিত ছিল। বইপ্রেমী মানুষের কাছে এটি ছিল ঐতিহ্যের স্মারক। কয়েক বছর ধরে গ্রন্থাগারটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সংরক্ষণের অভাবে এটি এখন ময়লা-আবর্জনা ও জলাবদ্ধতায় পরিণত হয়েছে। স্বনামধন্য লেখকদের মূল্যবান বইয়ের সংগ্রহও ধ্বংস হয়ে গেছে।

গ্রন্থাগারের সাবেক গ্রন্থাগারিক খুরশীদ উল্লাহ বলেন, "২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সেখানে কর্মরত ছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে সহকারী গ্রন্থাগারিক শামসুদ্দিন দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ২০১৭ সালে মারা যান। গত ৫ বছর এটি সংরক্ষণে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।" (দ্য ডেইলি স্টার, ২০ জুলাই ২০২২)

স্থায়ী গ্রন্থাগারিক না থাকায় এমন চিত্র দেশের প্রায় সব বেসরকারি পাঠাগারের। শিক্ষার বাতিঘর বলা হয় গ্রন্থাগারকে। গ্রন্থাগার ছাড়া কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র তার নাগরিককে পরিপূর্ণ শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে পারে না। আর তাই পাঠাগারের সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হয় 'পাঠ+আগার' অর্থাৎ পাঠাগার হলো পাঠ করার সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত আগার বা স্থান। পুঁথিগত বিদ্যার ভারে ন্যুব্জ অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মানসিক প্রশান্তির জন্য পাঠাগার অপরিহার্য। পাঠাগার কেবল ভালো ছাত্রই নয়, ভালো মানুষও হতে শেখায়।

হাজার বছর ধরে মানুষের সব জ্ঞান জমা হয়ে রয়েছে বইয়ের ভেতরে। অন্তহীন জ্ঞানের উৎস বই, আর সেই বইয়ের আবাসস্থল পাঠাগার। যেকোনো সমাজের জন্য মনে রাখা জরুরি, বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া জাতীয় চেতনার জাগরণ হয় না। শিক্ষার আলো বঞ্চিত কোনো জাতি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি।

অন্যদিকে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ার দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'রুম টু রিড' ভিন্নভাবে কাজ করছে। এই বিষয়ে রুম টু রিড, বাংলাদেশের কান্ট্রি-ডিরেক্টর রাখী সরকার বলেন, "বইয়ের কার্যক্রম নিয়ে আমরা একটা পরিকল্পনায় কাজ করি। তাই আমাদের উদ্যাগে শিক্ষার্থীদের ধীরে ধীরে পাঠ-অভ্যাস গড়ে উঠছে। তা ছাড়া আমরা একেবারে শ্রেণিকক্ষে গিয়ে কথা বলি। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপযোগী বই নিয়ে 'বুক ক্যাপ্টেন'-এর মাধ্যমে কাজ করি। সেইসঙ্গে আগ্রহ ও ক্লাস বিবেচনায় আমরা নিজেরা বই প্রকাশ করি। ঢাকাসহ দেশের ৪টি জেলায় ২০০৯ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের বইপাঠ নিয়ে কার্যক্রম চলছে।"

বাংলা একাডেমি এবং জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সাবেক পরিচালক, গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ফজলে রাব্বী বলেন, "গণতন্ত্র, গণশিক্ষা ও গণগ্রন্থগার কোনোটিই তো আমার দেশে সফল ও সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। গণতন্ত্র ও গণশিক্ষা উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা কিছু করতে পারি না। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ কিছু কাজ করতে পারি একমাত্র গণগ্রন্থগার উন্নয়ন নিয়ে। এ ক্ষেত্রেও যদি সরকার আন্তরিকতা না দেখায়, সহযোগিতা না করে–তাহলে আগামী অন্ধকার।"

এ বিষয়ে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেন, "দেশের বেসরকারি পাঠাগারগুলো সক্রিয় রাখার জন্য আপাতত একজন গ্রন্থাগারিকের বেতন দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে আমরা অনুদান ছাড়াও কিছু এককালীন অনুদান দিয়ে থাকি, তা থেকে বেতন দিতে পারেন তারা। যদিও সেটা কাগজে লেখা থাকে না, কিন্তু সেদিক বিবেচনা করেই অনুদানটা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে অনুদানের আর্থিক পরিমাণ বাড়ানোর চিন্তা আছে আমাদের।" (দ্য ডেইলি স্টার/ ৩০ মে ২০২২)

সমাজে কোনো মানুষের শরীরের জন্য যেমন খাদ্যের দরকার, তেমনই মনের খাদ্যও তার প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে পারে বই, পাঠাগার। পাঠাগার মানুষের মনকে আনন্দ দেয়। জ্ঞান প্রসারে রুচিবাধ জাগ্রত করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব হৃদয়ের অতল স্পর্শ করিয়াছে। যে যেদিকে ইচ্ছা ধাবমান হও কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।"

বই হাতে, মোবাইলে, যে যেভাবে পড়ুক, অন্তত পড়ুক; কিংবা অডিও শুনুক–তবু জানুক আগামীকে। কারণ হতাশা কাটাতে ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য দরকার পড়ুয়া সমাজ। প্রকৃত জ্ঞানার্জন ও প্রাণশক্তির বৃদ্ধির জন্য দেশের সবখানে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা কিংবা অনলাইনে পাঠাগার পরিচালনার জন্য সবার আন্তরিকতা অত্যন্ত জরুরি।

এখনি প্রয়োজন এই ভূখণ্ডের শত বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া; সেইসঙ্গে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। না হলে প্রজন্মের একটি অংশ মেরুকৃত হয়ে বিভিন্ন উগ্রবাদী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে যাচ্ছে। যা আমাদের জন্য উদ্বিগ্নের। আর সুস্থ সংস্কৃতির চর্চা না থাকায় আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাও হত্যাকাণ্ডের মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছেন।

অথচ দুনিয়ার কোনও ধর্ম হত্যার কথা বলে না, কাউকে আঘাতের কথা বলে না। একজন নবীর আদর্শ মাথায় থাকলে কাউকে হত্যা করা সম্ভব না। তাহলে আজ যারা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের নামে ভাঙচুর করে তারা কারা? কান্না আসে আমার। বলতে ইচ্ছে করে মা তোর বদনখানি মলিন হলে, আমি নয়ন জলে ভাসি।

পাঠাগারের সংকট দূর করতে ৫টি প্রস্তাব:

১. কেবল বই পড়ার কাজ না করে পাঠাগারগুলোকে সাংস্কৃতিক ক্লাবে রূপান্তর করা; যেমন–আবৃত্তি, বিতর্ক, রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে; পাশাপাশি গানের আড্ডা এবং সেগুলো পাঠাগারের ফেসবুক, ইউটিউবে প্রচার করে অন্যদের উৎসাহিত করা। এইভাবে পাঠাগারগুলো নতুনভাবে জেগে উঠবে।

২. পাঠকের চাহিদামতো বই সংগ্রহ করা; যে-এলাকায় যে-মানের পাঠক/শিক্ষার্থী আছে সেই মানের বই রাখা; বিশেষ করে এলাকাভিত্তিক ইতিহাস ও স্মরণীয় ব্যক্তিদের গুরুত্ব দিয়ে তাদের জীবন ও কর্মকে ছড়িয়ে দেওয়া।

৩. অনেক পাঠাগারের এখনো আধুনিকায়ন হয় নি; সেখানে বইয়ের সূত্র ধরে ইন্টারনেট থেকে নতুন কিছু জানার সাহায্য করা; বিখ্যাত বই থেকে সিনেমা নাটক হয়েছে সেগুলো দেখানোর ব্যবস্থা করা; এইসব বিষয়ে নজর দেওয়া উচিৎ।

৪. লেখক-আড্ডা ছাড়াও এলাকার কৃতি শিক্ষক, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানীদের জীবনের গল্প শোনানোর আয়োজন করা; এমন আড্ডা-আলাপে জ্ঞান বিনিময় হয়, ছড়িয়ে পড়ে আলো চারদিকে। নতুনেরা চেনে চিরায়ত মানুষকে।

৫. একজন গ্রন্থাগারিক রাখা জরুরি, যিনি বই পড়েন; কারণ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে পাঠাগার নিয়মিত খোলা রাখা; গ্রন্থাগারিক না থাকলে কোনো কাজই ঠিকমতো হবে না। বেসরকারি অধিকাংশ পাঠাগারে নেই গ্রন্থাগারিক, এবং পাঠাগারে সরকারি-বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতাও খুব কম; ফলে বেশিরভাগ পাঠাগারও থাকে বন্ধ। তাই যেকোনো উপায়ে (সরকারি/বেসরকারি অনুদানে) একজন গ্রন্থাগারিক রাখা অত্যাবশক।

অনন্য ২০ গ্রন্থাগার

শাহেরীন আরাফাত

গ্রন্থাগার বা পাঠাগার–এমন এক জায়গা যেখানে পাঠের বিবিধ উপকরণ সমন্বিত থাকে। আরও সহজ করে বলা যায়, এটি বই ও অন্যান্য তথ্যসমৃদ্ধ প্রকাশনা পাঠের স্থান। উন্নত গ্রন্থাগারগুলো শুধু কাগজে প্রকাশিত বইয়ের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং একইসঙ্গে ডিজিটাল মাধ্যমেও তা পাওয়া যায়। মানুষের বই পড়ার আগ্রহ থেকেই পাঠাগারের সৃষ্টি। যেখানে পাঠক গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করতে পারেন। শত শত বছর আগের মানুষ ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

এ পাঠাগার কিন্তু নতুন কোনো বিষয় নয়। প্রাচীন মিশর বা গ্রিসেও পাঠাগারের অস্তিত্ব ছিল; প্রাচীন ভারতেও ছিল পাঠাগার; আধুনিককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষে গড়ে উঠেছে উন্নত পাঠাগার। বিশ্বখ্যাত পাঠাগারের মধ্যে রয়েছে: ব্রিটিশ মিউজিয়াম, রাশিয়ান স্টেট লাইব্রেরি (লেনিন লাইব্রেরি), ফ্রান্সের জাতীয় গ্রন্থাগার–বিবলিওতেক নাসিওনাল দ্য ফ্রঁস, ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরি। বেশিরভাগ পাঠাগারই সুন্দর এবং নির্মল, যা আপনাকে পাঠের একটি ভালো এবং উপযোগী পরিবেশ দিতে পারে। তবে এমন কিছু পাঠাগারও আছে, যার সৌন্দর্য ও সংগ্রহ অভূতপূর্ব–দমবন্ধ করা!

এমন কিছু পাঠাগারের কথা বিবৃত করা যাক:

১. সেন্ট ম্যাং'স অ্যাবে:
জার্মানির ফুসেনে অবস্থিত সেন্ট ম্যাং'স অ্যাবেতে মূল গ্রন্থাগারের সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে। অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য এখনও রেনেসাঁর কথা মনে করিয়ে দেবে। সুসজ্জিত ডিম্বাকৃতি ঘর, তার মাঝেই বইয়ের সারি।

সেন্ট ম্যাং'স অ্যাবে আগে একটি মঠ ছিল। ১৭ শতকের গোড়ার দিকের কথা, কাউন্টার-রিফরমেশন আন্দোলন ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ক্যাথলিক গির্জা প্রোটেস্ট্যান্টিজমে পরিবর্তিত হয়, তখন এটি বারোক শৈলীর গির্জায় পরিণত হয়। নেপোলিয়ন-যুগের যুদ্ধে ওটিংগেন-ওয়ালারস্টেইনের রাজকুমাররা অ্যাবে দখল করার পর, ১৮ শতকের গোড়ার দিকে গ্রন্থাগারের মূল সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপিগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। সেসব বই ও নথিপত্র এখন অগসবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাখা আছে।

২. তিয়ানজিন বিনহাই:
তিয়ানজিন বিনহাই গ্রন্থাগার বিশ্বের সবচেয়ে নতুন এবং একইভাবে সবচেয়ে আধুনিক গ্রন্থাগারগুলোর একটি। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারটি চীনের তিয়ানজিনের বিনহাই

এলাকায় অবস্থিত। এটি বেইজিংয়ের বাইরে একটি উপকূলীয় মহানগর। বিশাল গোলাকার অডিটোরিয়ামটি সারি সারি বুকশেলফে বেষ্টিত। এর নির্মাণকারী ডাচ স্থাপত্য প্রতিষ্ঠান MVRDV'র তথ্যমতে–গ্রন্থাগারটির বিশাল শেলফগুলোতে প্রায় ১২ লক্ষ গ্রন্থের সংগ্রহ রয়েছে। এ-ছাড়াও কাচঘেরা গ্রন্থাগারটি একটি পার্কের সঙ্গে সংযুক্ত। পাঠক যেমন প্রকৃতির ছোঁয়া নিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবেন, তেমনই পড়া ও আলোচনা করার জন্য রয়েছে বিশাল আয়োজন।

৩. হেইনসা মন্দির:

দক্ষিণ কোরিয়ার হাইনসা অঞ্চলের গয়া পর্বতে অবস্থিত হেইনসা বৌদ্ধ মন্দিরটি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত। তবে এখানে তাকে সাজানো বই নয়, রয়েছে কাঠে খোদাই করে লেখা ব্লক। ১৩ শতক জুড়ে খোদাই করা ৮০ হাজারেরও বেশি কাঠের ব্লকের উপর ৫ কোটি ২০ লাখেরও বেশি অক্ষর, এবং ৬ হাজার ৫৬৮টি ভলিউমে বিস্তৃত নথি ওই মন্দিরে রয়েছে। হেইনসা মন্দিরটি ত্রিপিটক রাখার জন্য ১৫ শতাব্দীতে নির্মাণ করা হয়েছিল।

৪. মালাতেস্তা:

ইতালির সেসেনায় অবস্থিত মালাতেস্তা গ্রন্থাগারটির জন্ম মুদ্রণব্যবস্থা প্রচলনের থেকেও পুরোনো। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম অক্ষত পাবলিক লাইব্রেরিগুলোর একটি, যা ১৫ শতকে নির্মিত হয়। ইতালীয় রেনেসাঁর প্রথম যুগের স্থাপত্য নিদর্শন এ গ্রন্থাগার। এর অভ্যন্তরে একটি আকর্ষণীয় জ্যামিতিক স্থাপনা রয়েছে। দীর্ঘ শ্রমসাধ্য ও কষ্টদায়ক উপায়ে হাতে লেখা ৩৪১টি প্রকাশনা এ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে। এ-ছাড়াও চার লক্ষ নথি রয়েছে এই গ্রন্থাগারে। এর মধ্যে রয়েছে ১৫ শতকের আগে লেখা ২৮৭টি ইনকুনাবুলা বা পুস্তিকা। এটি একসময় পোপ পিউস সপ্তমের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার ছিল।

৫. স্ট্রাহোভ:

প্রাগের স্ট্রাহোভ মঠের গ্রন্থাগারের থিওলজিক্যাল হলটি খ্রিস্টীয় ১৬৭৯ সালে নির্মিত হয়। এটি বারোক শৈলীর এক দুর্দান্ত উদাহরণ। এখানে অনেক বিস্ময়কর স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন–খোদাই করা কাঠের কার্টুচগুলো বইয়ের বিভাগ নির্দেশ করে। রয়েছে ১৮ শতকে সিয়ার্ড নোসেকের আঁকা চমৎকার সব সিলিং-পেইন্টিং।

৬. মাফরা ন্যাশনাল প্যালেস লাইব্রেরি:

পর্তুগালের মাফরা প্রাসাদে এই আশ্চর্যজনক রোকোকো শৈলীর গ্রন্থাগারটি রয়েছে। এটি একটি বারোক মাস্টারপিস; ১৮ শতকে রাজা জু পঞ্চমের আদেশে নির্মিত হয়। এখানে ১৪ থেকে ১৯ শতকের ৩৫ হাজারেরও বেশি চামড়ায় আবদ্ধ ভলিউম রয়েছে। বিস্ময়কর স্থাপত্য ও দুর্দান্ত সাহিত্যের বাইরে আরেকটি বিষয় মাফরা প্রাসাদের গ্রন্থাগারকে ভিন্ন আঙ্গিকে

পরিচিতি দিয়েছে। বই ক্ষতিগ্রস্ত করা পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্রন্থাগারে বাদুড়দের একটি ঘাঁটি রয়েছে!

৭. জোয়ানিনা:
পর্তুগালের কোয়েমব্রা বিশ্ববিদ্যালয়ে আঠারো শতকের দর্শনীয় বারোক শৈলীর নিদর্শন জোয়ানিনা গ্রন্থাগার। মাফরা প্রাসাদের মতোই এ গ্রন্থাগার সুরক্ষায় নিয়োজিত রয়েছে বাদুড়ের দল। অলংকৃত খিলান গ্রন্থাগারের তিনটি বিশাল হলকে পৃথক করেছে। প্রতিটিতে রয়েছে আঁকা সিলিং; আর বুকশেলফগুলো বিশেষ কাঠে নির্মিত। এ-ছাড়াও প্রায় আড়াই লাখ বই রয়েছে এ গ্রন্থাগারে, যার বেশিরভাগই চিকিৎসা, ভূগোল, ইতিহাস, মানবতাবাদী অধ্যয়ন, বিজ্ঞান, আইন, দর্শন এবং ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক।

বইয়ের পোকা নিয়ন্ত্রক বাদুড়গুলো অন্তত ২০০ মেয়াদি সংরক্ষণ পরিকল্পনার অংশ। গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধায়করা প্রতি রাতে আসবাবপত্র ঢেকে রাখেন যাতে তা বাদুড়ের বিষ্ঠা থেকে পরিষ্কার থাকে।

৮. ট্রিনিটি কলেজ:
আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে অবস্থিত ট্রিনিটি কলেজের গ্রন্থাগারটি ১৭৩২ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হওয়ার কালে এক স্তরের প্লাস্টার-সিলিং ছিল। তবে গ্রন্থাগারের বিশাল সংগ্রহ বৃদ্ধির পর এর সম্প্রসারণেরও প্রয়োজন হয়। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে ছাদটি উঁচু করা হয়, যাতে বর্তমান ব্যারেল-ভল্টেড সিলিং এবং উঁচু তাক রাখার পথ তৈরি করা যায়। গ্রন্থাগারের উঁচু তাকগুলোতে হাজার হাজার দুর্লভ এবং অতি-প্রাচীন বই ও নিদর্শন রাখা আছে। ট্রিনিটি কলেজ লাইব্রেরির দোতলার 'লং রুম'টি লম্বায় ৬৪ মিটার ও চওড়ায় ১২ মিটার। গ্রন্থাগারটি পুরোটাই তৈরি ওক কাঠ দিয়ে। যদিও শুরুতে এর ছাদ ছিল ইট, চুন আর সুরকি দিয়ে। পরে সেই ছাদ ভেঙে আগাগোড়া ওক কাঠ দেওয়া হয়। নীরবতা বজায় রাখার নিয়মটি এখানে মানা হয় কঠোরভাবে।

এখানে রয়েছে 'বুক অব কেলস'। লাতিন ভাষায় রচিত নিউ টেস্টামেন্টের চারটি গসপেল নিয়ে পৃথিবীর প্রাচীনতম বইগুলোর অন্যতম 'বুক অব কেলস'। প্রায় ১২২০ বছরের পুরোনো বইটি বিখ্যাত তার মনোমুগ্ধকর ইলাস্ট্রেশন ও ক্যালিগ্রাফির জন্য। আরও রয়েছে ব্রায়ান বোরু বীণা, মধ্যযুগীয় গ্যালিক বীণা, যা থেকে আয়ারল্যান্ডের জাতীয় প্রতীক গঠিত হয়েছিল। তা ছাড়া আইরিশ রিপাবলিকের ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের চুক্তিপত্র এখানে রাখা হয়েছে।

৯. অ্যাবে লাইব্রেরি অব সেন্ট গল:
সুইজারল্যান্ডের সেন্ট গ্যালেনে এই বারোক রোকোকো নির্দশনটি রয়েছে। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের তালিকায় রয়েছে এই স্থাপত্যের বিস্ময়। এটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাসী-গ্রন্থাগার হিসেবে বিবেচিত হয়। ফুল, বাঁকানো ছাঁচের সিলিং, কাঠের বারান্দা–এ

গ্রন্থাগারকে অন্যদের থেকে আলাদা করে–যা প্রাচীনতার আভাস দেয়। এ-ছাড়াও অষ্টম শতাব্দীর পুরোনো পাণ্ডুলিপি পাওয়া যাবে সেন্ট গলের অ্যাবে গ্রন্থাগারে। এখানে পড়ার ঘরটি এমন এক জায়গা, যেখানে আপনি ১৯ শতকের আগে প্রকাশিত এক লাখ ৬০ হাজার মুদ্রিত গ্রন্থের যেকোনো একটি পড়তে পারেন।

১০. অল সোলস কলেজ গ্রন্থাগার:
হেনরি ষষ্ঠ এবং ক্যান্টারবারির আর্চবিশপ ১৪৩৮ খ্রিস্টাব্দে অক্সফোর্ডে 'কলেজ অব অল সোলস অব দ্য ফেইথফুল ডিপার্টেড' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রন্থাগার নির্মাণে ক্রিস্টোফার কোড্রিংটনের ১০ হাজার পাউন্ডের অনুদান এবং তাঁর ব্যক্তিগত ১২ হাজার বইয়ের সংগ্রহ ১৭১০ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত পৌঁছায় নি। নিকোলাস হকসমুর নতুন গ্রন্থাগার-ভবনের নকশা করেছিলেন; ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে যার নির্মাণ শেষ হয়। এ গ্রন্থাগারে এখন প্রায় এক লাখ ৮৫ হাজার বই রয়েছে–যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের আগে প্রকাশিত।

১১. লাইব্রেরি অব কংগ্রেস:
বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রন্থাগার হলো 'লাইব্রেরি অব কংগ্রেস'। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত এই গ্রন্থাগার চালু হয় ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে। তবে এখানে বইয়ের পাশাপাশি থরে থরে সাজানো রয়েছে সিডি-ডিভিডি, মানচিত্র, পাণ্ডুলিপি, পত্রিকা, ছবি, রেকর্ডিং আর আধুনিক যুগের সংবাদ ও তথ্য-মাধ্যমের সবকিছুর সম্ভার। এখানে রয়েছে তিন কোটি নব্বই লাখ বইসহ মোট ষোলো কোটি সত্তর লাখের বেশি সংগ্রহ। প্রায় ৪৭০টি ভাষার বই পাওয়া যাবে এখানে।

সবচেয়ে ছোটো যে-বই সেটিকে দু-আঙুলের মধ্যেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল হবে; সে-বইয়ের পাতা উল্টাতে হয় সুচ দিয়ে। আর সবচেয়ে বড় বইয়ের দৈর্ঘ্য ৭ ফুট, প্রস্থ ৫ ফুট। এই গ্রন্থাগার সামলাতে প্রয়োজন হয় তিন হাজারের বেশি কর্মীর। এই বিশাল সংগ্রহ রাখার জন্য রয়েছে মোট ৮৩৮ কিলোমিটার বুকশেলফ।

১২. ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব চায়না:
এশিয়ার সবচেয়ে বড় ও বিখ্যাত গ্রন্থাগার হলো 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব চায়না'। চীনা সাহিত্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত সব ধরনের বই পাওয়া যায় এখানে। গ্রন্থাগারটি চীনের বেইজিংয়ে স্থাপিত হয় ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯০৯ সালে। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে চার কোটি ১০ লাখের বেশি বই ও অন্যান্য সাময়িকীর সংগ্রহ। প্রায় আট হাজার পাঠক প্রতিদিন এই গ্রন্থাগারে আসেন। এর ভেতরে রয়েছে চার স্তরবিশিষ্ট স্টাডি হল। রয়েছে বিশাল আরামদায়ক সোফা, যেখানে বই পড়তে পড়তে চাইলে ঘুমিয়েও নেওয়া যায়। শিশুদের জন্য রয়েছে খেলাধুলার ব্যবস্থা।

আধুনিক স্থাপত্যশৈলীর অনন্য নিদর্শন এ গ্রন্থাগারে সূর্যের আলোর সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। দিনে রোদ থাকলে লাইট জ্বালানোর প্রয়োজন হয় না কোনো কক্ষে। নতুন ভবনে একসঙ্গে তিন হাজার পাঠক বসে বই পড়তে পারেন। পুরো ভবনে রয়েছে ওয়াইফাই সিস্টেম। যেকোনো জায়গা থেকে ইন্টারনেটে প্রবেশ করা যায়। গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীর জন্য রয়েছে ৫৬০টি কম্পিউটার।

১৩. ব্রিটিশ লাইব্রেরি:
এটি যুক্তরাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগার। খ্রিস্টীয় ১৭৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারটি খুবই বিখ্যাত তার সংগ্রহের তালিকার জন্য। এই গ্রন্থাগারে রয়েছে দুই কোটিরও বেশি বই; এবং অন্যান্য প্রকাশনার এক বিশাল সংগ্রহ। প্রতিবছর এই সংগ্রহশালায় যুক্ত হয় প্রায় ৩০ লাখ বই। গ্রন্থাগারটি যুক্তরাজ্যের জাদুঘরের একটি অংশ হিসেবেও বিবেচিত হয়। প্রায় ১৩২০ বছরের পুরোনো গ্রন্থ 'সেন্ট কাথবের্ট গসপেল' সংরক্ষিত রয়েছে এখানে। স্কটল্যান্ডের নর্দামব্রিয়ান চার্চের ধর্মগুরু সেন্ট কাথবের্টের মৃত্যুর পর তাঁর সমাধিতে কফিনের সঙ্গে গসপেল বুক দেওয়া হয়। নানান হাত ঘুরে বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতেই রয়েছে বইটি।

এই গ্রন্থাগারে রয়েছে ৬২৫ কিলোমিটার বই রাখার শেলফ। বছরে এই শেলফের দৈর্ঘ্য বাড়ে প্রায় ১২ কিলোমিটার। লাইব্রেরি জুড়ে নীরবতা বিরাজ করে, যেন কারও গবেষণার কাজে কোনো বিঘ্ন না হয়। লন্ডনের এই গ্রন্থাগারে রয়েছে ১১টি বিশাল রিডিং-রুম। এখানে প্রবেশ করতে হলে একটি অনুমতিপত্র নিতে হয়। একে বলে 'রিডার পাস'। এটি থাকলে বই নিয়ে রিডিং-রুমে প্রবেশ করা যায়; না থাকলে শুধু ঘুরে দেখা যায়। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে অথবা সরাসরি হাজির হয়ে যে-কেউ এই রিডার-পাস নিতে পারেন। এ-ছাড়াও এখানে রয়েছে ক্যাফেটেরিয়া ও ফ্রি ওয়াই-ফাইয়ের সুবিধা।

১৪. ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব কানাডা:
'ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব কানাডা' বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারটি কানাডার কেন্দ্রীয় সরকারের একটি বিভাগ। কানাডার ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত লেখা, ছবি ও দলিলপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণের দায়ি‡ত্ব নিয়োজিত এই গ্রন্থাগার। যার সংগ্রহে রয়েছে দুই কোটি ৬০ লক্ষ ছয় হাজার ৫৪টি গ্রন্থ।

১৫. হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার:
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি এক পূর্ণাঙ্গ লাইব্রেরি-সিস্টেম। এটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পুরোনো একাডেমিক গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগার, যা অন্তত ৯০টি শাখায় সমন্বিত। বইয়ের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। বই সংগ্রহের দিক থেকে পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম গ্রন্থাগার এটি। এটি প্রথম স্থাপিত হয় ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে।

১৬. রাশিয়ান স্টেট লাইব্রেরি:
রাশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন ও বৃহত্তম গ্রন্থাগার এটি। খ্রিস্টীয় ১৮৬২ সালে কার্যক্রম শুরু হয় জাতীয় এই গ্রন্থাগারের। তখন এর নাম ছিল 'দ্য লাইব্রেরি অব দ্য মস্কো পাবলিক মিউজিয়াম'। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এর নাম পরিবর্তন করে 'ভি আই লেনিন স্টেট লাইব্রেরি অব দ্য ইউএসএসআর' রাখা হয়। ১৯৯২-তে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যায়, তখন আবার এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'রাশিয়ান স্টেট লাইব্রেরি'।

এখানে চার কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি গ্রন্থ ও প্রকাশনা রয়েছে; যার মধ্যে আছে এক কোটি ৭০ লাখেরও বেশি জার্নাল ও দেড় লাখ মানচিত্র। তা ছাড়া বিভিন্ন গবেষণা, মিউজিক রেকর্ড, ম্যাপ এবং পাণ্ডুলিপির বিশাল সংগ্রহ রয়েছে এখানে। বই রাখার জন্য রয়েছে ২৭৫ কিলোমিটার বুকশেলফ। এখানে বই পড়ার জন্য রয়েছে ৩৭টি বিশাল রিডিং-রুম। রাশিয়ার সকল প্রকাশনার অন্তত একটি করে কপি এই গ্রন্থাগারে রয়েছে।

১৭. ডয়েচে বিবলিওথেক:
এটি জার্মানির জাতীয় গ্রন্থাগার। স্থাপিত হয় ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। এ গ্রন্থাগারের কাজ মূলত জার্মান ভাষার প্রকাশনা সংগ্রহ করা। তবে জার্মানিতে প্রকাশিত অন্য ভাষার প্রকাশনাও এখানে সংগ্রহ করা হয়। এ গ্রন্থগারের সংগ্রহে আছে দুই কোটি ৪৪ লাখ ৮৭ হাজারেরও বেশি বই ও অন্যান্য প্রকাশনা।

১৮. ন্যাশনাল ডায়েট লাইব্রেরি:
এ গ্রন্থাগারটি জাপানের রাজধানী টোকিওতে অবস্থিত। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে এটি জননীতি সংক্রান্ত গবেষণার জন্য স্থাপিত হয়। এতে আছে এক কোটি ৪৩ লাখেরও বেশি বই। জাপান জুড়ে এর ২৭টি শাখা আছে। বিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনীতি, আইন, মানচিত্র, সংগীতসহ সব ধরনের বই এ গ্রন্থাগারের সংগ্রহে রয়েছে।

১৯. ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার:
যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় ১৭০১ সালে। পুরোনো একাডেমিক গ্রন্থাগারের মধ্যে এটি অন্যতম। ২২টি আলাদা লাইব্রেরির সমন্বয়ে গঠিত এই গ্রন্থাগারে এক কোটি ৩০ লাখ বই ও প্রকাশনা রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জ্ঞানী-গুণীদের আগমনস্থল এই ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

২০. ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব ফ্রান্স:
ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অবস্থিত 'ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব ফ্রান্স' গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় খ্রিস্টীয় ১৪৬১ সালে। তখন এর নাম ছিল রয়েল লাইব্রেরি এবং এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল ল্যুভর প্রাসাদে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'ইম্পেরিয়াল ন্যাশনাল

লাইব্রেরি', এবং নতুন ভবন নির্মাণ করা হয় ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। এটি এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন। এ গ্রন্থাগারে রয়েছে প্রায় এক কোটি ৪০ লাখেরও বেশি বই ও অন্যান্য প্রকাশনা।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন: বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা

প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুস সাত্তার

প্রকাশ: ০৫ মার্চ, ২০২১; লাইব্রেরিয়ান ভয়েচ (http://www.librarianvoice.org)

সার-সংক্ষেপ

আমাদের জীবনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের অতীত ও ইতিহাসের সম্পর্ক স্থাপন করি এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে ইঙ্গিত নির্মাণ করি। গ্রন্থ রচয়িতা তাঁর অভিজ্ঞতা গ্রন্থে বিবৃত করেন। গ্রন্থ পাঠে আমরা জ্ঞান সাধকদের অভিজ্ঞতাকে আমাদের জীবনের পরিধিতে আঙ্কার করি এবং উপকৃত হই। একটি গ্রন্থাগার, যেখানে বৈচিত্র্যময় গ্রন্থের সংগ্রহ থাকে, সেখানে পৃথিবীর সর্বকালের সবপ্রকার অভিজ্ঞতা, বিদ্যা, জ্ঞান এবং আবিষ্কারের সারাংশ সংরক্ষিত থাকে। একটি গ্রন্থাগারের অতল সমুদ্রে ডুবে থাকে জাতীয় জীবনের বহুবিধ শাখার দিকনির্ণয়ের সমস্ত উপকরণ। মানুষের পরিচয় শুধুমাত্র তার বর্তমান মুহূর্তকে ঘিরে নয়, তার পরিচয় তার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনাকে নিয়ে। অতীতকে জানতে হলে মানব সৃষ্টির ইতহাসের আদিকাল থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে বিপুল ধারাস্রোত প্রবাহিত, এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় অর্জন করতে হবে এবং তাতে করেই যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের আমরা আবিষ্কার করতে সক্ষম হবো। সংগত মানুষ হিসেবে আমাদের পৃথিবীকে জাগ্রত করতে পারব। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের মাধ্যমে মানব সভ্যতার অতীতকে জাজ্বল্যমান করা সম্ভব। বর্তমান মুহূর্তে বর্তমান যেমন অতীতের কোন এক চিন্তার ভবিষ্যৎ, তেমনি ভবিষ্যতের কোনো এক মুহূর্তে বর্তমান চিন্তা ভবিষ্যতের বিষয়বস্তু হবে। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্রমধারা স্রোতের রেখা নির্ণয়ের মাধ্যমে যাতে ভবিষ্যতকে এক উজ্জ্বলতর সম্ভাবনায় আকীর্ণ করা যায়, সেজন্য এই প্রবন্ধের প্রচেষ্টাকে জাগ্রত প্রয়াস রূপে রূপায়ণের প্রচেষ্টা। নির্ণীত রেখায়ন উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে যাঁদের প্রচেষ্টার আঁচড় ছুঁইয়েছিল দূর অতীত থেকে বর্তমান অবধি তাঁদের অন্যতম আমাদের

জাতিরপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান। তাঁর রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে বই ছিলো একটি অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বাড়িতে অবস্থিত পারিবারিক গ্রন্থাগারটি বঙ্গবন্ধুর জীবনের অনন্য সম্পদ। তাঁর ১৩১৩ দিনের নিরলস প্রয়াসের ধারাপাত বক্ষমান প্রবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

ভূমিকা:

বৈজ্ঞানিক মতে বর্তমান উন্নতির মানবজাতির ক্রমবিকাশের বয়স প্রায় ১০,০০০ বছরের। কিন্তু গ্রন্থাগারের কুষ্ঠি বিচারে বর্তমান বিশ্বে সর্বপ্রথম ৪০০০ থেকে ৫০০০ বছর খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি হয় মিশরের সুমেরিয় অঞ্চলে ও এশিয়া মাইনারে। সম্রাট অ্যাশুরবনিপাল কর্তৃক ৬২৫ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় মিশরের নিনেভেতে। খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি জাতীয় গ্রন্থাগার। সে হিসেবে বিশ্বে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার বয়স আড়াই হাজার বছরের। গ্রন্থাগারর সঙ্গে মানবজাতির সভ্যতা বিকাশের নিগূঢ় ও অন্তর্নিহিত বিষয় জড়িত। সভ্যতার বিকাশই হয়তো ঘটতো না যদি না প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে গ্রন্থাগার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করতো। স্বীকার করতেই হবে সভ্যতার বিকাশকে ত্বরান্বিত ও যুগযুগান্তরে বিকশিত করেছে গ্রন্থাগার। বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার জন্য এই উপমহাদেশের সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা অপরিহার্য। প্রায় ৪০০০ থেকে ৫০০০ বছরের প্রাচীন ইতিহাসের ক্রমধারায় বর্ণিত গ্রন্থাগারের বিকাশ নেহায়েৎ অকিঞ্চিতকর নয়। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীনকালের। গোড়া থেকেই অসংখ্য মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ে ও শিক্ষিত পন্ডিত ব্যক্তিদের সংগ্রহে বিভিন্ন ধরণ ও আকারের পুঁথি কিংবা গ্রন্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। ১ বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সূচনা প্রায় ২০০০ বছর পূর্বে। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই অঞ্চলের ময়নামতি ও মহাস্থানগড়সহ অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারগুলোতে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বিশেষত বৌদ্ধ বিহারের

সেসব গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত উপকরণ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য বিভিন্ন দূর দেশের জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মানুষের পদব্রজে আসা-যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ২ এছাড়াও হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জনের জন্য এ অঞ্চলের বৌদ্ধ বিহার গ্রন্থাগারের সামগ্রী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। উক্ত বিবরণ থেকে ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের গ্রন্থাগার বিকাশের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

এ পর্যায়ে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের পর্বকে মোট ৫ ভাগে বিভক্ত করে অনুসন্ধানের ধারা বর্ণনার প্রয়াস করা হলো:

১. প্রাগৈতিহাসিক পর্ব
২. বৃটিশ শাসনকালীন পর্ব
৩. স্বাধীনতা পূর্ব (১৯৪৭-১৯৭১) পর্ব
৪. স্বাধীনতাত্তোর '৭৫ পূর্ব পর্ব (১৩১৩ দিন) ও
৫. পচাত্তোর থেকে বর্তমান পর্যন্ত পর্ব।

১. প্রাগৈতিহাসিক পর্ব

বিশ্ব সভ্যতা বিকাশের মহাসড়কে এই উপমহাদেশের সরব জাগরণ মানব সভ্যতা ও জীবন চর্চার ইতিহাসের একটি উজ্জ্বলতম বিস্ময় হলো মানুষের স্মৃতির সঞ্চয়। মানুষের মৃত্যুর পর 'মানসিক স্মৃতি মানবদেহের সঙ্গেই বিগত হয়। ' সুতরাং সভ্যতার কাল পরিক্রমায় পরিবর্তিত যুগ-যুগান্তরের মানুষের স্মৃতিকে, অভিজ্ঞতাকে, চিন্তা-ভাবনাকে, চেতনা, অনুচিন্তন ও অনুভবের উৎসারিত ফসলকে, সৃষ্টিশীল অনুগামী রচনাগুলোকে, উপলব্ধির উপলক্ষগুলোকে উত্তরসূরীদের জন্য, অনাগত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও মানব সমাজের জন্য গ্রোথিত করে রেখেছিলো গ্রন্থাগার সৃষ্টির মাধ্যমে। কালোত্তীর্ণ ধারাবাহিকতায় সেগুলোই মানুষের চিত্তবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সামগ্রিক বিকাশকে উত্তরসূরীদের জন্য সংরক্ষণ করার মানসে ব্যবহৃত হয়। মধ্য এশিয়ার পোড়া

মাটির ওপর লেখা মৃন্ময় চাকতি (Claz Tablet) কিংবা মিশরের প্যাপিরাসের পাটি মানব সভ্যতার ঊষাকালের উৎকৃষ্টতম উদাহরণ। তখনো সংগ্রহ করা হতো, প্রয়োজনে সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিষয় অনুযায়ী বিন্যাস ব্যবস্থা অবলম্বনের নিদের্শনাও প্রত্যক্ষ করা যায়।

সৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশের সহায়ক আদি বিদ্যাগুলোর মধ্যে একটি প্রাচীনতম অধিবিদ্যার একটি অন্যতম বিদ্যা হচ্ছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা। মানব দর্শনের ষুষ্ঠু বাস্তবায়নের সঠিক দিক নিদের্শনা জ্ঞাপনে গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। একথা বলা অনস্বীকার্য যে, যখন থেকে মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে, তখন থেকেই সেগুলোকে সংগঠিত করা হয়। ইতিহাস পরিক্রমায় জ্ঞান চর্চা, জ্ঞান বিন্যাস ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় গ্রন্থাগারের অগ্রগতি সভ্যতার ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

সুতরাং এমন একটা সময় আসে গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে। এ কারণে প্রাচীন কাল থেকেই জ্ঞানের বিস্তার লাভের পাশাপাশি গ্রন্থাগার সংগঠনের কৌশল অনুশীলন মানব সভ্যতারই বিকাশমান স্রোত ধারার একটি অন্যতম ধারা। এরই ধারাবাহিকতায় একটি গ্রন্থাগার সুন্দরভাবে গড়ে ওঠতে সক্ষম হয়েছে; তা না হলে জঞ্জাল হিসেবে তাবৎ সভ্যতাই পরিত্যক্ত হতো। একটি গ্রন্থাগার যখন সংগঠিত হয় তখন সংগত কারণেই তার সংগ্রহ থাকে অল্প, চাহিদা থাকে সীমিত, কাজের পরিধিও থাকে কম। দিন যায়, প্রয়োজন বৃদ্ধি পায় এবং কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সুবাদে প্রয়োজন ও সেবার চাহিদা বহুমাত্রিকতায় উন্নতি লাভের পাশাপাশি একটি গ্রন্থাগারের সংগ্রহও বৃদ্ধি পেতে খাকে। রঙ্গনাথনের পঞ্চম নীতি অনুযায়ী সংগ্রহ একদিন মহীরূহে রূপ লাভ করে। তাই এর সংগ্রহ থেকে পাঠককে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঠিক সময়ে সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পাঠোপকরণ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি চলে আসে।

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহারগুলোর প্রসার মূলত এদেশে জ্ঞান চর্চার গোড়াপত্তন করে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশকে চলমান রেখেছে। এই সুবাদে দাবী করা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের সূচনা হয় প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক বিকাশমান ধারাটি সেভাবে বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

২. বৃটিশ শাসনকালীন পর্ব

পৃথিবী ও সভ্যতার বিবর্তন হয়েছে; যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ বিভিন্ন দৃশ্যমান-অদৃশ্যমান বিগ্রহের জন্য মানব সভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বহুবার। আবার নবজাগরেণের মাধ্যমে সভ্যতার ব্যাপক স্ফুরণ ঘটেছে যেমনি, একইভাবে সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসনে দেশ ও জাতির শিক্ষা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান ব্যাহত হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসন, আগ্রাসন, চাপিয়ে দেওয়া অপকৌশল উন্নয়নের উপাদানগুলোকে অবদমিত করেছে। প্রায় দু'শ বছরের বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর শাসন আমলে এ উপমহাদেশ তথা বর্তমান বাংলাদেশের অগ্রগতির চেয়ে শোষণই প্রাধান্য পেয়েছে অধিকতর। উল্লেখ্য যে, উন্নয়নের ছোঁয়ায় মানুষ অবাধ্য হয়ে উঠতে পারে এ আশঙ্কায় বৃটিশদের অনীহা প্রবল ছিলো। বিশেষত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠাকরণসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে তেমন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়নি। যেটুকু উন্নয়ন প্রত্যক্ষ করা যায় তা কেবল বৃটিশ শাসন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রয়াসেই।

ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের কিঞ্চিত সূচনা হয়। এ সময়ের মধ্যে অনেক স্থানেই বিভিন্ন শ্রেণির গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে

দেখা যায়। সে সময়ে বৃটিশদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতায় কিছু গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ঊনিশ মতকের প্রথম দশকেই ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান শহর কোলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ত্রিশের দশকে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে। এ সময় লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং'র ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং লর্ড অকল্যান্ডের ভারতবর্ষে আগমনের মধ্যবর্তীকালে (মার্চ ১৮৩৫- ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬) স্যার চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ এক বছরের জন্য অস্থায় বড় লাট নিযুক্ত হোন। এ সময়েই একটি বড় কীর্তি সংগঠিত হয়; ১৮২৩ বঙ্গেরর ১৮২৫ সালে তৎকালীন বোম্বাইয়ের এবং ১৮২৭ সালে মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরক আইনগুলো রদ করে সমগ্র ভারতেই মুদ্রণযন্ত্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ৩ ১৮৩৫ সালে ৩ আগস্ট এই আইনটি বিধিবদ্ধ হয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর কার্যে পরিণত হয়। ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় দেশী ও বিদেশী অধিবাসীবৃন্দ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ বহু সভা-সমিতির আয়োজন করে। এই উদ্দেশ্যে ১৮৩৫ সালের ২০শে আগস্ট কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় স্থির হয় যে কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্থায় নিদর্শন স্বরূপ ''মেটকাফে লাইব্রেরী বিল্ডিং'' নামে একটি ভবন নির্মিত হবে এবং এখানে সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। ৪ এটাই মূলত পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে। গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হলেও প্রকাশ্যভাবে এরেউন্মোচিত হয় ১৮৩৬ সালের ৮ই মার্চ। এটাই ছিলো অবিভক্ত বাংলার সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত প্রথম গণগ্রন্থাগার। ৫

বৃটেনে ১৮৫০ সালে প্রথ গণগ্রন্থাগার আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ঠিক এর এক বছর পর ১৮৫১ সালে যশোরে বেসরকারিভাবে প্রথম একটি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইন প্রবর্তিত হওয়া ফলে গণশিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সেই আদলে ভারবর্ষেও তৎকালীন জমিদার, উমেদার, সমাজসেবী সরকারি কর্মকর্তা ও জনহৈতষী ব্যক্তিদের উদ্যোগে

গণশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৮৫৪ সালে একযোগে আরো তিন জেলা সদর পর্যায়ে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলো হলো উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরি, যার সংগ্রহে ছিল ২৫০০০টি গ্রন্থ, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি ও বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি এবং দু'টি লাইব্রেরির সংগ্রহ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯,৮০০ এবং ১৭, ২০০টি গ্রন্থ। ১৮৫৪ সালটিকে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ইতিহাসে মাইল ফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। পর্যায়ক্রমে জেলা, মহকুমা ও কতক থানা পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ সালে যথাক্রমে রাজশাহী ও কুমিল্লা গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দ্রুত এগিয়ে রিয়ে চলে। ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় নোয়াখালী ও সিলেট পাবলিক লাইব্রেরি। ৬

গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পূর্ব বঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বেশ কিছু কলেজ ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেগুলো ইতোপূর্বেই ঐতিহ্যের শতবর্ষ উত্তীর্ণ হয়েছে। এরমধ্যে ঢাকা কলেজ (১৮৪১), জগন্নাথ কলেজ (১৮৪৪), রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩), বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ (১৮৮৯), এম.সি. কলেজ (১৮৯২), পাবনা এওয়ার্ড কলেজ (১৮৮৯), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৯) অন্যতম।

এরই মধ্যে ১৮৬৭ সালে Press and Registration Book Act পাশ হলে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা হয়। এরপরে পর্যায়ক্রমে ১৮৭২-৭৬ সালের কোন এক সময় বুড়িগঙ্গার তীর ঘেষে ঢাকার বাংলাবাজারে ভারতবর্ষের গভর্ণর নর্থব্রুক হল লোইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন সময়ে গ্রন্থাগারটি ঢাকা শহরের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে উঠে। ১৮৮২ সালে বরিশালের বানারী পাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, পাবনায় ১৮৯০ সালে আনন্দ গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি এবং ১৮৯৭ সালে খুলনায় উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৪ থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আরো বেশ কিছু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে নাটোর ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮৭), নীলফামারী পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯১), এবং ভোলায় ওয়েস্টার্ণ ডায়মন্ড জুবেলি সগ্রন্থাগার ও ক্লাব (১৮৯৮) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিশেষত বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাটি একটু গতিশীল হতে দেখা যায়। এর মধ্যে কুড়িগ্রাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০১), বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বাকল্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৪), উল্লেখ্য চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে (১৯৬৩)। ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পাবলিক লাইব্রেরি, ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক ঢাকার পাটুয়াটুলীতে প্রতিষ্ঠিত হয় পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৫), গাইবন্ধা পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৭), ঢাকা জেলা গেজেটিয়ারের অন্যতম লেখক ও মুন্সীগঞ্জের তৎকালীন জেলা মেজিস্ট্রেট বি.সি. এলেন মুন্সীগঞ্জে হরেন্দ্রলাল পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৮), নওগায় প্যারীমোহন সমবায় পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১০), লালমনিরহাট পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১১), রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়াম রিসার্চ লাইব্রেরি (১৯১০), রাণীনগরপুর ও গুরুদাসপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১৫), প্রতিষ্ঠিত। ১৯১২ সালে কুমিল্লার তৎকালীন সমাজসেবী শ্রী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর মায়ের নামে 'রাম মালা গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা যাদুঘর লাইব্রেরি।

১৯০৬ সাল থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বরোদার মহারাজা গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। স্যার তৃতীয় সায়াজীরাও ১৯১০ সালে মৌলিকভাবে গ্রন্থাগার পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রথম প্রধান পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯১১ সালে বরোদার W.C. Borden'র তত্ত্বধানে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯১৫ ও ১৯১২৯

সালে যথাক্রমে পঞ্জাব ও মাদ্রাজে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা চালু হয় এবং আমেরিকান গ্রন্থাগারিক Asa Don Dickenson'র তত্ত্বধানে লাহোরে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

ওখান থেকে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক বলে খ্যাত কলকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির মরহুম গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ খানসহ বাংলাদেশের অনেক খ্যাতিমান গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবন্বিত হয়ে তৎকালীন ভারত সরকার নিখিল ভারত গ্রন্থাগারিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন ১৯১৮ সালে। তা ৪-৮ জানুয়ারি পর্যন্ত লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও নেতৃস্থানীয় গণগ্রন্থাগারের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পদ্ধতি চালু করে ছোট-বড় সকল গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ৭ এটা একটি সাংবিধানিক কাযর্ক্রম ছিল। তারপরেই ১৮৮৫ সালের স্বায়ত্বশাসন আইন ১৯১৯ সংশোধিত হলো এবং জেলা বোর্ড ও পৌরসভার উপর অর্পিত হলো গ্রন্থাগরের দায়িত্ব। ৮

১৯২১ মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন কার্যত বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই দশকের পূর্ববর্তীকালে বাংলাদেশে ইতস্তত গ্রন্থাগার সৃষ্ঠির উদ্যম অকিঞ্চিৎকর ছিলো না। কিন্তু তখন গ্রন্থাগার আন্দোলন বাংলাদেশে কেন্দ্রীভূত ছিলোনা। এই আন্দোলন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ব্যাপ্ত ছিলো। সমগ্র বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯২৫ সালে অল বেঙ্গল লাইব্রেরি এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ৯

মোটামুটিভাবে আন্দোলনের প্রভাবে বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের প্রসার হতে থাকে। এ দশকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের একটি অধ্যাদেশ প্রচার করে বৃটিশ সরকার। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চালু হয় এবং সে সাথে গ্রন্থাগার সার্ভিসেরও প্রবর্তন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারই মূলত বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের স্বীকৃতি স্বরূপ। ১০ আলোচ্য দশকের মধ্যভাগে ১৯২৪ সালে কতিপয় দেশকর্মীর উদ্যোগে এবং উৎসাহে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুরে জনসাধারণের জন্য কয়েক স্থানে শাখাসহ বিনা চাঁদার ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার সার্ভিস চালু হয়। ঐ সময়ে অন্যান্য কয়েকটি জেলাতেও এই ধরনের গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রয়াস হয়েছিল বলে জানা যায়। ১১ পুনরায় ১৯২৫ সালের জুন মাসে ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি গ্রামে রাজবাড়ি মহকুমা গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে একটি মহকুমা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। . . . সমগ্র দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্দেশ্যে প্রথম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন (১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে) অনুষ্ঠিত হওয়ার কিছু পূর্বে জেলা ও মহকুমা ভিত্তিক কিছু কিছু সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল বাংলাদেশে। ১২

ভারতবর্ষ বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় সকল জেলা সদরে একটি করে পাবিলিক লাইব্রেরি বিদ্যমান ছিল। এখনো সেগুলো কোন না কোনভাবে সরকারি কিংবা বেসরকারি লাইব্রেরি হিসেবে চলমান আছে।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিধারা ১৯৪২ সাল পর্যন্ত ধাবমান ছিল । কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গতিধারায় কতক শিথিলতা নেমে আসে। অন্যদিকে তারই অব্যরহিত কিছুদিন পরে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের উদ্ভব হয়। এর ফলে উজ্জীবিত চাঞ্চল্যেও স্থবিরতা দেখা যায়। আন্দোলন বেশ পছিয়ে পড়ে । ১৩ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ সালে তৎকালীন সরকার প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করার ফলে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তার লাভ করার সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে বিশেষ করে পূর্ব বঙ্গে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ

করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৪১ সালের মধ্যে বরিশাল ও পটুয়খালী অঞ্চলে ৬১টি, বগুড়ায় ৩২টি, ঢাকা জেলায় ২৫টি, ময়মনসিংহ জেলায় ৩৯, ফরিদপুরে ২৩টি, রাজশাহীতে ৪৮টি, রংপুরে ২৬টি, ৫১টি, নোয়াখালী ও সিলেটে যথাক্রমে ১৫ ও ২১টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার খোঁজ পাওয়া যায়। এছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে সরকারি ও বেসরকারি আরো ১২১ টি গ্রন্থাগারের হিসেব পাওয়া যায় বিভিন্ন উৎস থেকে। বর্তমানে এগুলোর অনেকেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে ৩৩৫টিরও বেশি বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার, উমেদার, সমাজ হিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বা পরিবার এই গ্রন্থাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রেখেছিলেন।

৩. স্বাধীনতা পূর্ব (১৯৪৭-১৯৭১) পর্ব

১৯৪৭ সালে ১৪ আগস্ট ভারতবর্ষ বিভক্ত হলো। গ্রন্থাগার উন্নয়ন ঝিমিয়ে পড়ার রেশ তখনো কাটেনি। কার্যত তখন পাঞ্জাব, লাহোর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারই সজীব ছিল বলা যায়। কিন্তু পাকিস্তানের জন্ম ও অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে প্রথম দশ বছর প্রায় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। ১৪ পাকিস্তান এ সময়ে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠার বিষয়ে খুব একটা দৃষ্টি দিতে পারেনি। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি ভাগাভাগির ন্যায় বৃটিশ আমলের ভারতীয় লাইব্রেরিসমূহের ভাগ না পাওয়ায় বেশ ক্ষতিই হয়। কলকাতার ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরি), ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম ও দিল্লী এবং অন্যান্য শহরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারি গ্রন্থাগারের পাওনা কোনো অংশই পাকিস্তান লাভ করেনি। ১৫ কিন্তু অন্যদিকে লাহোরে অবস্থিত সরকারি মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগারগুলো থেকে ভার যথার্থ অংশ আদায় করেছিল। ১৬ গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বর্তমান বাংলাদেশের দৈন্যের সূচনা তখন থেকেই। এছাড়া দেশ বিভাগের পরে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক

অস্থিরতা নিয়ে পাকিস্থানকে রীতিমতো হিমশিম খেতে দেখা যায়। বিশেষ করে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক তৎপরতা পাকিস্তানের শাষক গোষ্ঠীকে এতটাই নাজেহাল করে যে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও নতুন গ্রন্থার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নজর দেওয়ার ফুরসতই ছিল না। আরো লক্ষ্য করা যায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথাযথ সময়, শ্রম ও অর্থের যোগান দেওয়া হয়নি। তারওপর পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ইচ্ছাকৃত অবহেলা আর বৈষম্যমূলক শোষণতো ছিলই। উল্লেখ্য যে, এতোসব টানাপোড়েনের মধ্যে ১৯৪৯ সালে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার 'ডাইরেক্টোরেট অব আর্কাইভস এন্ড লাইব্রেরিজ' প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। একই সময়ে পাকিস্তানের জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ১৯৫৩ সালে বর্তমান কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও সার্বিক গ্রন্থাগার উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। প্রকৃত অর্থে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতেও পাকিস্তানী শাসকদের তেমন আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখা যায়নি। এ সময়ে বিশেষ কজরে মুসলিম লীগ ভেঙ্গে আওয়ামী মুসলিম লীগের জন্ম রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নেবে' বলে ঘোষণা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিবাদ জানান। সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ২ মার্চ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরো সংগঠিত করার লক্ষ্যে ফজলুল হক মুসলিম হলে বিভিন্ন দলের কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকেই শেখ মুজিবুর রহমানের প্রস্তাবক্রমে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। রাষ্ট্র ভাষা প্রশ্নে দেশ দ্বিধা বিভক্ত হয়। সমগ্র দেশ তখন রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবীতে উত্তাল। এ সময় ১১ মার্চে পালিত ধর্মঘট পালনকালে আরো কিছু সহযোদ্ধাদের সাথে বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগারে অন্তরীণ করা হয়; তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত বজায় থাকে (প্রায় দু'বছর পাঁচ মাস)। ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি মাসে খাজা নাজিমউদ্দিন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হবে উর্দু' ঘোষণা করার প্রতিবাদে শেখ মুজিব বন্দী থাকা অবস্থায় ২১ ফেব্রুয়ারিকে রাজবন্দী মুক্তি এবং বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষা করার দাবী দিবস

হিসেবে পালন করার জন্য রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৪ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান এ দাবীতে জেলখানায় অনশন করেন টানা ১৩ দিন। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য তাঁকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তর করে। ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষা করারদাবীতে সোচ্চার ছাত্রসমাজ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশ মিছিলে গুলি করে। এদিন সালাম, জব্বার, বরকত, রফিক, শফিউরসহ আরো অনেকের রক্তের বিনিময়ে বাংলা পূর্ববঙ্গের রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা অর্জন করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ভাষার সঙ্গে বাঙ্গালীর জীবনাচার, সাহিত্য-সংস্কৃতির যোগসূত্র একই সূতোয় গাঁথা, স্বাধীন চিন্তা ও চেতনার প্রকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজন নিজের ভাষা। এই ভাষার দাবী প্রতিষ্ঠায় শেখ মুজিবের আত্মত্যাগ অবিস্মরণীয়। বাংলা ভাষার দাবীকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারার কারণেই বাঙ্গালীর স্বকীয়তার বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়। বাঙ্গালী নিজের মাতৃভাষায় বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় নিজেদের স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়।

আন্দেলনের মুখে ২৬ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব মুক্তি পেলেও তাঁকে হয়রানি করা থেকে পাকিস্তানীরা বিরত থাকেনি। অনেক রক্তের বিনিময়ে বাংলা ভাষার মর্যাদাকে অক্ষণ্ন রাখা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতা রয়ে যাওয়ার কারণেই হয়তো গ্রন্থাগার উন্নয়নের যুৎসই কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দেখা যায় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভাষার সাথে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও প্রকাশনা শিল্প ওতোপ্রোতভাবে শুধু জড়িতই নয় একটি অপরটির পরিপূরক। আর প্রকাশনার উপরই গ্রন্থাগার উন্নয়নের বিষয়টিও সংশ্লিষ্ট। এ সময় এ কারণেই শেখ মুজিবুর রহমানকে বেশি করে সোচ্চার হতে দেখা যায়। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ভাষার উপর ভিত্তি করেই জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ইতিহাস সাহিত্য সৃষ্টি হয়। ভাষার স্বাধীনতা ছাড়া দেশ ও জাতির স্বাধীণতা অর্থহীন। শেখ মুজিবুর রহমান মনে করতেন জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ইতিহাস সাহিত্য সৃষ্টির ধারক ও বাহক হচ্ছে গ্রন্থাগার। এই উপলব্ধি আর কারোর মাঝে উঁকি না মারলেও শেখ

মুজিবুর রহমান মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন জেলখানায় বসে একটি গ্রন্থাগার কী অপরিসীম শক্তি ধারণ করে রাখে। আমরা দেখেছি তাঁর জীবনে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের কী রূপ যোগসূত্র স্থাপন করেছিল।

অব্যাহত সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার ফলে তদানীন্তন পাকিস্তানের শিক্ষা পরিচালকের এক আদেশে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৫৩ সালে চারটি বিভাগীয় সদর দপ্তরে সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপনের এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহীত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৮ ও ১৯৬২-৬৩ শিক্ষবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ও মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স চালু করা হয়। [১৭] ১৯৫৩ সালে ঢাকায় প্রথম কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান গণগ্রন্থাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে একটি মাইল ফলক উন্মোচন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৮৫৪ সালের পর ১৯৫৪ সালে একশত বছর পর এ দেশের অবিসংবাদিত নেতাই আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ববঙ্গে সরকারি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে এক গৌরবোজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করেছিলেন। সম্ভবত ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু গ্রন্থাগারটির পাঠক সেবার দ্বার উন্মোচন করা হয় ১৯৫৮ সালে এবং জনাব আহমাদ হোসাইন প্রথম গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগ দেন। তিনি গ্রন্থাগারিক হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এম.এস ডিগ্রী অর্জন করেন যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ সালে। ১৯৬২ সালে গ্রন্থাগার ভবনটিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১৯৫৫-৫৯ সালের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে বর্তমানে শাহবাগে গ্রন্থাগারের জন স্থান নির্ধারণ করা হয়। অবশেষে ১৯৭৮ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয় ভবন ছেড়ে দিয়ে শাহবাগস্থ বর্তমান ভবনে স্থানান্তরিত হয়। [১৮] অর্থাৎ মহামান্য রাষ্ট্রপতির শিক্ষা উপদেষ্টা সৈয়দ আলী আহসান ৬ জানুয়ারি ১৯৭৮ সালে শাহবাগস্থ বর্তমান কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য। ১৯৫৪ সালের ৩০ জুন জনাব মুহম্মদ সিদ্দিক

খান (এম.এস.খান) যুক্তরাজ্য গমণ করেন উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনের জন্য এবং ১৯৫৪ সালের ৩০ জুন ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

১৯৫৫ সালে তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগারের সহকারি গ্রন্থাগারিক l.C. Key কে দেশের গ্রন্থাগার সেবা জরিপের কাজে নিয়োগ করা হয়। ১৯৫৬ সালে জরিপের কাজ সম্পন্ন হলেও পরবর্তী সময়ে রিপোর্টের সুপারিশসমূহ প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন বরেণ্য গ্রন্থাগারিক মরহুম ফজলে এলাহী'র প্রচেষ্টায় ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ৩ মাসের সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে ফুলব্রাইট বৃত্তি কর্মসূচীতে Miss Millered L. Methvan উক্ত সার্টিফিকেট কোর্সে শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম চালু হয়। এটি ছিল ৬ মাসের একটি সার্টিফিকেট পাঠ্যক্রম। ১৯

বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে জেলা ও মহকুমা পর্যায়েবেশ কিছু গ্রন্থগার প্রতিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে কিছু কিছু মিউনিসিপাল লাইব্রেরি হিসে চিহ্নিত; সিলেটের হবিগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরি, সিলেট মিউনিসিপাল লাইব্রেরি, বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মিউনিসিপাল পাবলিক লাইব্রেরি, নারায়ণগঞ্জ মিউনিসিপাল লাইব্রেরি, রংপুর মিউনিসিপাল পাবলিক লাইব্রেরি অন্তর্ভুক্ত। এই লাইব্রোরগুলো মূলত জনসাধারণের চাঁদা ও অনিয়মিত সরকারি অনুদানের সাহায্যে ব্যয়ভার বহন করা হতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তদানীন্তন পাকিস্তানের শিক্ষা পরিচালকের এক আদেশে ৪টি বিভাগীয় সদর দপ্তরে সরকারি গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তারই ফলস্বরূপ ১৯৫৩ প্রথম ঢাকায় কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নেতা শের-ই-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের নেতৃত্বে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো অনেকে নির্বাচনে জয়লাভ করেন। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভায় শেখ মুজিবুর রহমানও একজন সদস্য ছিলেন। স্মতব্য যে, এই উপমহাদেশে ১৮৫৪ সালে জেলা পর্যায়ে ৩টি গণগ্রন্থাগারের ঠিক একশ বছর পর ১৯৫৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান গণগ্রন্থাগারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। যদিও এর পাঠক সেবার দ্বার উন্মোচন করা হয় ১৯৫৮ সালে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৩ সালে স্থাপিত হয় চট্টগ্রাম বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার এবং ১৯৬৫ সলে স্থাপিত হয় খুলনা বিভাগীয় সরকারি গণগ্রন্থাগার। ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ছাড়া তেমন আশাব্যঞ্জক গ্রন্থাগার উন্নতি লাভ করেনি। ২০

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কলেজ গ্রন্থাগারের উন্নয়ন ও নিয়োজিত করমীদের উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। ১৯৬০-৬৫ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় একই ব্যবস্থা রাখা হয়। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে পেশাজীবী ও মধ্যম পেশাজীবী গ্রন্থাগার কর্মকর্তা ও করমচারীদের টিচিং স্ফ ক্যাটাগরিতে মূল্যায়ন করা হয়। এবং বেতন কাঠামোও পরিবর্তন করা হয়। ২১ কিন্তু কেন্দ্রীয় গণগন্থাগার স্থাপনের পরও গ্রন্থাগার উন্নয়ন তথা আন্দোলনের তেমন কোন উন্নতি হয়নি। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নিরলিপ্ততাই মুখ্য ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। ১৯৬৫ সালের পর সরকারের মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার সার্ভিসকে শিক্ষার অঙ্গীভূত হিসেবে গণ্য করা হয়। সে সঙ্গে যথাযথ উপায়ে বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগার স্থাপন ও উন্নয়নের জন্য মূখ্য পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সে সময় প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপন ও ৩৬টি কলেজ সংস্কার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে একটি পরিকল্পনাও গৃহীত হয়। কিন্তু সেই প্রস্তাবিত পরিকল্পনার কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। তাছাড়াও, ১৯৭০-১৯৭৫ সালের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অধীনে

ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীর গ্রন্থাগার উন্নয়ন ও আলাদা একটি পরিদপ্তর গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু সেই পরিকল্পনাও আর বাস্তবায়িত হয়নি।

অবিভক্ত ভারতবর্ষে কয়েকটি বিশেষ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে ১৮৫৭ সালে তৎকালীন ডেপুটি কশিনারের তত্ত্বাবধানে ঢাকার কমিশনার অফিসে এবং ১৮৬৫ সালে রাজশাহীর কালেক্টোরেটে একটি বড় সংগ্রহশালা গড়ে তোলা হয়। ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বার গ্রন্থাগার। এছাড়া আরেকটি বিশেষ গ্রন্থাগারের সন্ধান পাওয়া যায়, রাজশাহী কমিশনারের কারযালয়ের গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে এবং একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশনের গ্রন্থাগার। এছাড়া আর কোন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলেও পূর্ব বঙ্গের কোথাও সেগুলোর অস্তিত্ব নেই। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পরে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ১৮টি প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা লাভের ঠিকানা পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে সেক্রেটারিয়েট, বাংলাদেশ এ্যাসেম্বলি হাউজ, ল্যান্ড রেকর্ড ও সার্ভে গ্রন্থাগার অন্যতম। এছাড়া ১৯৫৭ সালে পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই.বি.এ. গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৬ সালে এবং বি.আই.ডি.এস ১৯৭২-৭৩ ও ৭৩-৭৪ সালে ফোর্ড ফাউন্ডশেন কর্তৃক প্রদত্ত ডোনেশন প্রাপ্ত হয়। . . . ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ১২১টি বিশেষ গ্রন্থাগারের হিসেবে পাওয়া যায় । ২২

১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতি (পাকিস্তান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন) নামে প্রতিষ্ঠি হয়। এরপূর্বে ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে ঢাকার পলাশী ব্যারাকে একটি গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে অন্যতম আবদুর রহমান মৃধা, এ.ই.এম শামসুল হক, রকিব হোসাইন, সিদ্দিক আহমেদ চৌধুরী, জামিল খান, খন্দকার আবদুর রব এবং তোফাজ্জল হোসেন। পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগের প্রধান এবং খন্ডকালীন গ্রন্থাগারিক ড. নাফিস আহমেদের

নেতৃত্বে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন আহমদ হোসাইন, আবদুর রহমান মৃধা, রকিব হোসাইন, এ.এম মোতাহার আলী খান এবং নার্গিস জাফর। এ সময়েই আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সমিতি তৎকালীন East Pakistan Library Association'র প্রস্তাব করা হয়। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারি মাসে প্রস্তাবিত পূর্ব পাকিস্তান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের খসড়া গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য তিন সদস্যের একটি উপকমিটি গঠন করা হয়। আহমদ হোসাইন, আবদুর রহমান মৃধা ও রকিব হোসাইনকে নিয়ে গঠিত এই কমিটিকে সহায়তা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের রিডার শামসুজ্জামান আনসারী। তাঁদের সুপারিশের ভিত্তিতে গঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতি। ১৯৫৬ সালের ৩০ জুন ঢাকার ইউএসআইএস মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির খসড়া সংবিধান অনুমোদিত হয়।

১৯৫৬ সালের বার্ষিক সাধারণ সভায় গঠিত সমিতির প্রথম কার্যকরী পরিষদের সভাপতি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক মোঃ সিদ্দিক খান, সম্পাদকের দায়িত্ব পান ইউএসআইএস'র প্রধান গ্রন্থাগারিক রকিব হোসাইন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক আবদুর রহমান মৃধা নির্বাচিত হয়ে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ হিসেবে। কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫।

১৯৬০ সালের ২৪-২৮ ডিসেম্বরে East Pakistan Library Association'র উদ্যোগে Pakistan Library Association'র সাথে যৌথভাবে ঢাকায় প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তদানীন্তন পাকিস্তানের গভর্ণর লেঃ জেনারেল মোঃ আজম খান। ১৯৬৩ সালে East Pakistan Library Association দ্বিতীয় সম্মেলনের আয়োজন করে ঢাকায়।

পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর বৈরি আচরণ ও অবদমিত করে রাখার সুদূর প্রসারী মনোভাব ততোদিনে শুধু গ্রন্থাগার পেশাজীবীরাই অনুধাবন করেনি। দেশের তাবৎ সচেতন মানুষ তথা রাজনীতিক মধ্যে সকল প্রকার বৈষম্যের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময়ে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে পাকিস্তানীদের বৈষম্য থেকে উত্তরণের জন্য জাতির উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক ৬ দফা ঘোষণা করেন ; যাকে বাঙালীর মুক্তির সনদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। ৬ দফা মধ্যেই নিহিত ছিলো বাঙালীর সাহিত্য, ইতিহাস-কৃষ্টি-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ভাবনা। যার নিগূঢ় তত্ত্ব হলো বাঙলা ও বাঙালীর জাগৃতি-স্বাধীকার অর্জনের স্বাপ্নিক ভাবনা। এ অবস্থায় সংগত কারণেই দেশের রাজনৈতিক অবস্থা আরো জটিল হতে থাকে; শেখ মুজিবুর রহমানকে দফায় দফায় বিভিন্ন কারণে-অকারণে মামলা দিয়ে ও ষড়যন্ত্র করে অন্তরীণ করা হয়। পূর্ব বাংলার মানুষকে দমন-পীড়নের মাধ্যরেম অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে অতিষ্ঠ করে তোলে। রাজনৈতিক কর্মসূচী তবু থেমে থাকেনি। কিন্তু ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে তথাকাথত আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় এক নম্বর আসামী করে গ্রেফতার দেখানোহয়। ১৭ জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেইট থেকে গ্রেফতার করে আটকে রাখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতর অজানা জায়গায়। কঠোর রনরাপত্তার মধ্যে ১৯ জুন বিচার প্রক্রিয়া শুরু করে।

৫ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঐক্যবদ্ধ হয়ে শেখ মুজিবের ৬ দফাসহ ১১ দফার আন্দোলন জোরদার করে আরো সোচ্চার হয়। 'জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো'-এই শ্লোগানকে সামনে নিয়ে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলো। এই আন্দোলন থেকেই রূপ নেয় ৬৯'র গণঅভ্যুত্থানে। ২২ ফেব্রুয়ারী জনগণের অব্যাহত চপের মুখে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সকল আসামীদের মুক্তি দেওয়া হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শেখ

মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সংবর্ধনা সমাবেশে ১০ লাখ ছাত্র-জনতার উপস্থিতিতে জনাব তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবকে ''বঙ্গবন্ধু'' উপাধীতে ভূষিত করে নেতা ভূষিত করেন। এভাবেই পাকিস্তান বিভক্তির আভাস আরো স্পষ্টতর হতে থাকে।

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর বিভক্তির বিষয়টি পরিণতির দিকে ক্রমে অগ্রসর হতে থাকে। আওয়ামীলীগ নির্বাচনে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তন্তরে পাকিস্তানীদের একপেশে মনোভাবের কারণে ৬ দফাসহ স্বাধীকারের দাবী থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সারা দেশ ও দেশের মানুষের ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নয় মাস সংগ্রামের পর ৩০ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ ও দুইলক্ষের অধিক মা-বোনের লাঞ্ছনার বিনিময়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে সবুজে লাল সূর্যখচিত পতাকার স্বাধীন বাংলাদেশ অর্জিত হয়। 'প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও এ পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে গ্রন্থাগার সেবা প্রদানের জন্য কোন সম্পদ ও সম্পত্তির অংশ বাংলাদেশ লাভ করেনি। ' ২৩

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার অব্যবহিত পরেই পূর্ব পকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতির পুনঃনামকরণ করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (Bangladesh Library Association (LAB)) নির্ধারণ করা হয়। এরপর বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯৭৬ সালে আন্তর্জাতিক লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (IFLA) ও কমনওয়েলথ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের (COMLA) স্বীকৃতি অর্জন করে সদস্য পদ প্রাপ্ত হয়।

২০০৪ সালে সমিতির গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনীত হয়; পরিবর্তনের প্রধান বিষয়গুলোর অন্যতম ছিল পোস্টাল বেলটের পরিবর্তে সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় সংশোধন হলো ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের স্থলে হবে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ। সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সদস্যদের সরাসরি ভোটে প্রথম সভাপতি সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয় যথাক্রমে প্রফেসর ড. এম. আবদুসসাত্তার ও সৈয়দ আলী আকবর। ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত দশম সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের সদস্য সংখ্যা করে ২১ জন নির্ধারণ করা হয়। সভাপতি, মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষ ছাড়াও কমিটিতে থাকবেন তিনজন সহ-সভাপতি, একজন যুগ্ম মহাসচিব, একজন সাংগঠনিক সম্পাদক, একজন মহিলা বিষয়ক সম্পাদকসহ মোট চারজন সম্পাদক এবং ১১ জন কাউন্সিলর। এর মধ্যে ৫জন কেন্দ্রীয় কাউন্সিলর এবং ছয়টি পদ দেশের ছয়টি বিভাগের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। প্রশাসনিক বিভাগ বৃদ্ধি পাওয়ায় আরো একজন কাউন্সিলরের পদ বৃদ্ধি করা হয়। ২০১২-২০১৪ সময় কালের নির্বাচনে ২২ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়। পুনরায় ২০১৪-২০১৭ সালের কার্যকরী পরিষদ নিরবাচনে আরো একজন বিভাগীয় কাউন্সিলরের পদ সংযুক্ত হয়। পরিষদ সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে ২৩ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়। সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় তিন বছরের জন্য এ কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত হয়ে থাকে।

৪ . স্বাধীনতাত্তোর ' ৭৫ পূর্ব (১৩১৩ দিন) পর্ব

ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র, বঙ্গবন্ধুর বাঙ্গালীর মুক্তির সনদ ৬ দফাসহ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার বিস্ফোরণ , ৭০'র নির্বাচনে জয়লাভ ও সরকার গঠনের ম্যান্ডেট নিয়ে পাকিস্তানীদের তালবাহানা, সর্বোপরি দীর্ঘ সময়ের নির্যাতনের নাগপাশ থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় বঙ্গবন্ধুর উদাত্ত আহ্বানে স্বাধীনতার যুদ্ধ; ৩০ লক্ষ শহীদের শহীদের এক সাগর রক্তের বিনিময়ে

বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। দেশ মুক্তি পায় দীর্ঘ সময়ের দাসত্বের বেড়াজাল থেকে। বিশ্বের মানচিত্রে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আজ বাংলাদেশ। কিন্তু সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ এ ভগ্ন-ক্লিষ্ট শরীরবিশিষ্টধ্বংসপ্রাপ্ত মাত্র। পাকিস্তানী হায়েনার দল দেশটিকে ক্ষত-বিক্ষত করে রেখে গেছে। যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই নজরে আসে জ্বলে পুড়ে ছাড়খার হওয়া ভগ্নস্তুপ, পচাগলা লাশের আর পোড়ামাটির গন্ধ। যেদিন 'বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরলেন (১০ জানুয়ারি ১৯৭২) তখনো আকাশ-বাতাসে বারুদ আর লাশের গন্ধ। দুঃখিনী মাটির গগনবিদারী কান্না ও ধ্বংসস্তুপের পৈশাচিকরূপ কালের স্বাক্ষী হয়ে অত্যাচারের বিভৎসতার জানান দেয়। বঙ্গবন্ধু কেঁদে ফেললেন সেদিন-'এ কী দেখছি'? নিজে সারা জীবনের অর্ধেকের বেশী সময় জেলেন বদ্ধ চার দেয়ালের জীবন কাটিয়েছেন যাতে এ দেশের প্রিয় মানুষগুলো সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নত জীবন যাপন করতে পারে, হাসতে পারে, খোলা বাতাসে খেলতে পারে, পেট ভরে দু'বেলা খেতে পারে। বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন এ সব মানুষদের নিয়ে। আর ভাবতেন কবে এ দেশের মানুষগুলোকে মানুষরূপে গড়তে পারবেন। কিন্তু দেশের মাটিতে পা রেখে তিনি এ কী দেখছেন? অঝোর ধারায় কাঁদলেন আর আপন মনেই গেঁথে নিলেন নিজের ভাবনা আগামী দিনে কী করতে হবে তাঁকে। কীভাবে দেশকে গড়বেন।

আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশ পুর্ণগঠনে লেগে পড়েন সহযোগীদের নিয়ে। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। ১৬ ডিসেম্বর থেকে সংবিধান কার্যকর হয়। সবই নুতনভাবে গড়ে তোলে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণের স্বার্থে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দিলেন। উল্লেখ্য যে, যুদ্ধকালীন সময়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় সংযুক্ত অসংখ্য গ্রন্থাগারসহ দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো পরযদুস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেসব বিবেচনায় নিয়েই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিকল্পনা গৃহীত হয় দেশ পুনর্গঠনের জন্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার

আলোকে বিশেষ করে ঔনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার সরকার এক দূরদর্শী ও সুদূর-প্রসারী মনোভাব নিয়ে ডক্টর কুদরত-ই-খুদা'র নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনে যুগান্তকারী প্রতিবেদন পেশ করা হয় ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর লালিত ভাবনার যুগান্তকারী প্রতিফলন ঘটে কমিশনের প্রতিবেদনে। যার বাস্তবায়নে অনায়াসে পিছিয়ে থাকা যুদ্ধে ধ্বংসপ্রায় দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব বলে বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই বিবেচনায় রেখে কমিশন সঠিক দায়িত্ব পালন করন যার বাস্তবতা আজো অনস্বীকার্য।

এতে এই উপলব্ধ হয় যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ যেকোন গবেষণা ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের হৃৎপিণ্ড হিসেবে স্বীকৃত। আমাদের বেশির ভাগ শিক্ষা তথা প্রতিষ্ঠানগুলোর হৃৎপিণ্ড নিস্পন্দ। বিশেষত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাঞ্জল ও স্বার্থক করে তুলতে হলে নতুনভাবে সাজাতে হবে। এ বিশ্বাসে আত্মপ্রত্যয়ী বঙ্গবন্ধু কুদরত-ই-খুদা' শিক্ষা কমিশনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

প্রতিবেদনে গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিধি বা মান নির্দেশ করা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন কর্মী এবং প্রশাসন কর্তৃপক্ষ উন্নয়নের একটা সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে এগুতে পারেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে কিছুটা সমতা বিধান হয়। নির্দেশিত মানের প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পুনর্বিবেচনা আবশ্যক; এমন ধারণা থেকেই ডক্টর কুদরত-ই-খুদা'র প্রতিবেদনটি পূর্ণতা পায়। ঔপনিবেশিক ভাবধরায় লালিত ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলো আগামী প্রজন্মের কী কাজে আসবে ভেবে সদ্য স্বাধীন দেশের সরকার পূণর্গঠনের বিষয়টি বিবেচনায় আনবে এটাই তো স্বাভাবিক।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমনটি ভেবেছেন তেমন দিকনির্দেশনার সম্পূরক হিসেবেই যুৎসই একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে কমিশন দায়িত্ব পালন করেন। নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলোর বর্ণনা থেকে তাই প্রতিভাত হয়েছে। সদ্য স্বাধীন দেশের শিক্ষানীতিএমনটাই হওয়া উচিৎ যে কেউ তা স্বীকার করবেন। ডক্টর কুদরত-ই-খুদা'র কমিশনের গ্রন্থাগার সংশ্লিষ্ট বিবেচ্যসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো। ২৪

১. প্রাথমিক স্কুলের গ্রন্থাগার

বইয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি ও মর্যাদাবোধ জাগানো এবং পাঠাভ্যাসের বীজ বপনের জন্য ছোটদের হাতে বই তুলে দেওয়ার দায়িত্ব প্রথমে অভিভাবকদের, পরে প্রাথমিক স্কুলের উপর বর্তায়। কিন্তু দায়িত্বযথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। এ পর্যন্ত কোন উন্নয়ন পরিকল্পনায় এ দেশের প্রাথমিক স্কুলে পরিবেশনের কথা চিন্তা করা হয়নি। ফলে প্রাথমিক স্কুলে গ্রন্থাগার স্থাপন করে প্রাথমিক স্কুলগুলোতে বই সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়। প্রত্যেক ইউনিয়নের এক বা একাধিক নির্ধারিত প্রাথমিক স্কুলকে ভ্রাম্যমান বইয়ের শিবির রূপে ব্যবহার করতে হবে। সরকারী উদ্যোগে শিশুদের জন্য মনোরম বই ও সাময়িকী প্রকাশনা ও তা স্বল্পমূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

২.মাধ্যমিক স্কুল গ্রন্থাগার

মাধ্যমিক স্কুলগুলোতেও গ্রন্থাগার অত্যন্ত অবহেলিত। বইয়ের স্বল্পতা, স্থানাভাব, গ্রন্থাগারিকের অভাব, সর্বোপরি শিক্ষক ও ছাত্রদের মনে বই পড়ার

প্রেরণার অভাব মাধ্যমিক স্কুলগুলোর করুণ চিত্রের পরিচয় প্রদান করে। মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারগুলোকে সম্পূর্ণ নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। দেশের সর্বত্র সুসমভাবে নির্ধারিত নিম্নতম মানের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতক গড়ে তোলার দিকে আশু দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ স্থাপন মাধ্যমিক স্কুলের গ্রন্থাগারের ব্যর্থতায় সুনিশ্চিত পরিণাম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের ব্যর্থতা।

৩. কলেজ গ্রন্থাগার

দেশের করেজের গ্রন্থাগারগুলোর দৈন্যতা মূলত মাধ্যমিক স্কুলোর মতোই। সরকারি কলেজগুলোর অবস্থা একটু ভালো হলেও বেসরকারি কলেজগুলোর গ্রন্থাগারের দুর্দশা অত্যন্ত প্রকট। সম্প্রতি অনেক কলেজ ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে, কোন কোন কলেজে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে, এমন কি কিছু সংখ্যক কলেজে পোস্ট-গ্রাজুয়েট ক্লাশ প্রবর্তন করা হয়েছ। কিন্তু ঐসব কলেজগুলার গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের বস্তুত কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। কলেজগুলোকে বড়, ছোট ও মাঝারি-এ তিন পর্যায়ে বিভক্ত করে গ্রন্থাগারসমূহের উন্নয়নের নিম্নতম মান নির্দেশ করা হয়েছে। তাতে গ্রন্থাগারের আয়তন. ব্যয় বরাদ্দ ও পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সুপারিশ করা হয়েছে, তা অনুসরণ করার জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বর্তমানে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রয়েছে, কমিশনের মতে তাও সন্তোষজনক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ব্যাপারে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই পর্যায়ে গ্রন্থাগারগুলোর কার্যাকারিতা ও দুর্বলতার

খতিয়ান তৈরি করা দরকার। এই খতিয়ানের ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শদানের জন্য প্রখ্যাত গ্রন্থাগারিকদের সমন্বয়ে একটি গ্রন্থাগার কমিটি গঠন দরকার মনে করে কমিশন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরী কমিশনের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বই-সাময়িকীর বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে, গবেষণা কর্মকে জোরদার করবার জন্য রেফারেন্স বিভাগকে শক্তিশালী করতে হবে এবং বিদেশি বেই, সাময়িকী, ফিল্ম, ইত্যাদী আমদানির জন্য পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকারী আনুকুল্যের প্রয়োজন হবে।

৫. গণগ্রন্থাগার

উন্নত দেশে গণগ্রন্থাগার বলতে বোঝায় আইনভিত্তিক ট্যাক্স নির্ভর সাংস্কৃতিক সেবা প্রতিষ্ঠান, যাতে জনগণের প্রবেশাধিকার অবাধ, সর্বস্তরের জনগণ সেখানে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থী সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীরাও গণগ্রন্থাগার ব্যবহার করে। আমাদের জাতীয় লক্ষ্য হবে দেশব্যাপী গণগ্রন্থাগারের বিস্তার, যাতে প্রত্যেক নাগরিক তার বাস্থানের অনধিক এক মাইলের মধ্যে গণগ্রন্থাগারের সেবা পেতে পারেন। তজ্জন্য গণগ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে ট্রাক্স ধার্য, গণগ্রন্থাগার পরিদপ্তর স্থাপন এবং গণগ্রন্থাগার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে।

অবিলম্বে রাজশাহীতে গণগ্রন্থাগার স্থাপন করা দরকার। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনায় অবস্থিত সরকারি গণগ্রন্থাগারের স্থানাভাব সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং এদের বই বরাদ্দ তিনগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের জন্য সরকারি সাহায্য বৃদ্ধি করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অনাবর্তক মঞ্জুরীর ব্যবস্থা

করতে হবে। বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগারকে জাথীয় গ্রন্থাগারে উন্নীত বরে একে কপিরাইটের অধিকার দিতে হবে এবং আইনভিত্তিক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান রূপে গঠন এবং গণগ্রন্থাগার উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে হবে।

৬. জাতীয় আর্কাইভস

রাষ্ট্র ও নাগরিকদেরে অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড এবং জাতীয় ইতিহাসের মৌলিক দস্তাবেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং গবেষণার প্রয়োজনে সুষ্ঠূ বিন্যাসের জন্য আর্কাইভস পরিদপ্তর স্থাপন করা ও জাতীয় আর্কাইভসকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দান এবং জাতীয় আর্কাইভস কমিশন নিয়োগ করা দরকার।

৭. গ্রন্থাগার প্রশিক্ষণ

শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী উন্নতমানের গ্রন্থাগার পরিচালনের কয়েক হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন হবে। এ চাহিদা পূরণের পক্ষে বর্তমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আদৌ যথেষ্ট নয়। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ খোলা এবং ঢাকায় একপট গ্রন্থাগার ইনস্টিটিউট স্থাপন করা আবশ্যক বলে কমিশিন সুপারিশ করে। সমতুল্য যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকেদেরকে পদমর্যাদা ও পারিশ্রমিকের ব্যাপারে শিক্ষকদের পর্যায়ভুক্ত করা উচিৎ বলেও কমিশন সুপারিশ করে।

সুপারিশগুলো কমিশনের হলেও প্রকারন্তরে বঙ্গবন্ধুই মনেপ্রাণে চাইছিলেন এমন একটি সুগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হোক যাতে প্রজন্মান্তরের জন্য একটি সুশিক্ষিত

জাতি গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তিনি মনেপ্রাণে এও বিশ্বাস করতেন যে, সুশিক্ষিত, মননশীল ও সৃষ্টিশীল জাতি গঠন করতে না পারলে এদেশ কখনো পৃথিবীর বুকে উন্নত জাতি হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। তাই তিনি পুণর্গঠনের প্রথম পর্যায়েই ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। সবই নতুনভাবে গড়ে তোলে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণের স্বার্থে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রথম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশ দেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুণর্গঠন, এক কোটি মানুষের পুণর্বাসন, যোগাযোগ বচ্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত বিনামূল্যে এবং মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত নামমাত্র মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুণর্গঠন, ১১,০০০ নতুন প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠাসহ ৪০,০০০ প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ, দুঃস্থ মহিলাদের কল্যালণের জন্য নারী পুণর্বাসন সংস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট গঠন, ২৫ বিঘা পর্যন্ত কৃষিজমির খাজনা মওকুফসহ আরো অষংখ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে একটি সুদৃঢ় পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। যার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিনির্মাণ করে ধীরে ধীরে দেশকে একটি সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রয়াস তিনি চালিয়েছিলেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন ধরে কারাগারে বন্দীজীবনের বিভিন্ন রকজমের কষ্ট ও অভাব বোধ থেকে বঙ্গবন্ধ বইপ্রেমী হয়ে ওঠেন। সেই ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে, এর মধ্যে কিছু সময় বাদে ১০ জানুযারি ১৯৭২ সালের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর একাকিত্ব জীবনে একমাত্র সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন বইকে। নিঃসঙ্গ জীবনে বইকে যেভাবে আকড়ে থেকে বেঁচেছিলেন সেইভাবে তিনি তাঁর পরিবারকে পাননি। সংগত কারণেই বইয়ের প্রতি তাঁর একটা নিগূঢ় মায়া ও অন্তরঙ্গ ভাব গড়ে ওঠে। কারাগারে অন্তরীণ জীবনে বইয়ের অভাব না খেয়ে থাকার চেয়েও বেশী পীড়ণ দিতো। নিঃসঙ্গতা ভুলে থাকতেন বইয়ের পাতায় চোখ রেখে। কারণ কারাগারে কারোর সঙ্গে কথার বলার সুযোগ ছিলো না

অথবা কথা বলতে দেওয়া হতো না। তাই তিনি বইকে একান্ত সঙ্গী করে সময় অতিবাঞ্চিত করতেন। বঙ্গবন্ধু রোজনামচায় ২০ জুলাই ১৯৬৬, বুধবার লিখেছেন, ''দিনভরই আমি বই নিয়ে পড়ে থাকি। কারণ সময় কাটাবার আমার আর তো কোনো উপায় নাই। কারো সাথে দু'এক মিনিট কথা বলব তা-ও সরকার বন্ধ করে দিয়েছে।''২৫ ১ মার্চ ১৯৬৭, বুধবার বঙ্গবন্ধু একই কথা আবার লিখেছেন, ''বইপড়া ছাড়া আর তো কোন উপায় নাই। খবরের কাগজ আর বই''। ২৬ বইপ্রেম থেকে গ্রন্থাগারের প্রতি ভালোবাসা জন্মানো, খুবই স্বাভাবিক। তিন বেলা খাওয়ার চেয়ে বই নিয়ে পড়ে থাকা ছিল তাঁর বেশি আনন্দ। যার সম্যক উপস্থিতি আমরা দেখতে পাই ডক্টর কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনে। এর আগে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হয়ে কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন গ্রন্থাগারের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ভলোবাসারই নিরেট বহিঃপ্রকাশ।

এই আলোকেই বাঙালীর হাজার বছরের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল্যাবান উপাদানসমূহ সুষ্ঠূভাবে সংরক্ষণের জন্য বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই ৬ নভেম্বর ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, প্রথমে ভূতের গলি, হাতিরপুলের একটি ভাড়া বাড়িতে। এরই অধীনে বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস্ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সরকারি প্রজ্ঞাপন প্রকাশ পায় ১৯৭৫ সালে। প্রায় একযুগ পরে শের-ই-বাংলানগরের আগারগাঁওতে জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস স্থানান্তরিত হয়।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বংলা গড়ার অদম্য বাসনাকে সম্মান জানিয়ে নতুন উদ্দীপনায় জনগণ আর্থ-সামাজিক তথা দেশ ও জাতি গঠনে আত্মনিবেদিত হলো এ সময়ে গ্রাম-গঞ্জরে ভাঙ্গাচুরা, জ্বালিয়ে দেওয়া অথবা লুণ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলোকে দাঁড় করানোর আয়োজন শুরু হলো। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ সালে গণগ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। উপযুক্ত সময়ে যথার্থ পদক্ষেপ গৃহীত হয় বঙ্গবন্ধুর একান্ত নির্দেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য। এতে প্রায়

২,৪০,৬৩,০০০.০০ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
২৭

বঙ্গবন্ধুর সরকার গণগ্রন্থাগারের উন্নয়নসহ বিশেষ গ্রন্থাগারগুলোকে মান সম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করা হয়। কারণ সদ্য স্বাধীন ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে দ্রুততম সময়ে গড়া ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা করার তাগাদা অনুভব করা হয়। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, শিল্প-কারখানা, যাদুঘর প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলোকে গড়ে তুলে একটি মানসম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাগাদা দেওয়া হয়। এর মধ্যে অনেক বিশেষ গ্রন্থাগারগুলো গণগ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার অপেক্ষা অধিকতর সচেষ্ট ও উন্নতমানের অধিকারী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এগুলোই মূলত দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়ে বলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন।

বঙ্গবন্ধুর এ বিশ্বাস ও ভাবনা থেওকই ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমির আপন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতি থানায় থানায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন ডক্টর কুদরত-ই-খুদার শিক্ষা কমিশনের উদ্ধৃতি দিয়ে। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডক্টর মাযহারুল ইসলাম। স্মর্তব্য যে, বঙ্গবন্ধুরবই পড়ার ক্ষুধা থেকে দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার অদম্য তাগাদা অনুভব করেছিলেন বলেই সদ্য স্বাধীন দেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসহ গণগ্রন্থাগারগুলোর পুণনির্মাণসহ নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের-বিশেষত পেশাজীবীদের, আর ভাগ্যবিড়ম্বিত এ জাতি। যে মহামানব আমাদের লালসবুজের একটি পতাকা দিলেন পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার জন্য, যে মহাপুরুষ নিজের শোবার ঘর ছেড়ে গ্রন্থাগার

প্রতিষ্ঠা করেন, যে মানুষ বই পড়ে পড়ে সোনার বংলা গড়ার স্বপ্ন দেখতেন, বইয়ের পংক্তির মতো সাজানো-গুছানো স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য ভাবতেন-কী বিশাল সমুদ্রের মতো হৃদয়ের অধিকারী মানুষ না হলে কী বলতে পারতেন-''আমিতো একাকী আছি, বই আর কাগজ আমার বন্ধু। এর মধ্যেই আমি নিজেকে ডুবাইয়া রাখি'' (কারাগারের রোজনামচা)। এই অনন্য সাধারণ মানসের অধিকারী ব্যক্তি শেখ মুজিবকে কতিপয় পথভ্রষ্ট ঘাতক তাদের অব্যর্থ গুলি বিদীর্ণ করে একসঙ্গে বাঙালীর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠতম মহামানব বঙ্গবন্ধু ও তাঁর প্রিয় বইকে। আর আমরা হারাই একজন প্রকৃত গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রেমীকে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের অন্ধকার রাত্রিতে।

৫ . পঁচাত্তরোত্তর থেকে বর্তমান পর্যন্ত

বঙ্গবন্ধুর ১৩১৩ দিনের শাসনামলে আর যাই হোক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর দেশের গ্রন্থাগারগুলোকে সুষ্ঠূভাবে দাঁড় করানোর আয়োজন শুরু হয়। স্পষ্টত লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের গণগ্রন্থাগুলোর তেমন কোন উন্নতি প্রত্যক্ষা করা না গেলেও, বিশেষ গ্রন্থাগারগুলো মোটামুটিভাবে উন্নতি লাভ করে। ২৮

এখানে উল্লেখ্য যে স্বাধীনতা-পূর্বকালে দেশের তিনটি বিভাগীয় সদর দপ্তরে সরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হলেও রাজশাহী বিভাগীয় গণগ্রন্থাগারটি স্থাপিত হয় স্বাধীনতা পরবর্তী কালে ১৯৮৩ সালে। ২৯

এভাবে বহুদিন অতিবাহিত হয়। গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ে পুরোপুরিস্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্নের বাংলাদেশটা কেবলমাত্র একটা গুটিপোকার রূপ পেয়েছিল; তিনি এটাকে প্রজাপতি হিসেবে ধেখতে

চেয়েছিলেন। সেই প্রজাপতি রঙ্গীন পাখা মেলে তাঁর সামনে উড়ে বেড়াবে; তিনি ওড়াওড়ির সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করবেন। পরিপূর্ণতা পেতে কিছুটা সময়তো চাই? ধ্বংসস্তুপ থেকে খুঁজে পাওয়া গুটিপোকাটিকে একটা পরিবেশ দিতে হবে। তাই ভাবছিলেন কীভাবে অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। গুটিপোকাটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতিরূপে রঙ্গীন পাখা মেলে আর উড়তে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বংলা আবার সুনশান শ্মশানে পরিণত হয় ঘাতকের অভিঘাতে।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালের পর পূর্বের গৃহীত সকল কার্যক্রমই অকার্যকর হয়ে যায়। অনেক কিছুর মতোই স্বাধীনতা উত্তর বাংলাবাংলাদেশে উল্লেখযোগ্যভাবে গ্রন্থাগার উন্নয়নের পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। ৩০ সামরিক শাসনের যাতাকলে উন্নয়ন ও শিক্ষাকার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। স্বাধীনতা অর্জনের ''প্রায় এক দশক পরে ১৯৮১ সালে ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বৃটিশ কাউন্সিলের যৌথ সহযোগিতায় বৃটিশ নাগরিক জে. এস পার্কার বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগারের উপর একটি জরিপ কার্য সম্পাদন করেন। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'গ্রন্থাগার উন্নয়ন' শীর্ষক একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় বৃটিশ কাউন্সিল ও ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে। সেমিনারে জে. এস পার্কার কর্তৃক সম্পাদিত জরিপ রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা হয়।"৩১ সেমিনারের পরপরই রসমিনারের উপর আলোচনা করে বক্ষমান প্রবন্ধকারের একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত তৎকালীন 'বাংলার বাণী' পত্রিকায়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৮৪ সালে বর্তমান গ্রন্থাগার অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত দেশে সরকারি পর্যায়ে কেবল ঢাকায় কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারেএবং অপর তিনটি বিভাগীয় গণগ্রন্থাগার কাজ করছিল। পরবর্তী সময়ে ১৯৮০-৮১ সালে গৃহীত বাংলাদেশে 'কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীকে কেন্দ্রবিন্দু করে দেশে একটি গণগ্রন্থাগার পরিদপ্তরের কাঠামো অনুমোদন করা হয়। ৩২ এদিকে ১৯৮২ সালে সরকার

কর্তৃক তৎকালীন ‘বাংলাদেশ পরিষদ’কে বিরুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং প্রশাসনিক পুণর্গঠন সংক্রান্ত সামরিক আইন কমিটি (এনাম কমিটি) সরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহ ও বিলুপ্ত বাংলাদেশ পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্য কেন্দ্র/গ্রন্থাগারসমূহকে নিয়ে দেশে একটি ‘গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর’ গঠনের পক্ষে সুপারিশ প্রদান করে। ৩৩ এ অধিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগারের মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগার সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৩৪ অন্যদিকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র প্রকাশিত গ্রন্থাগার নির্দেশিকা ২০১৪ অনুযায়ী ‘‘বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা ১০৬৫টি; এর মধ্যে ১১২টি গ্রন্থাগারের বয়স ৫০ বছরের অধিক’। . . . ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এখাতে মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ৩৫

এছাড়া গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গতিশীল করার পদক্ষেপ খুব একটা গৃহীত হয়নি। এর মধ্যে ১৯৭২ ও ১৯৭৬ সালে দুইটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছিল ‘বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি’ কর্তৃক ঢাকায়। সর্বোপরি গ্রন্থাগারের উন্নয়নের ধারা অত্যন্ত মন্থর গতিতে প্রবাহমান হয়। এ সময়ে নতুন কোন গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে বলে জানা যায়নি।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ উপমহাদেশে ১৯১১ সালে বরোদার W.C. Borde ‘র তত্ত্বাধানে প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯১৫ ও ১৯২৯ সালে যথাক্রমে পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে এই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় এবং আমেরিকান গ্রন্থাগারিক Asa Don Dickenso‘র তত্ত্বাবধানে লাহোরে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। ওখান থেকে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক বলে খ্যাত কোলকাতা ইম্পেরিয়াল লাইব্রেরির মরহুম

গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর আসাদুল্লাহ খানসহ বাংলাদেশের অনেক খ্যাতিমান গ্রন্থাগারিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

এর দীর্ঘ সময় পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক মরহুম ফজলে এলাহী'র প্রচেষ্টায় ১৯৫২ সালে প্রথম তিন মাসের সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তিত হয় ঢাকা শ্বিবিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কলা অনুষদের অধীনে। ৩৬ পরবর্তী সময়ে ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে ফুলব্রাইট বৃত্তি কর্মসূচীতে 'গরংং গরষষবৎবফ খ গবঃযাধহ' উক্ত সার্টিফিকেট কোর্সে শিক্ষাদান করেন। ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ প্রবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম চালু হয়। ৩৭ এটি ছিল ছয় মাসের একটি সার্টিফিকেট কোর্স। মোট চার কোর্স পর্যায়ক্রমে পরিচালিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৯-১৯৬০ ও ১৯৬২-১৯৬৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্স চালু হয়। ৩৮ ফুলব্রাইট বৃত্তি ভিত্তিক তিন মাসের সার্টিফিকেট কোর্স বন্ধ হয়ে গেলে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতির উদ্যোগে ১৯৫৮ সালে ৬ মাস মেয়াদী একটি সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তন করে। একই সময়ে ইউনিভির্সিটি অব লন্ডন'র আদলে ১৯৫৯-১৯৬০ শিক্ষাবর্ষে ১ বছর মেয়াদী স্নতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স উত্তীর্ণরা এক বছর মেয়াদী মাস্টার্স অব আর্টস কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ে ১৯৬২ সালে। ১৯৬২-১৯৬৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাস্টার্স অব আর্টস কোর্স অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে শুরু হয়। ১৯৬৪-১৯৬৫ শিক্ষা বর্ষটি বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার দিগন্ত উন্মোচিত হয় উন্নয়নের মডেল হিসেবে। এই শিক্ষা বর্ষ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কোর্সটি স্বীকৃতি লাভ করে এবং 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ' হিসেবে কলা অনুষদের অধীনে পূর্ণাঙ্গ বিভাগ রূপে সংগঠিত হয়। ৩৯

১৯৭৪-৭৫ সালে দুই মেয়াদী 'মাস্টার্স অব ফিলোসফি' (এমফিল) প্রোগ্রামকে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় সিন্ডিকেট অনুমোদন দেয় ৪০ এবং ১৯৭৫-১৯৭৬ শিক্ষা বর্ষ থেকে কোর্স চালু হয়। ৪১ উক্ত শিক্ষাবর্ষের শেষে 'মাস্টার্স অব আর্টস' শীর্ষক আরেকটি দুই বছর মেয়াদী কোর্সের অনুমোদন দেওয়া হয়; যার প্রথম বছর প্রিলিমিনারী এবং দ্বিতীয় বর্ষ 'মাস্টার্স অব আর্টসফাইনাল হিসেবে পরিগণিত হবে। ৪২ একই সময়ে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সটিও চলতে থাকলো সমান্তরালভাবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 'ডক্টর অব ফিলোসফি' (পিএইচডি) প্রোগ্রামটিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অনুমোদন দেয় ১৯১৭৮-৭৯ শিক্ষা বর্ষ থেকে। ৪৩ এবং সে বছর থেকেই কার্যক্রম চালু হয়। এর ফলে বিভাগের কার্য পরিধি অনেক বৃদ্ধি পায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাগ হিসেবে।

এই সময়ে ওপশাজীবী সংগঠন বেলিড বিভাগের নাম পরিবর্তন ও অনার্স কোর্স প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে দেন-দরবার ও আবেদন-নিবেদন করেছে। পরবর্তীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আমলে নিয়ে অনার্স কোর্স প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৮৭-১৯৮৮ শিক্ষা বর্ষ থেকে তিন বছর মেয়াদী গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে ব্যাচেলর অব আর্টস (বিএ অনার্স) ডিগ্রী হিসেবে অনুমোদন প্রাপ্ত হয়। ৪৪ একই সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির যুগের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিভাগের নাম পরিবর্তন করে ''গ্রন্থাগার ওতথ্যবিজ্ঞান বিভাগ'' রূপে নামকরণ করা হয়। অনার্স কোর্স প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সটি বিলুপ্ত করা হয় এবং বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতিকে অনুরোধ করে কোর্সটি তাদের দায়িত্বে পরিচালনা করার জন্য। ৪৫ ১৯৮৯ সালে কোর্সটি চালু করলেও অজ্ঞাত কারণে সমিতি কোর্সটি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়। যা পরবর্তীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে একটি ইনস্টিটিউট স্থাপনের মাধ্যমে, যদিও বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতিই উক্ত ইনস্টিটিউটির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে একমাত্র অধিকারী।

১৯৯১-৯২ শিক্ষা বর্ষ থেকে চলমান ডিগ্রী (পাশ) ও স্নাতক (অনার্স) পর্যায়ে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজসমূহে। [৪৬] ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষা বর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুই বছরের স্নাতকোত্তর (এমএ) কোর্স চালু করে। [৪৭] এছাড়াও ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষা বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়কে পাশ্চাত্যের শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তিন বছরের স্নাতক শিক্ষা কার্যক্রমকে পরিবর্তন করে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় চার বছর মেয়াদী স্নাতক (অনার্স) প্রবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে [৪৮] এবং ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষা বর্ষ থেকে তিন বছর মেয়াদী স্নাতক (অনার্স) কোর্সের পরিবর্তে চার বছর মেয়াদী স্নাতক (অনার্স) কে পেশাগত ডিগ্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয়, ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যকর করা হয়। [৪৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০০১-২০০২ শিক্ষাবর্ষে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের নাম পরিবর্তন করে তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ নামকরণ করে বিষয়টিকে আন্তর্জাতিকায়নের একটি প্রশংসামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। [৫০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করে ১৯৯১-১৯৯২ শিক্ষাবর্ষ থেকে। [৫১] গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ ঘোষণা করে তিন বছর মেয়াদী গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে সমাজবিজ্ঞান অনার্স কোর্স প্রবর্তন করে ১৯৯২-১৯৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে। অতঃপর এই বিভাগ থেকে এক বছর মেয়াদী সমাজবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন করা হয় [৫২] এবং ১৯৯৭-১৯৯৮ শিক্ষাবর্ষ তিন বছর মেয়াদের পরিবর্তে চার বছর মেয়াদী স্নাতকোত্তর অনার্স কোর্স চালু করা হয় গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগে।

১৯৯২ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানী তথা বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতির দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (পাশ) কোর্সে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ৪০০ নম্বরের অপশনাল বিষয় নেয়ার সুযোগ প্রবর্তন করা হয়। তাছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত তিনটি কলেজে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করার সুযোগ রয়েছে।

গ্রন্থাগার সমিতি

বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গতিশীল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ খুব একটা গৃহীত না হলেও দেশের গ্রন্থাগার পেশা ও পেশাজীবীদের দাবী-দাওয়া পূরণ ও উন্নয়নের জন্য কয়েকটি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির (LAB) নাম উল্লেখযোগ্য। দেশের গ্রন্থাগার পেশা ও পেশাজীবীদের উন্নয়নের প্রয়োজনে বারগেইনিং প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ জন্য বরেণ্য কতিপয় ব্যক্তিত্ব ১৯৫৬ সালে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মোট ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যকরি পরিষদ সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি ও ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে মরহুম মুহম্মদ সিদ্দিক খান, মরহুম রাকিব হোসেন ও মরহুম আবদুর রহমান মৃধা । এছাড়াও আরো ১০ জন উক্ত কার্যকরি পরিষদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে আরো অনেকগুলো কার্যকরি পরিষদ গঠিত হয় এবং পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু বাহ্যত তেমন কোন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। পেশাগত ক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত একটি শূন্যতা ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা বিরাজ করছিল।

ঢাকা শ্বিবিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্য প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক জনাব আবদুল মান্নান'র নেতৃত্বে ড. মুহম্মদ আবদুসসাত্তার'র সহযোগিতায় সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রয়াস সাফল্য লাভ করে। তারই ফলশ্রুতিতে ২০০৪ সালে সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগ করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির প্রথম কার্যকরি পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুসসাত্তার ও সৈয়দ আলী আকবর যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়। উক্ত পরিষদ ২০০৮ সাল পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে পেশাগত ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন সাধন করে। সমিতি 'ইস্টার্ণ লাইব্রেরিয়ান' শীর্ষক একটি সাময়িকী ও ১৯৯০ সাল থেকে ড. মোঃ আবদুসসাত্তা'র সম্পাদনায় 'উপাত্ত' শিরোনামে একটি নিউজলেটার অনিয়মিতভাবে প্রকাশ পায়। এছাড়া ৬মাস মেয়াদী একটি সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনা করছে। ১৯৯৮-২০০০ সালে নির্বাচিত কার্যকরি পরিষদের সময়কালে প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুসসাত্তার'র সভাপতিত্বে ও সম্পাদনায় ল্যাব সদস্যদের একটি ডাইরেক্টরি প্রকাশিত হয়। ৫৩

বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় এমন একটা অচল অবস্থা সৃষ্টি হয়, যখন পেশাগত ও পেশাজীবীদের মানোন্নয়নের কোন প্রয়াসই পরিলক্ষিত হয়নি। পেশাজীবীদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছিল, তখনই একদল নবীন ও অপেক্ষাকৃত তরুন প্রজন্মের পেশাজীবী স্বতঃস্ফুর্তভাবে সংগঠিত হয়। এক ঊষালগ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ইনস্টিটিউটের উন্মুক্ত সবুজ প্রাঙ্গণে ২৩ জানুয়ারি ১৯৮৬ সালে 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইয়ং লাইব্রেরিয়ানস্ ইনফরমেশন সাইন্টিস্টস্ এন্ড ডকুমেন্টালিস্টস্' (BAYLID) শিরোনামে একটি নিরঙ্কুশ পেশাজীবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৫৪ ১১ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে শফিক মাহমুদ মান্নান দায়িত্ব পালন করেন (২৩.০১.১৯৮৬-২৫.৪.১৯৮৬)। তিন মাস পর ২৬.০৪.১৯৮৬ সালে ১৮ সদস্য বিশিষ্ট প্রথম কার্যকরী পরিষদ গঠন করা হয়; পরিষদের প্রথম চেয়াম্যান ও সেক্রেটারি

জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে মুহম্মদ আবদুসসাত্তার ও মোঃ হারুন-অর-রশীদ। প্রথম গঠিত শিরোনামের 'ইয়ং' শব্দটি পরিবর্তন করে বেলিড'র বর্তমান শিরোনাম নির্ধারণ করে সমাজ কল্যাণ বিভাগের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়। বর্তমানে এর বাংলা শিরোনাম হচ্ছে 'বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি' ও ইংরেজি শিরোনাম হচ্ছে 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব লাইব্রেরিয়ানস্ ইনফরমেশন সাইন্টিস্টস্ এন্ড ডকুমেন্টালিস্টস্' (BALID)। এখন পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আস্থার সঙ্গে গ্রন্থাগার পেশার বহুবিধ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পাদন করে চলেছে। বেলিড 'ইনফরমেটিকস্' শিরোনামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। এর একটি ইনস্টিটিউট রয়েছে; ইনস্টিটিউটের প্রথম পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব শামসুদ্দিন আহমেদ।

এছাড়াও আরো কিছু বিশেষায়িত পেশাজীবী সংগঠন স্ব স্ব অবস্থান থেকে পেশার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি

সাম্প্রতিক বিশ্বে তথ্য অপরিহার্য সম্পদ হিসেবে গণ্য। আমরাও নিঃসন্দেহে তথ্যের মধ্যে বসবাস করছি। এখন অর্থকরী সম্পদ অপেক্ষা তথ্য সমৃদ্ধ জাতিই সম্পদশালী জাতি হিসেবে স্বীকৃত। যার যত তথ্য সেই তত সম্পদশালী। জাতীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে তথ্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। মাত্র তিন দশক আগেও পরিস্থিতি ছিলো ভিন্ন। তথ্য বিস্ফোরণের প্রকৃতি ও বৈচিত্র্যময় তথ্য-ব্যবহারকারীদের রীতিমতো দুর্ভাবনার কারণ ছিলো। কিন্তু সেই উৎকণ্ঠা এখন আর নেই। তথ্য-সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও বিতরণের ক্ষেত্রে নতুন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার তথ্য বিস্ফেরণের ভযাবহতায় রূপান্তরিত হয়েছে 'তথ্য বিপ্লবে'। বস্তুত, তথ্য বিপ-বের ফলেই

পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বিশ্ব এখন পরিণত হয়েছে অখন্ড বিশ্বপল্লীতে। তথ্য প্রবাহের প্রক্রিয়ায় বিশ্ব এখন নিরবচ্ছিন্ন তথ্যগ্রাম হিসেবে স্বীকৃত। তথ্য সেবায় ব্যবহৃত কারিগরি জ্ঞান ও কলাকৌশল এখন তাই নতুন অভিধায় 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' হিসেবেই চিহ্নিত। ৫৫

'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই মানুষের মধ্যে বৈমশ্বক অনুভূতি দেশকাল-উর্দ্ধে সংহতিবোধ প্রসারিত ও জাগ্রত হয়েছে। দূরের সবকিছুকে অতি কাছের মনে হয়। প্রত্যহিক জীবন-যাপন ব্যবস্থা, শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও যোগাযোগের ক্ষেত্রেও সাধিত হয়েছে গুণগত পরিবর্তন। মাত্র নব্বিইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে এ বোধে অনুপ্রাণিত হয়ে তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট এলগোর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবৎ শিশুদেরে বিশ্বপল্লীর নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। ৫৬ এই উপলব্ধি একটু দেরিতে হলেও আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়েছে। জাতীয় উন্নয়নে সমৃদ্ধতথ্য ব্যবস্থা এবং অবাধ তথ্যপ্রবাহের অনবিচ্ছিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করতে আর বিলম্ব করা ঠিক হবে না । এ ভিত্তিভূমি থেকেই কেবল দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব। ১৩১৩ দিনের শাসনকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও স্বপ্ন দেখেছিলেন সোনা বংলা গড়বেন দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে। সেই স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরী আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

'তথ্য প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাঙ্খিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে অফিস-আদালত বিশেষত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোতে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি'ব্যবহার করে তথ্য অনুসন্ধানের সুযোগ সৃষ্টি ও দ্রুত তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের মাধ্যমে আধুনিক তথ্য ববস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। অনলাইন নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি তথ্য ব্যবস্থাপনায় কমপিউটার ভিত্তিক অনলাইন ও অফলাইন প্রযুক্তি এ-ক্ষেত্রে

যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। অনলাইন নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি তথ্য বিস্ফোরণের ব্যাপক পরিমন্ডলকে ছোট করে নিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক অনলাইন তথ্যভান্ডারে প্রবেশের সুযোগ সৃণষ্টর মাধ্যমে তথ্যের মহাসড়কে বিচরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আওয়ামীলীগ সরকারের আমলেই বাংলাদেশ যুক্ত হয় তথ্যের মহাসড়কে তথ্য ইন্টারনেটের সঙ্গে। তখন থেকেই ডিজিটাল রেফারেন্স থেকে পূর্ণ ডিজিটাল টেক্সটে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র দ্রুত এই সুযোগ নেয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং খুব অল্প সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ডিজিটাল পূর্ণ ডিজিটাল টেক্সটে প্রবেশাধিকারপ্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর আগে ঠিক ৮০'র দশকে ''তথ্যায়ন' একটি নতুন ধারণা"[৫৭] নিয়ে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবায় একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়। বিশেষত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশীয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে 'তথ্যায়ন' সেবার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহীতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। সংস্থাগুলো তথ্যায়ন সেবা দানের আওতায় বিবি-উগ্রাফিক্যাল সেবা যেমনুকারেন্ট অ্যাওয়ারনেস, কটেন্ট এনালাইসিস, এসডিআই, ডকুমেন্ট রিভিউ, ডকুমেন্ট রিপ্রোডাকশনসহ নানারকম তথ্যায়ন সেবায় নতুনত্ব আনয়ন করে।

উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধানকে সহজ থেকে সহজতর করে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কল্যাণ সাধন করা। গণমানুষের প্রকৃত উন্নয়ন ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির কোন ফলাফলই আশাব্যঞ্জক হয়না।[৫৮] . . . অনুভূতি ও মননের অভিব্যক্তি এবং আশা-আকাঙ্খা ও প্রয়োজনকে উপলব্ধির জন্য এবং জাতীয় আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য দরকার গণমানুষের উন্নতি সাধন। গণমানুষ তারাই যাদের বাস গ্রামীণ জনপদে। এদের বোধ বা সত্ত্বাকে উপলব্ধির প্রয়োজনে তাদের

হাতে তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাই চেয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন করে সোনার মানুষদের দিয়ে সোনার বাংলা গড়ার জন্য।

আধুনিক উন্নয়ন ভাবনায় 'উন্নয়নের জন্য তথ্য' একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। উন্নয়ন ও তথ্য একটি অপরটির পরিপূরক। এই ভারনা থেকে উৎসারিত গ্রামীণ তথ্যব্যবস্থার গোড়া পত্তন হয় ২০১০ সালে। আওয়ামীলীগ দ্বিতীয়বার সরকার রপরিচালনার সময়ে দেশজুড়ে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে তথ্যব্যবস্থাপনায় এক যুগান্তকারী মোড় প্রবর্তন করে। তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির সুফলকে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং ২০২১ সালের মধ্যে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে ২০১০'র ১১ নভেম্বর সারা দেশে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবাকেন্দ্র তথা ইউআিএসসি স্থাপনের উদ্দ্যোগ নেয়া হয়। এ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৪৫৪৭টি ইউআইএসসি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৫৯ অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন কর্মসূচী কর্তৃক প্রকাশিত ইউআিএসসি নিউজলেটার থেকে জানা যায় প্রায় ৩২ লাখ মানুষ প্রতি মাসে ইউআইএসসি'র সেবা গ্রহণ করে। এদের মধ্যে ৭৮ হাজার মানুষ (যার ৭০% নারী)। ইউআইএসসি থেকে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা, ৩০,২০০ মানুষ জীবন বীমা সেবা, ৩৫০০০ মানুষ (যার ৭০% নারী) টেলিমেডিসিন সেবা এবং ৪৫০০০ মানুষ কমপিউটার প্রশিক্ষণ সেবা গ্রহণ করেন। ৬০

এভাবে সেবা দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা চলমান থাকলে গণমানুষের উন্নয়নসাধনের প্রচেষ্টায় জাতীয়তাবোধ, ঐক্য ও ঐতিহ্যের প্রসার ঘটবে। একইভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, জীবন ও জীবিকাগত সাংস্কৃতিক ফলাফলকে সর্বজনীন করা সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণের উদ্দেশ্যে এ দেশের গণমানুষের সাধারণ শিক্ষা ও শিক্ষার উন্নয়ন এবং চেতনার বিকাশ সাধনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে গণগ্রন্থাগার সার্ভিসেরি একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। এই সার্ভিস থেকে জীবন ও জীবিকাভিত্তিক সুষম

তথ্য সহজপ্রাপ্য করা সহজ হবে। যেহেতু ''উন্নয়নের প্রধান শর্ত গণশিক্ষা। লাইব্রেরি গণশিক্ষার অন্যতম মাধ্যম। সুতরাং দেশময় প্রসারিত ও সমন্বিত একটি গণগ্রন্থাগারপদ্ধতি স্থাপন অপরিহার্য।''৬১ তা হলেই গণশিক্ষার প্রসার ঘটবে। এ জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার ও তথ্যনীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বিশ্বের স্বচ্ছল ও সমৃদ্ধ দেশগুলোতে সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে নীতি অনুসৃ হয়ে থাকে, তা হচ্ছে সহযোগিতার নীতি। স্বচ্ছল দেশের জন্য যা প্রয়োজন, অস্বচ্ছল দেশের জন্য তা অপরিহার্য। প্রতিটি সম্ভাব্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সংগ্রহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সংগ্রহের নীতিঅনুসরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ফার্মিটন প্ল্যান' গ্রন্থাগার জগতে সুবিদিত। . . . সেই প্রস্তাব অনুযায়ী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা আজকে আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অপরিহার্য। ৬২ এর মধ্যে নব্বইয়ের দশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে দু'জন গবেষক ৬৩ উচ্চতর গবেষণায় সমন্বিত গ্রন্থাগার ও তথ্যব্যবস্থার উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির যুৎসই ব্যবহার 'ক্রেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার' স্থাপন ও তথ্য ভাগাভাগি করে দেশের জনগোষ্ঠীর তথ্যের চাহিদা পূরণের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ সুপারিশমালা আজকের প্রেক্ষাপটে বিবেচনার দাবী রাখে। অন্যদিকে নেটওয়ার্কিং-এর মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহের সুযোগ সৃষ্টি করে একে অপরের তথ্য সম্পদকে স্যায়ারিং-এর মাধ্যমে তথ্যসম্পদ পূর্ণ জাতি হিসেবে গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু সঠিক সময়ে জাতীয়ভাবে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসোর্স স্যায়ারিং-এর বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচেনায় না নেয়ার ফলেই এখন পর্যন্ত 'কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার' গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রীয় তথ্যভান্ডার ও তথ্যায়ন ব্যবস্থা। যার আওতায় সরকারের উৎপাদিত তথ্য-উপত্তসহ দেশের সকল পেশার সংশ্লিষ্ট তথ্য ও দলিলপত্র সংরক্ষিত থাকবে। নতুন প্রযুক্তির অংশ হিসেবে ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিষয়ভিত্তিক শ্রেণিবিন্যাস, যুৎসই সংরক্ষণের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক

সময়ে সঠিক তথ্য যথার্থভাবে সহজলভ্য করার সুযোগ সৃষ্টি করা সময়োচিৎ সিদ্ধান্ত হতে পারে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে পারলেই 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ে তোলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত হবে।

সুপারিশ

১. দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন ব্যবস্থা সুসংহতকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ফার্মিংটন প্ল্যানের আদলে পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য।

২. ইউনেস্কো'র এসডিজি-২০৩০ বিশেষত শিক্ষা এজেন্ড-৪ বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু নির্দেশিত ডক্টর কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আদলে গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন সেবা সর্বস্তরে সহজলভ্য করা।

৩. প্রতি থানায় একটি করে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব পোষণ করতেন।

৪. গ্রন্থাগার ও তথ্যনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এখন যুগের দাবী।

৫. গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবা সংক্রান্ত ধারণার পরিবর্তন এবং উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য সুসংহত পরিকল্পনা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া।

৬. তথ্যসবা ব্যাহত না হয়-পর্যাপ্ত অর্থ সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭. পেশাজীবীদের সময়োপযোগীকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৮. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা পাঠ্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রন্ত ব্যবহারিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা।

৯. গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন ব্যবস্থায় ভৌত অবকাঠামো বিনির্মাণসহ প্রযক্তিগত সুযোগ বৃদ্ধি করা।

১০. গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট সংযোজনের মাধ্যমে অবাধ ও রিবচ্ছিন্ন অনলাইন তথ্যব্যবস্থার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১১. তৃণমূল পর্যায়ে সময়োচিৎ তথ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য একটি 'কেন্দ্রীয় তথ্য হাব' বিনির্মাণ করা এখন সময়ের দাবী। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ পেশাজীবী সমন্বয়ে জাতীয় নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

১২. গণগ্রন্থাগারের পরিসেবা কার্যক্রমকে গণমুখীন করার জন্য গণগ্রন্থাগারের আইন প্রবর্তন করা জরুরী।

১৩. বিদ্যমান গণগ্রন্থাগারগুলোকে শীঘ্রই শিশুদের মননশীল, বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশক প্রযক্তিভিত্তিক জ্ঞানচর্চার বিদ্যাপিঠ হিসেবে গড়ে তোলা দরকার।

১৪. রিবচ্ছিন্ন বিদ্যুত প্রবাহ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ডিজিটাল গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন সেবা প্রবর্তন এখন সময়ের দাবী।

১৫. চলমান গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন সেবা সংস্থাগুলোতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ পেশাজীবী সমন্বয়ে প্রশাসনিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অভিষ্ট লক্ষ্য সফল করা যেতে পারে।

উপসংহার

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার সংগঠনের ইতিহাস নেহায়েতই অকিঞ্চিৎকর নয়। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এদিক থেকে অনেক বেশি ঐতিহ্যের অধিকারী। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে ঔপনিবেশিক শাসক-শোষক ও জাতিগত বৈষম্যের জাতাকলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বার বার হোঁচট খেয়েছে। হিংস্র

নখের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। সহস্র বছর ধরে। পাল, মোঘল, পর্তুগিজ, ফরাসি, ইংরেজ ও সবশেষে পাকিস্তানিদের নিষ্পেষণ ও শোষণ থেকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা মুক্তির স্বাদ পায়। বঙ্গবন্ধু জীবনের পাওয়া সময়টুকুর মধ্যে যে সময়টুকু জেগে থাকতেন তার পুরোটাই ছিল বাংলা, বাঙালী আর বই, বই, বই আর গ্রন্থাগার ভাবনার জন্য। পরাধীন সময়ের একশ বছর পর যখন সময় পেলেন, ১৯৫৮ সালে গণগ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন; স্থাপন করলেন এক গৌরবময় ইতিহাস। কোন বাঙালী ইতোপূর্বে গ্রন্থাগার উদ্বোধন করেন, নজীর নেই। তিনি বাংলার সেই অবিসংবাদিত নেতা শত শত বছর পর শীর্ণ বৃক্ষতলে একটি চারা রোপণ করেছিলেন এক অতৃপ্ত আত্মার আকুতিতে যা মহীরূহ হয়ে আমাদের হৃদয়ে দোল খাচ্ছে। তিনি একজন বই, শুধু বই ও গ্রন্থাগার প্রেমী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তিনি জীবনে এতো সময় ধরে বই পড়েছেন; নিজের পরিবারকেও এতো সময় দিতে পারেননি। তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্য ছিলো একটি সোনার বাংলা গড়ার। একটি শিক্ষিত, মেধাবী, মননশীল, জ্ঞানী সৃষ্টিশীল এবং জ্ঞানদীপ্ত জাতি উপহার দেওয়া প্রত্যয়ী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। এখানেই আমরা আশীর্বাদপুষ্ট হয়েছিলাম বাঙালী জাতি হিসেবে। আমরা অভাগা জাতি ! অভিশপ্ত সময়ের একুশ বছর ধরে জাতির ভাগ্য বিরম্বিত হয় দুঃশাসনের অন্ধকারে।

টালিগঞ্জের 'অজানা বাতাস' শীর্ষক একটি চলচ্চিত্রে ভ্রাতুষ্পুত্রীর দীপা'র এক প্রশ্নের উত্তরে মেঝো কাকামণি বলেন-''গাছেরা কথা বলে না, জমিয়ে রাখে'। ঠিক গাছেরা কি কথা বলে? শুধু জমিয়ে রাখে কোন প্রজন্মের জন্য। আরো এখন অনেক কিছু সৃষ্টি আছে যা সভ্যতা, ইতিহাস, সংস্কৃতি, কথা, জ্ঞানকে জমিয়ে রাখে প্রজন্মকে আলোকতি করার জন্য। উত্তর প্রজন্মের প্রশ্নের অনুসন্ধিৎসুর জবাব মেলে ধরার জন্য। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি গাছ, পাথর ছাড়াও সেরা সৃষ্টি মানুষ; মানুষের চিন্তা-চেতনা, মনন চর্চা ও মেধার উৎসারিত জ্ঞানোসৃত অমর সৃষ্টিকে উত্তর প্রজন্মের কাছে পৌঁছানো-জিজ্ঞাসার পথ খোঁজার

জন্য মানুষই সৃষ্টি করে কোন এক বৃক্ষসমতলে একটি গ্রন্থাগার। 'অতীতের সকল মানুষের কথা গাছের কাছে রক্ষিত আছে'; মেয়েটি শুনে বলে-'তাহলে আমিও শুনবো।

সেই গাছ কি আমরা রোপণ করতে পেরেছি? যে গাছের তলায় বসে আমরা অতীত হওয়া মানুষের কথা শুনবো। সৃষ্টি-সভ্যতার অমরত্বের ধারক হিসেবে গ্রন্থাগার সৃষ্টির সকল উৎকর্ষের অন্যতম প্রধান উপাদান। না পারলেও, এখনই সময় বৃক্ষ রোপণের আগ্রহের মতো মানুষকে উৎসাহিত করতে হবে গ্রন্থাগার সৃষ্টির মানসিকতা লালনের জন্য। বঙ্গবন্ধু সেই মানসিকতার বীজ-চারা রোপণ করে গিয়েছিলেন ১৯৫৮ সালে, ১৯৭১ সালে, ১৯৭২ সালে, ১৯৭৪ সালে সব শেষে নিজের ঘরে জীবনের বিদীর্ণ পরতে; যেনো রোপিত চাড়ায় গুটিপোকা রূপ নেয়, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালীর মহামানবতাই প্রজাপতিরূপে দেখতে চেয়েছিলেন। পরিপূর্ণতা পেতে কিছুটা সময়তো চাই? ধ্বংসস্তুপ থেকে খুঁজে পাওয়া গুটিপোকার বীজটিকে আসুন লালন-পালন করি। একটা পরিবেশ রচনা করে গুটিপোকাটিকে একটি প্রজাপতির রূপ দেই না কেন? জাতি রঙ্গীন প্রজাপতির রূপ-লাবণ্য উপভোগ করতে পারবে। আবার আমরা আশীর্বাদপুষ্ট হই। অভিশাপের গ্লানিমুক্ত হই।

তথ্য নির্দেশিকা

১. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (১৩৯০ বাং)। 'বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাস।' কলিকাতা। কাফেলা; বাংলাদেশ সংখ্যা-১৩৯০ বাং আশ্বিন, ৩(৬), পৃঃ ৯৮।

২. Mishra, J (1979). History of libraries and librarianship in India since 1950. Delhi: Anna Ram.

৩. বাগল, যোগেস চন্দ্র (১৯৭১)। বঙ্গ সংস্কৃতির কথা। কলিকাতা। পৃঃ ২।

৪. পূর্বোক্ত।

৫. পূর্বোক্ত। পৃঃ৫।

৬. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৯৯।

৭. All India Conference of Librarians. Lahore: January 4-8, 1918. A proceedings. Simla, Govt Monotype Press, 1918, p.3-4. Quoted from Anowar, M.A. `Problems of public library development in Pakistan'. In: The Eastern Librarian, 5(1), Dhaka: September, 1970. p.8.

৮. Ahmed Hossain. `The need for public library legislation.' In: The need for public library development, ed. by M.S. Khan and T.J. Moughan. Dhaka, 1966. p.63.

৯. বসু, প্রমীল চন্দ্র (১৩৮২)। 'বিংশ শতকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার আন্দোলনে বাঙ্গালী।' গ্রন্থাগার, ২৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। কলিকাতা। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। পৃঃ ৩১।

১০. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ । প্রাগুক্ত। পৃঃ ৯৯।

১১. বসু, প্রমীল চন্দ্র। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩৩।

১২. পূর্বোক্ত।

১৩. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ । প্রাগুক্ত। পৃঃ ৯৯।

১৪. পূর্বোক্ত।

১৫. পূর্বোক্ত। পৃঃ১০০।

১৬. Khan, M. Siddiq (1967). `Libraries in Pakistan' in Journal of Library History, vol-II, p.60.

১৭. Moid, M (1958). `Library service in Pakistan' in Pakistan Library Review, vol-I, p.9.

১৮. Dhaka University. Annual Report, 1959-60. Dhaka University, 1960. p. 38.

১৯. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১০১।

২০. সারোয়ার হোসেন (১৩৯৬ বাং)। 'বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা'। গ্রন্থাগার, ৩৯(৬), পৃঃ ১৩৬।

২১. মান্নান, এস. এম. ও আবদুস সাত্তার, ম. (১৯৯৪)। 'বাংলাদেশের গণগ্রন্থাগার: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৯৫৪-১৯৯২), নিবন্ধমালা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র। অষ্টম খন্ড, জুন, পৃঃ ১৫৫।

২২. চৌধুরী, মোহাম্মদ হোচ্ছাম হায়দার ও জিল্লুর রহমান, মোঃ (২০০৯)। 'বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের বিকাশ', সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা। তথ্যাবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃঃ ৩৫।

২৩. পূর্বোক্ত।

২৪. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১০০।

২৪. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪)। গ্রন্থাগার: সারাংশ। ঢাকা: শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পৃঃ ২৪৫-৭।

২৬. শেখ মুজিবুর রহমান। কারাগারের রোজনামচা। ঢাকা: পৃঃ ১৭২।

২৭. পূর্বোক্ত। পৃঃ ২০৮।

২৮. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১০১।

২৯. মাননান, এস. এম. ও আবদুস সাত্তার, ম. (১৯৯৪)। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৫৫।

৩০. পূর্বোক্ত।

৩১. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ । প্রাগুক্ত। পৃঃ ১০১-২।

৩২. পূর্বোক্ত। পৃঃ ১০২।

৩৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। গণর্গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নথিপত্র থেকে সংকলিত।

৩৪. পূর্বোক্ত।

৩৫. খালিদ, কে. এম (২০২০)। স্মরণিকা; জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস ২০২০। ঢাকা: গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর। পৃঃ ১১।

৩৬. কাজী আবদুল মাজেদ (২০১৬)। 'জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ গঠনে বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের ভূমিকা।' ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। বই ;৪৫(১১): পৃঃ৪৭।

৩৭. Khorasani, SSMA (1986).Gensis of library education in Bangladesh.The Eastern Librarian; 12 (1):55-60

৩৮. সারোয়ার হোসেন (১৩৯৬ বাং) 'বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা'। কোলকাতা: বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ। গ্রন্থাগার; ৩৯(৬): পৃঃ ১৩৬।

৩৯. Dhaka University (1960). Annual Report,1959-60; p.38

৪০. Dhaka University (1965). Annual Report,1964-65.

৪১. Dhaka University (1974). Syndicate Minutes, dated 23 February 1974 (Unpublished).

৪২. Dhaka University (1976). Annual Report,1975-76.

৪৩. Dhaka University (1977). Syndicate Minutes, 1977 (Unpublished).

৪৪. Dhaka University (1978). Syndicate Minutes, dated 6 May 1978 (Unpublished).

৪৫. Dhaka University (1988). Annual Report,1987-88.

৪৬. Khan, M. Shamsul Islam (1992). Preparing Bangladesh libraries and librarians for the 21st century: the case of library education. The Eastern Librarian, 17(1-2):49-58.

৪৭. Dhaka University (1990). Syndicate Minutes, dated 29 December 1990 (Unpublished).

৪৮. Dhaka University (1995). Annual Report,1994-95.

৪৯. Dhaka University (2000). Annual Report,1999-2000.

৫০. Dhaka University (2001). Syndicate Minutes, dated 6 December 2001 (Unpublished).

৫১. Rajshahi University (1992). Annual Report: 1991-1992.

৫২. Rajshahi University (1993). Annual Report: 1992-1993.

৫৩. Rajshahi University (1996). Annual Report: 1995-1996.

৫৪. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (২০০৫)। গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ। স্মরণিকা: ৮ম সাধারণ সভা ও জাতীয় সেমিনার ২০০৫। ঢাকা: বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, পৃঃ ২৯।

৫৫. বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতি (বেলিড) কর্তক প্রকাশিত 'প্রচার পুস্তিকা', ১৯৯১ থেকে উদ্ধৃত, পৃঃ ২।

৫৬. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (২০০৫)। প্রাগুক্ত। পৃঃ ৩০।

৫৭. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (১৯৮১)। তথ্যায়ন: একটি নতুন ধারণা। মাসিক বই; ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

৫৮. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (১৯৮৯)। বাং লাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং গ্রন্থাগার সেবাক্রমের রূপরেখা'। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা; ৩৪(জুন); ১৪০।

৫৯. মান্নান, এস.এম ও কাজী মোস্তাক গাউসুল হক (২০১৪)। গ্রামীণ গ্রন্থাগার ও তথ্য নেটওয়ার্ক: একটি প্রস্তাবনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা; ৩৪(জুন): ৮৪।

৬০. Access to Information (2014). Union Information and Service Centre: connecting the bottom millions. Dhaka: Access to Information (January 2014).

৬১. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (১৯৮২)। 'গ্রন্থাগার উন্নয়ন শীর্ষক জাতীয় সেমিনার'; বাংলার বাণী: ১ মার্চ।

৬২. আবদুস সাত্তার, মুহম্মদ (১৯৮৯)। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৪৫।

৬৩. দু'জন গবেষক হলেন-প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুস সাত্তার ও প্রফেসর ড. এস. এম. মাননান যথাক্রমে তাদের গবেষণার বিষয়বস্তু: ''দ্যা প্রোবলেমস এন্ড প্রোসপেক্টস অব নিউ টেকনোলজিস্ ইন লাইব্রেরিজ এন্ড ইনফরমেশন

সার্ভিসেস ইন বাংলাদেশ" এবং রিসোর্স স্যায়ারিং এন্ড নেটওয়ার্কিং এমং দ্যা লাইব্রেরিজ অব বাংলাদেশঃ প্রোবলেমস এন্ড প্রোসপেক্ট'।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ভাবনা

আলাউদ্দিন মল্লিক

গ্রন্থাগার

বৈজ্ঞানিক মতে, বর্তমান মানবজাতির ক্রমবিকাশের বয়স প্রায় ১০,০০০ বছর। সর্বপ্রথম ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে গ্রন্থাগারের উৎপত্তি হয় মিশরের সুমেরীয় অঞ্চলে ও এশিয়া মাইনরে। সম্রাট আসুরবনিপাল কর্তৃক ৬২৫ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে বিশ্বের সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় মিশরের নিনেভে'তে। খ্রিস্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি জাতীয় গ্রন্থাগার। সে হিসেবে বিশ্বে গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার বয়স আড়াই হাজার বছরের।

গ্রন্থাগারর সঙ্গে মানবজাতির সভ্যতা বিকাশের নিগূঢ় ও অন্তর্নিহিত বিষয় জড়িত। সভ্যতার বিকাশই হয়তো ঘটত না, যদি না প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে গ্রন্থাগার সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করত। স্বীকার করতেই হবে সভ্যতার বিকাশকে ত্বরান্বিত ও যুগ যুগান্তরে বিকশিত করেছে গ্রন্থাগার। বলাই বাহুল্য যে, বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরার জন্য এই উপমহাদেশের সভ্যতা বিকাশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা অপরিহার্য।

প্রায় ৪,০০০ থেকে ৫,০০০ বছরের প্রাচীন ইতিহাসের ক্রমধারায় বর্ণিত গ্রন্থাগারের বিকাশ নেহায়েৎ অকিঞ্চিৎকর নয়। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগারের ইতিহাস অতি প্রাচীনকালের। গোড়া থেকেই অসংখ্য মন্দির, মসজিদ, গির্জা ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়ে ও শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তিদের সংগ্রহে বিভিন্ন ধরন ও আকারের পুঁথি কিংবা গ্রন্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের সূচনা প্রায় ২,০০০ বছর পূর্বে। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই অঞ্চলের ময়নামতি ও মহাস্থানগড়সহ অন্যান্য বৌদ্ধ বিহারগুলোতে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বিশেষত বৌদ্ধ বিহারের সেসব গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত উপকরণ থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য নানান দূরদেশের জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু মানুষের পদব্রজে আসা-যাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। ৩৯৯ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে

বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এ-ছাড়াও হিউয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে অধিকতর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানার্জনের জন্য এ অঞ্চলের বৌদ্ধবিহারে থাকা গ্রন্থাগারের সামগ্রী ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আগমন করেন। উক্ত বিবরণ থেকে ভারত উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের গ্রন্থাগার বিকাশের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

বাংলায় গ্রন্থাগারের প্রারম্ভ

সৃষ্টি ও সভ্যতা বিকাশের সহায়ক আদি বিদ্যাগুলোর মধ্যে একটি প্রাচীনতম অধিবিদ্যার অন্যতম বিদ্যা হচ্ছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা। মানবদর্শন বাস্তবায়নের সঠিক দিক নির্দেশনা জ্ঞাপনে গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। একথা বলা অনস্বীকার্য যে, যখন থেকে মানুষের ভাবনা-চিন্তা ও চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে, তখন থেকেই সেগুলোকে সংগঠিত করা হয়। ইতিহাস পরিক্রমায় জ্ঞানচর্চা, জ্ঞান-বিন্যাস ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়ায় গ্রন্থাগারের অগ্রগতি সভ্যতার ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত করেছে।

একটি গ্রন্থাগার যখন সংগঠিত হয় তখন সংগত কারণেই তার সংগ্রহ থাকে অল্প, চাহিদা থাকে সীমিত, কাজের পরিধিও থাকে কম। দিন যায়, প্রয়োজন বৃদ্ধি পায় এবং কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সুবাদে প্রয়োজন ও সেবার চাহিদা বহুমাত্রিকতায় উন্নতি লাভের পাশাপাশি একটি গ্রন্থাগারের সংগ্রহও বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই এর সংগ্রহ থেকে পাঠককে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সঠিক সময়ে সরবরাহ করার উদ্দেশ্যে পাঠোপকরণ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে গ্রন্থাগার সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি চলে আসে।

ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ বিহারগুলোর প্রসার মূলত এদেশে জ্ঞান চর্চার গোড়াপত্তন করে প্রাচীন সভ্যতার বিকাশকে চলমান রেখেছে। এই সুবাদে দাবী করা যায় যে, বর্তমান বাংলাদেশে গ্রন্থাগারের সূচনা হয় প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে। কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক বিকাশমান ধারাটি সেভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে নি।

গ্রন্থাগার আন্দোলন: ব্রিটিশ আমল

ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতায় ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূচনা হয়। ঊনিশ শতকের প্রথম দশকেই ভারতবর্ষের তিনটি প্রধান শহর কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। ত্রিশের দশকে এসময়ে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংয়ের ভারতবর্ষ ত্যাগ এবং লর্ড অকল্যান্ডের ভারতবর্ষে আগমনের মধ্যবর্তীকালে (মার্চ ১৮৩৫-ফেব্রুয়ারি ১৮৩৬) স্যার চার্লস থিওফিলাস মেটকাফ এক বছরের জন্য অস্থায়ী বড় লাট নিযুক্ত হন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে।

১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গে, ১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বোম্বাইয়ে এবং ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে

মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরক আইনগুলো রদ করে সমগ্র ভারতেই মুদ্রণযন্ত্রকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ আগস্ট এই আইনটি বিধিবদ্ধ হয়ে ১৫ সেপ্টেম্বর কার্যে পরিণত হয়। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ আগস্ট কলিকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় স্থির হয় যে, কলিকাতার কেন্দ্রস্থলে মেটকাফের প্রতি কৃতজ্ঞতার স্থায়ী নিদর্শন স্বরূপ 'মেটকাফে লাইব্রেরী বিল্ডিং' নামে একটি ভবন নির্মিত হবে এবং এখানে সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। এটাই মূলত পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয় কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে। গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হলেও প্রকাশ্যভাবে এর উন্মোচন হয় ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ। এটাই ছিল অবিভক্ত বাংলার সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত প্রথম গণগ্রন্থাগার।

ব্রিটিশ ভারতে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গণগ্রন্থাগার আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ঠিক এর এক বছর পর ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে যশোরে বেসরকারিভাবে প্রথম একটি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই আইন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে গণশিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সেই আদলে ভারতবর্ষেও তৎকালীন জমিদার, উমেদার, সমাজসেবী সরকারি কর্মকর্তা ও জনহিতৈষী ব্যক্তিদের উদ্যোগে গণশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে একযোগে আরও তিন জেলা-সদর পর্যায়ে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলো হলো উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি, যার সংগ্রহে ছিল ২৫,০০০টি গ্রন্থ, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি ও বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি; এবং এই দুই লাইব্রেরির সংগ্রহ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯,৮০০ এবং ১৭,২০০টি গ্রন্থ। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দকে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। পর্যায়ক্রমে জেলা, মহকুমা ও কতক থানা পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে রাজশাহী ও কুমিলা গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নোয়াখালী ও সিলেট পাবলিক লাইব্রেরি।

গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পূর্ববঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বেই বেশ কিছু কলেজ ও সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। যেগুলো ইতঃপূর্বেই ঐতিহ্যের শতবর্ষ উত্তীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা কলেজ (১৮৪১), জগন্নাথ কলেজ (১৮৪৪), রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩), বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ (১৮৮৯), সিলেট মুরারিচাঁদ কলেজ (১৮৯২), পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ (১৮৮৯), কুমিলা ভিক্টোরিয়া কলেজ (১৮৯৯) অন্যতম।

এরই মধ্যে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে Press and Registration Book Act পাশ হলে গ্রন্থাগার আন্দোলনে গতিপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের সূচনা হয়। এর পরে পর্যায়ক্রমে ১৮৭২-৭৬ খ্রিস্টাব্দের কোনো একসময় বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে ঢাকার বাংলাবাজারে ভারতবর্ষের গভর্নরের নামে নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন ঢাকায় গ্রন্থাগারটি শহরের অধিবাসীদের সাংস্কৃতিক চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গড়ে ওঠে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে বরিশালের বানারীপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, পাবনায় ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে আনন্দ গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি এবং ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে খুলনায় উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৮৪ থেকে

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে আরও বেশ কিছু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে নাটোর ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৮৭), নীলফামারী পাবলিক লাইব্রেরি (১৮৯১) এবং ভোলায় ওয়েস্টার্ন ডায়মন্ড জুবিলি গ্রন্থাগার ও ক্লাব (১৮৯৮) প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতেই বিশেষত বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ধারাটি একটু গতিশীল হতে দেখা যায়। এর মধ্যে কুড়িগ্রাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০১), বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বাকল্যান্ড পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৪), উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয় অনেক পরে (১৯৬৩); ব্রাহ্ম সমাজ কর্তৃক ঢাকার পাটুয়াটুলীতে প্রতিষ্ঠিত হয় পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৫), গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৭), ঢাকা জেলা গেজেটিয়ারের অন্যতম লেখক ও মুন্সীগঞ্জের তৎকালীন জেলা মেজিস্ট্রেট বি.সি. এলেন মুন্সীগঞ্জে হরেন্দ্রলাল পাবলিক লাইব্রেরি (১৯০৮), নওগাঁয় প্যারীমোহন সমবায় পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১০), লালমনিরহাট পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১১), রাজশাহী বরেন্দ্র মিউজিয়াম রিসার্চ লাইব্রেরি (১৯১০), রাণীনগরপুর ও গুরুদাসপুর পাবলিক লাইব্রেরি (১৯১৫) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে কুমিল্লার তৎকালীন সমাজসেবী শ্রী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর মায়ের নামে 'রাম মালা গ্রন্থাগার' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা জাদুঘর লাইব্রেরি।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে তৎকালীন ভারত সরকার নিখিল ভারত গ্রন্থাগারিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। তা ৪-৮ জানুয়ারি পর্যন্ত লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় ও নেতৃস্থানীয় গণগ্রন্থাগারের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে আঞ্চলিক গ্রন্থাগার পদ্ধতি চালু করে ছোটো-বড় সকল গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে একটি সার্ভিস প্রবর্তনের জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। এটি একটি সাংবিধানিক কাযক্রম ছিল। তারপরেই ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের স্বায়ত্বশাসন আইন ১৯১৯-এ সংশোধিত হলো এবং জেলা বোর্ড ও পৌরসভার উপর অর্পিত হলো গ্রন্থাগারের দায়িত্ব। সমগ্র বাংলাদেশে সংঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে অল বেঙ্গল লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতবর্ষ বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় সকল জেলাসদরে একটি করে পাবলিক লাইব্রেরি বিদ্যমান ছিল। এখনও সেগুলো কোনো না কোনোভাবে সরকারি কিংবা বেসরকারি লাইব্রেরি হিসেবে চলমান আছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতিধারা ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ধাবমান ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে গতিধারায় কিছু শিথিলতা নেমে আসে। অন্যদিকে তার কিছুদিন পরেই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের সূচনা হয়। এর ফলে উজ্জীবিত চাঞ্চল্যেও স্থবিরতা দেখা যায়। আন্দোলন বেশ পিছিয়ে পড়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সরকার প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করার ফলে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারলাভ করার সুযোগ তৈরি হয়।

এর ফলে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চা ব্যাপক প্রসারলাভ করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলে ৬১টি, বগুড়ায় ৩২টি, ঢাকা জেলায় ২৫টি, ময়মনসিংহ জেলায় ৩৯টি, ফরিদপুরে ২৩টি, রাজশাহীতে ৪৮টি, রংপুরে ২৬টি, নোয়াখালী ও সিলেটে যথাক্রমে ১৫ ও ২১টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার খোঁজ পাওয়া যায়। এ-ছাড়াও বিক্ষিপ্তভাবে সরকারি ও বেসরকারি আরও ১২১টি গ্রন্থাগারের হিসেব পাওয়া যায় বিভিন্ন উৎস থেকে। বর্তমানে এর অনেকগুলোই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ভারতবর্ষে ৩৩৫টিরও বেশি বেসরকারি গণগ্রন্থাগারের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার, উমেদার, সমাজহিতৈষী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বা পরিবার এই গ্রন্থাগারগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রেখেছিলেন।

পাকিস্তান আমল

ইউনেস্কোর পরামর্শে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পাকিস্তান বিবলিওগ্রাফিক্যাল ওয়ার্কিং গ্রুপ (PBWG) গঠিত হয়েছিল। গ্রুপটি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে পুনর্গঠিত হয়। ৬ জুলাই ১৯৫৪-এ অনুষ্ঠিত এর সভায় একটি জাতীয় সমিতি গঠনের জন্য একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। এইভাবে পাকিস্তান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (পিএলএ) ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ) প্রতিনিধি অ্যাডহক কমিটিতে ছিলেন যাঁরা করাচিতে 'অল পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দেন।

পূর্ব পাকিস্তানে তখন সম্পূর্ণ শূন্যতা। ঢাকা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি ছিল একমাত্র লাইব্রেরি যা পূর্ব পাকিস্তানের অংশে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ছিলেন খণ্ডকালীন গ্রন্থাগারিক। কয়েকটি সাবস্ক্রিপশন লাইব্রেরি–যেখানে অল্প কল্পকাহিনী রয়েছে তাকে পাবলিক লাইব্রেরি বলা হতো। আধা-সরকারি সংস্থা এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির ছোটো লাইব্রেরি ছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে, তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থায় গ্রন্থাগার সমিতির অনুপস্থিতি প্রবলভাবে অনুভূত হয়। তাই ঢাকার সাত জন প্র্যাকটিসিং লাইব্রেরিয়ান ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে পলাশী ব্যারাকে একত্রিত হন এবং অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্ব এবং পূর্ব পাকিস্তানে গ্রন্থাগার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার সংকল্প করেন। তারা হলেন জনাব এ.আর. মীরদাহ, জনাব এ.ই.এম. শামসুল হক, জনাব রাকিব হোসেন, জনাব সিদ্দিক আহমদ চৌধুরী, জনাব জামিল খান, খন্দকার আব্দুর রব এবং জনাব তোফাজ্জল হোসেন। তাঁদের প্রচেষ্টা পূর্ব পাকিস্তানে গ্রন্থাগার আন্দোলনে রূপ নেয়।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ড. নাফিজ আহমদকে আহ্বায়ক করে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করা হয়। জনাব আহমদ হোসেন, গ্রন্থাগারিক,

কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি, জনাব রাকিব হোসেন, গ্রন্থাগারিক, ইউএসআইএস এবং মিসেস নার্গিস জাফর, রেফারেন্স লাইব্রেরিয়ান, ইউএসআইএস গঠিত হয়। এদিকে, ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে মরহুম জনাব মোহাম্মদ সিদ্দিক খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হিসেবে যোগদান করেন। যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে এসে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে যোগদানের পরপরই তিনি সমিতিতে যোগ দেন। জনাব খানের অন্তর্ভুক্তি এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ এই নবজাতক সমিতিকে একটি নতুন জীবন ও চেতনা দিয়েছে। জনাব আহমদ হোসেন, জনাব এ.আর. মীরদাহর সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি সংবিধান খসড়া উপকমিটি। মীরদাহ ও জনাব রাকিব হোসেন অচিরেই খসড়া গঠন করেন। তাদের সহায়তা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের পাঠক জনাব শামসুজ্জোহা আনসারী।

১৯৫৬ খিস্টাব্দে সেই সংবিধানের ভিত্তিতে ইস্ট পাকিস্তান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (ইপিএলএ) গঠিত হয়। রবিবার ৩০ জুন ১৯৫৭ তারিখে, ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসেস (ইউএসআইএস) মিলনায়তনে নবজাতক সমিতির ঐতিহাসিক বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা শহরের অধিকাংশ সদস্য গ্রন্থাগারিক উপস্থিত ছিলেন। অ্যাসোসিয়েশনের পদাধিকারীরাও নির্বাচিত হয়ে অ্যাসোসিয়েশনের আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যান। তখন থেকেই এই অঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলন আকারে ছড়িয়ে পড়ে। সরকারি উদ্যোগে বিভাগীয় পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে বড় বড় শহরের পাড়া-মহল্লায় এটি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এমনকি বড় কিছু গ্রামেও এর প্রভাব দেখা যায়।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল শিল্প, সাহিত্য, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির লালনকেন্দ্র হিসেবে কাজ করা; দেশ ও জাতি সম্পর্কে দেশি-বিদেশি সকল প্রকাশনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা; বৈধ গচ্ছিতকারী লাইব্রেরি হিসেবে কাজ করা; জাতীয় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা এবং সরকারের তথ্য পরিবেশন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা। জাতীয় গ্রন্থাগারের কার্যাবলী হলো দেশের সমস্ত পুস্তক, সরকারি প্রকাশনা ও সাময়িকী কপিরাইট আইনবলে সংগ্রহ করা এবং সংগঠন, সংরক্ষণ ও বিতরণ করা; বাংলাদেশ সম্পর্কে দেশের বাইরে প্রকাশিত পাঠোপকরণসমূহ সংগ্রহ, সংগঠন, বিন্যাস ও বিতরণ; জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি প্রণয়ন ও প্রকাশ করা; ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রস্তুত করা; পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা; আন্তঃগ্রন্থাগার সেবার সমন্বয় সাধন করা; দেশে বিদ্যমান গ্রন্থাগার সেবার সমন্বয় সাধন; আন্তর্জাতিক তথ্য বিনিময় কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা; দেশে প্রকাশিত গ্রন্থ ও সাময়িকীর যথাক্রমে আইএসবিএন ও আইএসএসএন দেওয়া; সরকারকে তথ্যসেবা দেওয়া ইত্যাদি।

স্বাধীন বাংলদেশ

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার অব্যবহিত পরেই পূর্ব পাকিস্তান গ্রন্থাগার সমিতির পুনঃনামকরণ করে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি (Bangladesh Librarz

Association, LAB) নির্ধারণ করা হয়। এরপর বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে আন্তর্জাতিক লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন (IFLA) ও কমনওয়েলথ লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের (COMLA) স্বীকৃতি অর্জন করে সদস্য পদপ্রাপ্ত হয়।
১২ জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দেশ পুনর্গঠনে লেগে পড়েন সহযোগীদের নিয়ে। ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে বঙ্গবন্ধু স্বাক্ষর করেন। যুদ্ধকালে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংযুক্ত অসংখ্য গ্রন্থাগারসহ দেশের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো পর্যুদস্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সেসব বিবেচনায় নিয়েই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিকল্পনা গৃহীত হয় দেশ পুনর্গঠনের জন্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আলোকে বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করে বঙ্গবন্ধুর ভাবনার সরকার এক দূরদর্শী ও সুদূর-প্রসারী মনোভাব নিয়ে ডক্টর কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশনে যুগান্তকারী প্রতিবেদন পেশ করা হয় ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার উন্নয়ন বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর লালিত ভাবনার যুগান্তকারী প্রতিফলন ঘটে কমিশনের প্রতিবেদনে। যার বাস্তবায়নে অনায়াসে পিছিয়ে থাকা যুদ্ধে ধ্বংসপ্রায় দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা সম্ভব বলে বঙ্গবন্ধু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন। তাই বিবেচনায় রেখে কমিশন সঠিক দায়িত্ব পালন করেন যার বাস্তবতা আজও অনস্বীকার্য।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার অদম্য বাসনাকে সম্মান জানিয়ে নতুন উদ্দীপনায় জনগণ আর্থ-সামাজিক তথা দেশ ও জাতি গঠনে আত্মনিবেদিত হলো। এ সময়ে গ্রাম-গঞ্জের ভাঙাচোরা, জ্বালিয়ে দেওয়া অথবা লুণ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলোকে দাঁড় করানোর আয়োজন শুরু হলো। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে গণগ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। উপযুক্ত সময়ে যথার্থ পদক্ষেপ গৃহীত হয় বঙ্গবন্ধুর একান্ত নির্দেশে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য। এতে প্রায় ২ কোটি ৪০ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ করে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর সরকার গণগ্রন্থাগারের উন্নয়নসহ বিশেষ গ্রন্থাগারগুলোকে মানসম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করে। কারণ সদ্য স্বাধীন ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে দ্রুততম সময়ে গড়া ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও গবেষণা সমৃদ্ধ করার তাগিদ অনুভব করা হয়। বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, শিল্প-কারখানা, জাদুঘর প্রভৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারগুলোকে গড়ে তুলে একটি মানসম্পন্ন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাগাদা দেওয়া হয়। এর মধ্যে বিশেষ গ্রন্থাগারগুলো গণগ্রন্থাগার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার অপেক্ষা অধিকতর সচেষ্ট ও উন্নতমানের অধিকারী হয়ে উঠতে সক্ষম হয়। এগুলোই মূলত দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিবে বলে বঙ্গবন্ধু বিশ্বাস করতেন।

বঙ্গবন্ধুর এ বিশ্বাস ও ভাবনা থেকেই ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু প্রতি থানায় একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের নির্দেশ

দিয়েছিলেন ডক্টর কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের উদ্ধৃতি দিয়ে। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডক্টর মাযহারুল ইসলাম। স্মর্তব্য যে, বঙ্গবন্ধুর বই পড়ার ক্ষুধা থেকে দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার অদম্য তাগাদা অনুভব করেছিলেন বলেই সদ্য স্বাধীন দেশে ধ্বংসপ্রাপ্ত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারসহ গণগ্রন্থাগারগুলোর পুনর্নির্মাণসহ নতুন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছিলেন।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন গ্রন্থাগারিক মরহুম ফজলে এলাহীর প্রচেষ্টায় ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম তিন মাসের সার্টিফিকেট কোর্স প্রবর্তিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কলা অনুষদের অধীনে। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ' প্রবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম চালু হয়। এটি ছিল ছয় মাসের একটি সার্টিফিকেট কোর্স। মোট চার কোর্স পর্যায়ক্রমে পরিচালিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫৯-১৯৬০ ও ১৯৬২-১৯৬৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যথাক্রমে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা এবং মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্স চালু হয়। একই সময়ে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের আদলে ১৯৫৯-১৯৬০ শিক্ষাবর্ষে এক বছর মেয়াদি স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স উত্তীর্ণরা এক বছর মেয়াদি 'মাস্টার্স অব আর্টস' কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬২-১৯৬৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাস্টার্স অব আর্টস কোর্স অত্যন্ত সফলভাবে শুরু হয়। ১৯৬৪-১৯৬৫ শিক্ষাবর্ষটি বাংলাদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার দিগন্ত উন্মোচিত হয় উন্নয়নের মডেল হিসেবে। এই শিক্ষাবর্ষ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান কোর্সটি স্বীকৃতিলাভ করে এবং 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগ' হিসেবে কলা অনুষদের অধীনে পূর্ণাঙ্গ বিভাগ রূপে সংগঠিত হয়। ১৯৭৪-৭৫ খ্রিস্টাব্দে দুই মেয়াদি 'মাস্টার্স অব ফিলোসফি' (এমফিল) প্রোগ্রামকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অনুমোদন দেয় এবং ১৯৭৫-১৯৭৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে কোর্স চালু হয়। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে 'ডক্টর অব ফিলোসফি' (পিএইচডি) প্রোগ্রামটিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট অনুমোদন দেয় ১৯১৭৮-৭৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে। ১৯৮৭-১৯৮৮ শিক্ষাবর্ষ থেকে তিন বছর মেয়াদি গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে ব্যাচেলর অব আর্টস (বি এ অনার্স) ডিগ্রি হিসেবে অনুমোদনপ্রাপ্ত হয়। একই সময়ে তথ্য-প্রযুক্তির যুগের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে বিভাগের নাম পরিবর্তন করে 'গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ' রূপে নামকরণ করা হয়।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে। দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানী তথা বাংলাদেশ গ্রন্থাগারিক ও তথ্যায়নবিদ সমিতির দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (পাশ) কোর্সে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিষয়ে ৪০০ নম্বরের অপশনাল বিষয় নেওয়ার সুযোগ প্রবর্তন করা হয়। তাছাড়াও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত তিনটি কলেজে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান অধ্যয়ন করার সুযোগ রয়েছে।

গ্রন্থাগার সমিতি

বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে গতিশীল করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ খুব একটা গৃহীত না হলেও দেশের গ্রন্থাগার পেশা ও পেশাজীবীদের দাবী-দাওয়া পূরণ ও উন্নয়নের জন্য কয়েকটি সংগঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতির (LAB) নাম উলেখযোগ্য। দেশের গ্রন্থাগার পেশা ও পেশাজীবীদের উন্নয়নের প্রয়োজনে 'বারগেইনিং প্লাটফর্ম' হিসেবে কতিপয় বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। মোট ১৩ সদস্যবিশিষ্ট একটি কার্যকরী পরিষদ সমিতির কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি ও ট্রেজারার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যথাক্রমে মরহুম মুহম্মদ সিদ্দিক খান, মরহুম রাকিব হোসেন ও মরহুম আবদুর রহমান মৃধা। এ-ছাড়াও আরও ১০ জন উক্ত কার্যকরি পরিষদে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে আরও কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয় এবং তাঁরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু বাহ্যত তেমন কোনও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয় নি। পেশাগত ক্ষেত্রে বহুদিন পর্যন্ত একটি শূন্যতা ও সম্পূর্ণ নির্লিপ্ততা বিরাজ করছিল।

তথ্যপ্রযুক্তির মহাসড়কে প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুতি

এখন বিশ্বে তথ্য একটি অপরিহার্য সম্পদ হিসেবে গণ্য। তথ্য-সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও বিতরণের ক্ষেত্রে নতুন তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার তথ্য-বিস্ফোরণের ভয়াবহতায় রূপান্তরিত হয়েছে 'তথ্য বিপ্লবে'। বস্তুত, তথ্যবিপ্লবের ফলেই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন বিশ্ব এখন পরিণত হয়েছে অখণ্ড বিশ্বপল্লীতে। তথ্য-প্রবাহের প্রক্রিয়ায় বিশ্ব এখন নিরবচ্ছিন্ন তথ্যগ্রাম হিসেবে স্বীকৃত। তথ্যসেবায় ব্যবহৃত কারিগরি জ্ঞান ও কলাকৌশল এখন তাই নতুন অভিধায় 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' হিসেবেই চিহ্নিত।

'তথ্য-প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন ও পৃষ্ঠপোষকতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অফিস-আদালত বিশেষত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলোতে 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' ব্যবহার করে তথ্য অনুসন্ধানের সুযোগ সৃষ্টি ও দ্রুত তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনের মাধ্যমে আধুনিক তথ্য-ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। অনলাইন নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি তথ্য-ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার-ভিত্তিক অনলাইন ও অফলাইন প্রযুক্তি এক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। অনলাইন নেটওয়ার্কিং পদ্ধতি তথ্য-বিস্ফোরণের ব্যাপক পরিমণ্ডলকে ছোটো করে নিয়ে এসেছে। আন্তর্জাতিক অনলাইন তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তথ্যের মহাসড়কে বিচরণের সুযোগ তৈরি হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই বাংলাদেশ যুক্ত হয় তথ্যের মহাসড়কে তথা ইন্টারনেটের সঙ্গে। তখন থেকেই ডিজিটাল

রেফারেন্স থেকে পূর্ণ ডিজিটাল টেক্সটে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। কতিপয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র দ্রুত এই সুযোগ নেওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং খুব অল্পসংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পূর্ণ ডিজিটাল টেক্সটে প্রবেশাধিকার প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে চাঁদা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এর আগে ঠিক ৮০-র দশকে 'তথ্যায়ন–একটি নতুন ধারণা' নিয়ে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যসেবায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। বিশেষত আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশীয় বিশেষ প্রতিষ্ঠানগুলো তথ্য-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তথ্যায়ন-সেবার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবাগ্রহীতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। সংস্থাগুলো তথ্যায়ন-সেবাদানের আওতায় বিব্লিওগ্রাফিক্যাল সেবা যেমন কারেন্ট অ্যাওয়ারনেস, কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস, এসডিআই, ডকুমেন্ট রিভিউ, ডকুমেন্ট রিপ্রোডাকশনসহ নানা রকম তথ্যায়ন-সেবায় নতুনত্ব আনয়ন করে।

উন্নয়নের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানুষের জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যার সমাধানকে সহজ থেকে সহজতর করে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের কল্যাণসাধন করা। গণমানুষের প্রকৃত উন্নয়ন ব্যতিরেকে রাষ্ট্রীয় উন্নতির কোনও ফলাফলই আশাব্যঞ্জক হয় না। অনুভূতি ও মননের অভিব্যক্তি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনকে উপলব্ধির জন্য এবং জাতীয় আর্থ-সামাজিক জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য দরকার গণমানুষের উন্নতিসাধন। গণমানুষ তাঁরাই, যাঁদের বসবাস গ্রামীণ জনপদে। এঁদের বোধ বা সত্ত্বাকে উপলব্ধির প্রয়োজনে তাঁদের হাতে তথ্য পৌঁছে দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাই চেয়েছিলেন গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপন করে সোনার মানুষদের দিয়ে সোনার বাংলা গড়তে।

বর্তমানে প্রায় প্রতিটি জেলা এবং উপজেলায় বেসরকারি গণগ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের এক জরিপে দেখা যায়, সারা দেশে প্রায় ১,৬০০ বেসরকারি গণগ্রন্থাগার আছে। তবে বেশিরভাগ গ্রন্থাগারের অবস্থা উন্নত নয়। দেশের ৩১টি সরকারি এবং ৫১টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় থেকে এখানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে। বর্তমানে এ-গ্রন্থাগারে গ্রন্থসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ৭৬ হাজার বাঁধাই সাময়িকী রয়েছে। এ-গ্রন্থাগারে প্রায় ৩শ জার্নাল আছে। দেশে ৭০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ১২ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার রয়েছে। মাদ্রাসা-কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও গ্রন্থাগার রয়েছে।

সুপারিশ

১. দেশের গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন ব্যবস্থা সুসংহতকরণের জন্য একটি সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য;

২. 'ইউনেসকো'র এসডিজি-২০৩০, শিক্ষা এজেন্ডা-৪ বাস্তবায়নের জন্য বঙ্গবন্ধু-নির্দেশিত ডক্টর কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের আদলে গ্রন্থাগার ও তথ্যায়ন-সেবা সর্বস্তরে সহজলভ্য করা;

৩. প্রতি ইউনিয়নে একটি করে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা যা একাধারে জ্ঞানের পাশাপাশি

তথ্যপ্রাপ্তি কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে;

৪. গ্রন্থাগারকে সম্পূর্ণ ডিজিটাল করা দরকার। গুগল-এর একটি মতো সহজলভ্য অনলাইন প্লাটফর্ম অতি অপরিহার্য;

৫. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান শিক্ষা পাঠ্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রন্ত ব্যবহারিক শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করা;

৬. গণগ্রন্থাগারের পরিসেবা কার্যক্রমকে গণমুখীন করার জন্য গণগ্রন্থাগারের আইন প্রবর্তন করা জরুরি;

৭. বিদ্যমান গণগ্রন্থাগারগুলোকে শীঘ্রই শিশুদের মননশীল, বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশ ও প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞানচর্চার বিদ্যাপীঠ হিসেবে গড়ে তোলা দরকার।

পরিশেষে

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার সংগঠনের ইতিহাস সমৃদ্ধ। বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় বাংলাদেশ এদিক থেকে অনেক বেশি ঐতিহ্যের অধিকারী। জাতির মেধা, মনন উন্নত করতে আর জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়তে গ্রন্থাগার অপরিহার্য। ডিজিটাল-গ্রন্থাগার আজ সময়ের দাবি। জাতিকে বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে নিতে আর দেশকে আগামীর উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে গ্রন্থাগারের বিকল্প নেই। তাই আমাদের একটি সমন্বিত আর ডিজিটাল গ্রন্থাগারে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় আজই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এক টাকায় স্মৃতি পাঠাগার

আবদুল হালিম খান

একাত্তরে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বিজয়ীর বেশে ঘরে ফিরেছি। টগবগে যৌবন, হৃদয়ে দেশ পুনর্গঠনের হাজারো পরিকল্পনা। যেহেতু আমরা ছাত্র-সংগঠনের সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলাম, তাই প্রথম পর্যায়ে এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ছাত্র-সংগঠন তথা বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের শাখা গঠন করি। আমাকে সভাপতি ও আমার সহপাঠী ও সহযোদ্ধা হারুন-অর-রশিদ বাচ্চুকে সাধারণ সম্পাদক করে তেইশ সদস্য বিশিষ্ট শ্রীনগর, সিরাজদিখান ও নবাবগঞ্জ থানা আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়।

সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চুড়াইন বাজারে দৃষ্টিনন্দন একটি টিনের দোতলার উপরতলায় দুটি সুপরিসর কক্ষ নিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের অফিস করা হয়। একই সঙ্গে বাড়ৈখালী বাজারেও অনুরূপ একটি অফিস করা হয়। চুড়াইন বাজারের অফিসটির সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করত চুড়াইনের পরিতোষ দাস। আমরা নিয়মিত সেই অফিসে বসে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে কাজ করতাম। প্রথম পর্যায়ে আশু-কর্মসূচি হিসেবে চারটি কর্মসূচি হাতে নিই–

১. এলাকার বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট মেরামত করা;
২. কৃষকদের সমবায় পদ্ধতিতে চাষাবাদে উদ্বুদ্ধ করা;
৩. অগভীর নলকূপ বসিয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা;
৪. সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

ছাত্র ইউনিয়নের পাশাপাশি আমাদের এলাকায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও বাংলাদেশ কৃষক সমিতির শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছিল। উল্লিখিত কর্মসূচিগুলো পূর্বোক্ত সংগঠনগুলোর সঙ্গে যৌথভাবে পালন করেছি। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশে সমগ্র বাংলাদেশে 'স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড' গঠন করা হয়। আমাদের এলাকায়ও শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেড গঠন করেছিলাম। এই ব্রিগেডের কমান্ডার ছিলেন আজকের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ইউনিক গ্রুপের কর্ণধার মোহাম্মদ নূর আলী।

ওই বছরের রোজার ঈদের দুদিন আগে অফিসে বসে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি। হঠাৎ মাথায় এল আমাদের অফিসের পাশের কক্ষটিতে একটি পাঠাগার করলে কেমন হয়। সবাই একবাক্যে সমর্থন করলেন। তবে পাঠাগার করতে তো টাকার প্রয়োজন। টাকা পাওয়া যাবে কোথায়? অগ্রপশ্চাৎ না ভেবেই বলে ফেললাম, 'টাকা আমি দেব। কিন্তু শর্ত হলো, আমি যা বলব তা তোমাদের করতে হবে।' এই শর্ত সবাই মেনে নিল। বললাম,

'আগামীকাল এই সময়ে তোমরা অফিসে আসবে, আমি তোমাদের নির্দেশনা দেব।'

রাতভর চিন্তা করলাম কীভাবে পাঠাগারের টাকা সংগ্রহ করা যায়। আমরা তো ছাত্র, আমাদের পক্ষে টাকা দেওয়া মোটেও সম্ভব নয়। কারো কাছে চাইব এমন মানুষও খুঁজে পাচ্ছি না। তাছাড়া ঐ সময়ের বাস্তবতায় একজন ব্যক্তির পক্ষে একটা পাঠাগার গড়ার টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। এবারও মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ঠিক করলাম আমরা যদি এক টাকা করে অনুদান চেয়ে মানুষের কাছে যাই এবং এক হাজার লোকের কাছে যেতে পারি, তাহলে তো টাকার সমস্যা মিটে যায়। পাশাপাশি এক হাজার লোককে পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় সম্পৃক্ত করতে পারি।

পরদিন ছাত্র ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে কর্মীদের বললাম, 'আমি ঢাকা যাচ্ছি, আগামীকাল ফিরব। আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় বিভিন্ন গ্রামের পঁয়ত্রিশ জন বাছাই করা কর্মী নিয়ে তোমরা অফিসে উপস্থিত থাকবে।'

ঢাকায় গিয়ে সূত্রাপুর এলাকার চব্বিশ শ্রীস দাস লেনের পপুলার প্রেস থেকে এক টাকা মুল্যের এক হাজার কুপন ছাপিয়ে পঁচিশ পাতা করে চল্লিশটি বই তৈরি করলাম। পরদিন ঢাকা থেকে সরাসরি অফিসে গেলাম। গিয়ে দেখি নূর আলীর নেতৃত্বে আমাদের স্বেচ্ছাসেবক ব্রিগেডের কর্মীবাহিনী প্রস্তুত। দিনটি ছিল রোজার ঈদের আগের দিন। প্রত্যেক কর্মীর হাতে পঁচিশ পাতার একটি বই দিয়ে বললাম, 'আগামীকাল ঈদের নামাজের পর যার যার গ্রামের আত্মীয়স্বজন ও পরিচিত লোকদের কাছ থেকে কুপনের মাধ্যমে এক টাকা করে সংগ্রহ করবে।' আমি নিজে পাঁচটি বই রাখলাম। সবাইকে বললাম, ঈদের দিন বিকেলে সংগৃহীত টাকাসহ আবার অফিসে আসতে।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো পঁচিশটি কুপন দিয়ে টাকা তুলতে কোনো কর্মীরই আধঘণ্টার বেশি সময় লাগে নি। যার কাছে চেয়েছে সে-ই সন্তুষ্টচিত্তে দিয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, টাকা হিসেব করে দেখা গেল মোট এগারোশ' টাকা সংগ্রহ হয়েছে। কুপন দিলাম এক হাজার টাকার, এগারোশ' টাকা সংগ্রহ হলো কী করে? খবর নিয়ে জানা গেল, এক টাকার বদলে কেউ কেউ দুই টাকা, পাঁচ টাকা এমনকি দশ টাকাও দিয়েছেন।

এত অল্প সময়ে সফলভাবে টাকা সংগ্রহ হওয়ায় সবাই খুব আনন্দ পেল এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল। ঈদের কয়েক দিন পরে বাংলা একাডেমি থেকে আমরা বেশ কিছু বই কিনি। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ন্যাপ-নেতা প্রয়াত অ্যাডভোকেট জাকির আহম্মেদ, যিনি পরে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন, তিনি একাই তিনশ টাকার বই কিনে দিলেন। প্রচুর পরিমাণ বই নিয়ে যখন অফিসে ফিরলাম, সবার সে কী আনন্দ। বই কেনার সময়ে আমার সঙ্গে ঢাকায় আসে ছাত্র ইউনিয়নকর্মী হাফিজুর রহমান।

এবার এল নামকরণের পালা। ছাত্র ইউনিয়নের তরুণ নেতা–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, লৌহজং উপজেলার কাজির পাগলা গ্রামের পুলিশ অফিসারের জ্যেষ্ঠ সন্তান জাহাঙ্গীর মুনির ও শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর গ্রামের কৃতিব্যক্তি রাষ্ট্রদূত কামরুদ্দিনের মেধাবী ছেলে নিজামুদ্দিন আজাদের নামে পাঠাগারের নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এঁরা দুজনই ভারত থেকে গেরিলা প্রশিক্ষণশেষে দেশে ফেরার পথে কুমিল্লার বেতিয়ারায় পাকবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে শহীদ হন।

আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে কয়েকশ বই ছিল, আলমারিসহ সবগুলো বই পাঠাগারে দিয়ে দিলাম। সব মিলিয়ে একটা সমৃদ্ধ পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলো। পাঠাগারটি উদ্বোধন করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রণেশ দাশগুপ্ত। পাঠাগারটি ভালোই চলছিল। তবে পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর বৈরী পরিবেশে আমরা অনেকেই এলাকা ছেড়ে চলে আসি। পাঠাগারটি অরক্ষিত হয়ে যায়, অনেক বই খোয়া যায়। কালক্রমে পাঠাগারটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বই পড়ার আনন্দ মনের চাহিদার কতটুকু পুরণ করে অথবা মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষায় কোনো বিশেষ ভূমিকা রাখে কি না–এ বিষয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ কী আমি জানি না, তবে এই কথা জোর দিয়েই বলতে পারি, সেদিনের এক টাকার মান ও ওজনে তারুণ্য-প্রফুল্ল চিত্তে যে-পাঠাগার তৈরির সিদ্ধান্ত ছিল, একই অনুপ্রেরণায় সেটি আজ অর্ধ-শতাব্দী পরে হলেও সম্ভব। জনপ্রতি শুধু একশত টাকা ধরে এইরকম স্মৃতি-পাঠাগার অবলীলায় গড়ে তোলা যায় মনচৈতন্যের সরল বিকাশের লক্ষ্যে। আজ সেই আহ্বান জানাই, পঠন-বিলাসিতা হোক আমাদের নিত্য কর্তব্যের অংশ।

আমাদের প্রজন্মের মানসিক বিকাশ এবং পাঠাগার আন্দোলন প্রসঙ্গ:

মার্জিয়া লিপি

আজকাল শিশুরা বেড়ে উঠছে আমাদের স্বপ্নের বোঝা কাঁধে নিয়ে। দিগন্তজোড়া সবুজ খেতের আঁকাবাঁকা পথ ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ফড়িং কিংবা প্রজাপতির দিকে ছুটতে থাকা এখনকার শহুরে শিশুদের নাগালের বাইরে। ডাংগুলি-মার্বেল-গুলতি-গোল্লাছুট খেলা, কাদামাটি দিয়ে শখের নকশা বানানো, সন্ধ্যায় ডোবার পাশে সবুজ ঝোপঝাড়ে জোনাকি ধরতে যাওয়া হয়ে ওঠে না। নদী-বিল-ঝিলে সাঁতার কেটে লাল-সাদা-বেগুনি শাপলা তুলে আনা; শালুক আর পানিফল খুঁজে পাওয়া; কিংবা ঘুড়ির ভোকাট্টায় নিজেদের স্বপ্নগুলো আকাশে উড়িয়ে দেওয়া–এই সবকিছুই তাদের কাছে অধরা স্বপ্ন।

পুঁথিগত বিদ্যায় শিক্ষিত শহুরে মা-বাবারা নিজেদের জীবনের অধরা স্বপ্নের ভার অবলীলায় শিশুদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মতো অন্যায় করছি। নাগরিক-জীবনে শিশুদের রয়েছে নানা রকমের সীমাবদ্ধতা। শহুরে যান্ত্রিকতায় আজকাল তাদের অভ্যস্ত করছি অনেকটা জোর করেই। কোমলপ্রাণ শিশু-কিশোরদের মাপছি নিজেদের শখের বাটখারার যান্ত্রিকতায়। অনেক ক্ষেত্রে রিমোট কন্ট্রোলে নিয়ন্ত্রণ করছি তাদের ইচ্ছা, আবদারকে। ঘরের কোনে আবদ্ধ রেখে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চাই ক্লোজ-সার্কিট ক্যামেরায়। স্যাটেলাইটের কল্যাণে বিভিন্ন কার্টুন চ্যানেলে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি ভিনদেশি ভাষায়, ভিনদেশীয় সংস্কৃতিকে। আকাশ-সংস্কৃতি আর যান্ত্রিক ইন্টারনেটের জালে জড়িয়ে যাচ্ছে নাগরিক জীবনপ্রবাহ–যা শিশুর সুস্থ ও স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায়। আমরা অভিভাবকরাও বুঝে, না-বুঝে কিংবা বাধ্য হয়ে আধুনিকতার নামে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর কুপ্রভাব পড়ে এমন প্রযুক্তি হাতে তুলে দিয়েছি। শিশু-কিশোরেরা খেলাধুলায় অভ্যস্ত না হয়ে এখন মোবাইল ফোনে বিভিন্ন গেমসহ নানা ধরনের আসক্তিমূলক সফটওয়্যার ব্যবহার করছে–যা তাদের ওপর ভয়াবহ নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

যদিও বাস্তবতা–বর্তমান সময়ে একটি অপরিহার্য ইলকেট্রনিকস যন্ত্র–মোবাইল ফোন। এর মাধ্যমে যোগাযোগ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের সঙ্গে সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে সব ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্মার্টফোন অপরিহার্য একটি ডিভাইস। কথা বলার পাশাপাশি স্মার্টফোনে ইন্টারনেট গ্রহণের সুবিধা রয়েছে। একটা সময়ে ইন্টারনেট ব্যবহারের একমাত্র উপায় ছিল কম্পিউটার। বর্তমান সময়ে স্মার্টফোনে কম্পিউটারের সকল কাজই করা সম্ভব। মোবাইল ফোন ব্যবহারের রয়েছে বহুবিধ উপকারী দিক এবং সুবিধা। আবার অপকারিতার সংখ্যাও কম নয়। যেসব জিনিসের উপকারিতা রয়েছে, তার কিছু অপকারিতাও থাকে–এটাই স্বাভাবিক।

কোভিড-১৯-এর কারণে মহামারীর সময় থেকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নতুন সংযোজিত হয়েছে–'অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম'। এটি যেমন শিক্ষাকার্যক্রম অথবা যোগাযোগের মাধ্যম, তেমনই একটি বিনোদনেরও মাধ্যম। মোবাইল ফোনের মাত্রাতিরিক্ত আসক্তিতে বিভিন্ন বয়সী প্রজন্ম পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, বাড়ির কাজ করার সময়ে এবং এমনকি স্কুলের পাঠের

সময়েও নিয়মিত তাদের ফোন চেক করতে থাকে। বলা যেতে পারে, ফোন ছাড়া থাকা ব্যবহারকারীদের চরম উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সবচেয়ে সম্ভাবনাময় প্রজন্ম সাম্প্রতিক সময়ে এমন একটি রেডিও-ফ্রিকোয়েন্সির পরিবেশে বেড়ে উঠছে যা মানব-ইতিহাসে আগে কখনও ছিল না। মোবাইল ফোন এবং বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস থেকে নির্গত বিকিরণ নানাভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলছে। আমাদের শরীরে সেলফোন বিকিরণের প্রভাব সম্পর্কে অনেক গবেষণা চলছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গবেষণায় দেখা গেছে, স্মার্টফোনের অত্যধিক ব্যবহার মানসিক স্বাস্থ্যসমস্যার ঝুঁকি বাড়ায়। মোবাইল ফোনের অতিরিক্ত ব্যবহার দৃষ্টির সমস্যা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন সমীক্ষায় 'সেলফোন ভিশন সিনেড্রোম' দেখা গেছে। মোবাইল-কল শিশুদের মস্তিষ্কে হাইপার অ্যাক্টিভিটি সৃষ্টি করে, যা পরবর্তী অনেকটা সময়ে তাদের মস্তিষ্কে থেকে যায়। ফলে ব্যবহারকারীর স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, রক্তের চাপ বেড়ে যায়। দেহ ধীরে ধীরে ক্লান্ত ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে; এমনকি নিয়মিত ঘুমেরও ব্যাঘাত ঘটায়। স্ক্রিনের রেডিয়েশন প্রাপ্তবয়স্কদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর; শিশুদের জন্য তা আরও বেশি মারাত্মক ক্ষতিকর–যা তাদের মস্তিষ্কের বিকাশকে ব্যাহত করে।

এরকম পরিবেশে বেড়ে ওঠায় শিশু-কিশোরদের অনেক সময়ই ফুরসত হয় না–অথবা ভাবনায় আসে না–নিজের সংস্কৃতি, চারপাশ আর ইতিহাসকে খুঁজে দেখার। অথচ আমাদের লোকসাহিত্যে রয়েছে লোকছড়া, রূপকথা, গল্পকাহিনী–যাতে শিশুদের মনে কল্পনার জগৎ জেগে ওঠে; রচিত হয় স্বপ্নময় দৃশ্যপট। সত্য-মিথ্যার আলো-আঁধারিতে কল্পনাকে আচ্ছন্ন না করে আমাদের কিংবদন্তি আর ঐতিহ্য মনোজগৎ আলোকিত করে। কল্পনার বৃষ্টিতে স্নাত হয় শিশু-হৃদয়। চাঁদের দেশে চরকা টানা বুড়ি, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমি, সুয়োরানি-দুয়োরানি, কাজলরেখার রূপকাহিনী ঘুড়ি হয়ে তাদের ভাবনার আকাশে ওড়ে। প্রকৃতপক্ষে রূপকাহিনীর চেয়ে অবিশ্বাস্য আমাদের এই দেশ আর দেশের মানুষের জীবনের ইতিহাস। মানুষের জন্মকালের সমান সময়–নয় মাসে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। এ নয় মাসের ইতিহাসে জড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মানুষের বিস্ময়কর মর্মস্পর্শী কাহিনী–যা রূপকথার কল্পনাকেও হারিয়ে দেয়।

শুধু বাংলাদেশের জন্মকথা নয়, মাতৃভাষা বাংলা নিয়েও রয়েছে আমাদের গৌরবের ইতিহাস। প্রতিটি শিশুর প্রথম উচ্চারিত শব্দ–মাতৃভাষা, মায়ের ভাষা। মাতৃভাষা বাংলা অর্জনের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনন্য গৌরবগাথা। আমাদের বাংলাভাষার জন্যে এদেশের কালো রাজপথ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউর আর অহিউল্লাহর বুকের রক্তে লাল হয়েছে। তাঁদের আত্মত্যাগ আর মাতৃভাষা অর্জনের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে একুশের গান–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি'; নির্মিত হয়েছে বায়ান্নর ভাষা সৈনিকদের স্মরণে শহিদ মিনার। সংগ্রামের প্রতীক হয়ে শহিদ মিনারের মধ্যমিনার 'মা' হয়ে দুপাশে চার সন্তানকে আগলে রেখেছে সস্নেহে, অবনত হয়ে, সতর্ক প্রহরায়–নিরন্তর।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় নগর-শহরের স্কুলগুলোর অবস্থান অনেকাংশে আকাশছোঁয়া অ্যাপার্টমেন্টে। কাকডাকা ভোরে বিশাল তালিকার বইয়ের বোঝার ভার কাঁধে বহন করে ইট-কাঠের স্কুলে আবদ্ধ হয়ে চলে শিশুদের শিক্ষাকার্য। সেখানে বাগান নেই, পার্ক নেই, পুকুর নেই, মাঠ নেই, পাঠাগার নেই; বাবা-মার সঙ্গ দেওয়ার সময় নেই, খেলার সঙ্গী নেই; পড়ালেখার অতি-প্রতিযোগিতায় ভালো অভ্যাস গড়তে সাহায্য করারও কেউ নেই! আবদ্ধ রঙিন চার দেওয়ালের মধ্যে ঘুরছে অসুস্থ প্রতিযোগিতার ভিড়ে শিশুদের নরম ইচ্ছেগুলো।

শিশুদের, কিশোরদের বিকাশে নতুন ভাবনা আমাদের ভাবতে হবে। সেইসঙ্গে উদ্যোগ নিতে হবে–শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরিবারে দেশীয় সংস্কৃতির চর্চার। গড়ে তুলতে হবে সময়োপযোগী আধুনিক পাঠাগার। আমাদের দেশে মেধাবী, প্রযুক্তিতে দক্ষ ও সৃজনশীল মানুষের অভাব নেই, কিন্তু অভাব আছে সঠিক উদ্যোগের।

জ্ঞাননির্ভর ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নির্মাণের আকাঙ্ক্ষা মানুষের বহু দিনের। প্রযুক্তি-নির্ভর জনগোষ্ঠী অথবা বইবিমুখ বর্তমান প্রজন্মকে বইপড়ায় অভ্যস্ত করতে নানান আয়োজনের প্রয়োজন। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া জাতীয় চেতনার জাগরণ হয় না। পৃথিবীর বহু দেশ পাঠকের চাহিদা পূরণের জন্য গড়ে তুলেছে অগণিত পাঠাগার। শিক্ষার আলো-বঞ্চিত কোনো জাতি পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি। পাঠাগার শিক্ষার বাতিঘর। পাঠাগার ছাড়া কোনো সমাজ বা রাষ্ট্র তার নাগরিককে পরিপূর্ণ শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করতে পারে না। অনেকেরই বই পড়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে বই কিনতে পারে না। মানুষের বই পড়ার আগ্রহ থেকেই পাঠাগারের সৃষ্টি।

শতাব্দী থেকে শতাব্দী ধরে মানুষের জ্ঞান জমা হয়ে থাকে পাঠাগারের বইয়ের পাতায়। সেই বিবেচনায় পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা প্রতিটি সমাজে অনিবার্য। পাঠাগার বই ও অন্যান্য তথ্যসামগ্রীর একটি সংগ্রহশালা–যেখানে পাঠকের প্রবেশাধিকার থাকে এবং পাঠক সেখানে গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান করতে পারে। পাঠাগারে প্রথাগত বই পড়ার সুযোগ ছাড়াও সময়োপযোগী প্রযুক্তি-সহায়ক হিসেবে বিভিন্ন উদ্ভাবক সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। পাঠকের মধ্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়, যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্যে নেটওয়ার্কিং থাকতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চিন্তার ঐক্যসূত্রের মাধ্যম হতে পারে পাঠাগার।

আমাদের দেশে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বেড়েই চলেছে। মানুষ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারছে–শুধু বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য নয়, মনের জন্যও খাদ্য প্রয়োজন। যিশুখ্রিস্টের জন্মের বহু আগে মিসরে, প্রাচীন গ্রিসেও পাঠাগারের অস্তিত্ব ছিল; ভারতে প্রাচীনকালে পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল; আধুনিককালে বিজ্ঞানের সহায়তায় উন্নত পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বিশ্বের প্রতিটি দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবেও জাতীয় পাঠাগার রয়েছে; বেসরকারিভাবেও সারা দেশে গড়ে উঠেছে গণপাঠাগার–যা মানুষের জ্ঞানচর্চায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

আমাদের দেশে রাজধানী ঢাকায় 'কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়া ঢাকায় বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি, খুলনার উমেশচন্দ্র স্মৃতি গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য। ঢাকার বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র বাংলাদেশে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের প্রচলন করে আলোকিত মানুষ গড়ার কাজে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বে নানা রকম পাঠাগার রয়েছে। তার মধ্যে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সাধারণ ও জাতীয় পাঠাগার উল্লেখযোগ্য। সাধারণ পাঠাগার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত বলে এর পরিসর অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকের প্রয়োজনে প্রাতিষ্ঠানিক পাঠাগার গড়ে ওঠে।

আলোকিত জীবন তৈরিতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের মতো ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে হাতের নাগালে গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে। এরূপ সামাজিক পর্যায়ে শিশু-কিশোরদের বিকাশের জন্যে নানাভাবে কাজ করতে হবে। বিভিন্ন বয়সী শিশুদের বই পড়তে উদ্বুদ্ধ করতে সকল এলাকায় পাঠাগার স্থাপন করার পাশাপাশি বই পড়ার আন্দোলনকে উজ্জীবিত করার কোনও বিকল্প নেই। পাঠাগারে বই পড়ার পাশাপাশি বিভিন্ন খেলাধুলা ও বিনোদনের সুযোগ রাখা আবশ্যক, যাতে করে শিশু-কিশোরদের আনন্দের সঙ্গে জ্ঞানার্জন হয়। শিশুদের পড়ার অভ্যাস শুরু হয় ছবি দিয়ে। ছড়া-ছন্দ-ছবি শিশুদের নির্মল আনন্দ দেয়, কল্পনার জগৎকে রাঙিয়ে তোলে তাদের মনের ভাবনার রং দিয়ে।

পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশে পাঠ্যবইয়ের জ্ঞানের পাশাপাশি শিশু-কিশোরদের মানসিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশে সৃজনশীল পাঠের বিকল্প নেই। আকাশ-সংস্কৃতির যুগে নানা ব্যস্ততায় বই পড়ার প্রবণতা অনেকাংশে কমে গেছে। অনেক অভিভাবক বইপড়াকে পড়াশোনার অন্তরায় বলে মনে করেন। গল্পের বই মানেই 'আউট বই'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে–যে যত বই পড়বে তার ভেতরে তত বেশি কল্পনার জগৎ তৈরি হবে।

উদাহরণ হিসেবে 'কমিউনিটি ভিত্তিক পাঠাগার' মডেল অনুসরণ করা যেতে পারে: শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ, সচেতনতা সৃষ্টি, সুস্থ বিনোদন, ভাষার সমৃদ্ধি, সৃজনশীলতায় প্রাঞ্জল হতে কমিউনিটি-ভিত্তিক এসব পাঠাগার ব্যাপক ভূমিকা রাখে। সামাজিক এসব পাঠাগারে শিশু-কিশোরদের নামমাত্র বাৎসরিক ফি দিয়ে সদস্য ও লাইব্রেরি-কার্ড দেওয়া হয়। সাধারণত বই লেনদেন সেবা, মুভি শো, বিভিন্ন মজার মজার গঠনমূলক খেলার সুযোগ রয়েছে; বিভিন্ন দিবসে রচনা-গল্প লেখা, কবিতা-ছড়া আবৃত্তি, ছবি আঁকা, গল্প বলা, দেওয়ালপত্রিকা তৈরির প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে; আর এসবের মাধ্যমে শিশু, অভিভাবক, শিক্ষকদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করে; বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে অংশগ্রহনকারীদের উৎসাহিতও করে। এ-ছাড়াও সামাজিক শিশু-কিশোর পাঠাগারে শিশুদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা-সফরের সুযোগ রয়েছে। এসব আয়োজনে শিশুরা প্রকৃতির মাঝে গিয়ে শৈশবের আনন্দকে কিছুটা বাস্তবতার প্রেক্ষিতে স্পর্শ করতে পারে।

এমনিভাবে মননশীলতার বিকাশে আমাদের সম্ভাবনাময় প্রজন্মের মানসিক বিকাশে, স্বপ্ন বিনির্মাণে সকলকে ভাবতে হবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সম্ভবনাকে ছড়িয়ে দিতে দেশের প্রান্ত থেকে প্রান্তে–বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলার গ্রাম-গ্রামান্তরে গড়ে তুলতে হবে সামাজিক ও গণপাঠাগার। যেখানে আমাদের প্রজন্মের জন্য স্বপ্নের বীজ বপণ হবে, স্বপ্ন বিকশিত হবে এবং আনন্দের সঙ্গে মননশীলতার আলোর রংধনুতে রাঙাবে তাদের মনোজগৎ। নিশ্চয়ই এসব প্রচেষ্টায় যোগ হবে আমাদের হারিয়ে যাওয়া খেলাধুলা ও মেলা-পার্বণ-উৎসব, যা হয়তো আটপৌরে কিন্তু যা একান্তই আমাদের লোকায়ত ঐতিহ্য।

পরিচিতি: লেখক, গবেষক, পরিবেশবিদ

একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও বইপড়া আন্দোলন

রত্নদীপ দাস (রাজু)

গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা:

সবুজের সমারোহ, হাওর-বেষ্টিত সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য সমৃদ্ধ একটি গ্রাম মুক্তাহার। গ্রামটি হবিগঞ্জ জেলাধীন নবীগঞ্জ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় হতে এক কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত। 'মুক্তাহার' নামের আভিধানিক অর্থ মুক্তার মালা। অর্থাৎ এই গ্রামের মানুষজন চরিত্রে, বৈশিষ্ট্যে গুণবান। বর্তমান সময়ে একথা শতভাগ সত্যি না হলেও গ্রামের অতীত ইতিহাস বলে, এই গ্রামের পূর্বজগণ মানবিক গুণে গুণান্বিত ও সামাজিক-রাজনৈতিক জ্ঞানসমৃদ্ধ মানুষ ছিলেন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে বাণীকান্ড দাশ অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭১-এর সুমহান মুক্তিযুদ্ধে গ্রমের রবীন্দ্র চন্দ্র দাসসহ ১১ জন বীর পুত্র মুক্তিযুদ্ধের সশস্ত্রপর্বে সিংহরূপ সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও গ্রামের খুঁটি অনেক মজবুত। একসময় নৌকাবাইচ, যাত্রাপালা, পালাগান, কবিগান, ঘাটুগান, ফুটবল, হাডুডু, কাবাডি প্রভৃতি ছিল প্রধান সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। কালের বিবর্তনে এখন ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টনসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে রয়েছে–শতবর্ষেরও বেশি সময়ের পুরোনো শ্রীশ্রী গোপাল জিউর আখড়া, মুক্তাহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (১৯৫৬), মুক্তাহার কমিনিউটি ক্লিনিক (২০০০) প্রভৃতি।

গ্রন্থাগার হচ্ছে সাহিত্য ও বিনোদনের একটি অংশ এবং জ্ঞানের আশ্রম। আলোকিত মানুষ তৈরিতে গ্রন্থাগারের অবদান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ইতোমধ্যে যুগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্রামের শিক্ষার হার তুলনামূলকভাবে বেড়ে যাওয়ায় এলাকার খ্যাতিমান শিক্ষক ও বরেণ্য ব্যক্তিত্ব বীর মুক্তিযোদ্ধা রবীন্দ্র চন্দ্র দাস একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। এলাকার নর-নারী নির্বিশেষে সৃজনশীল সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন, মানবিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধকরণ, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক-সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও অবক্ষয় রোধকল্পে গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। এই ধারণার আলোকে রবীন্দ্র চন্দ্র দাস মহাশয়ের পারিবারিক সংগ্রহশালা 'সনাতন-দীননাথ পারিবারিক সংগ্রহশালা'কে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করতে পারিবারিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় [দীননাথ দাস (১৮৬০-১৯৪৩) রবীন্দ্র চন্দ্র দাস মহাশয়ের পিতামহ এবং সনাতন দাস (১৮৫৫-১৯৩৮) দীননাথ দাসের অগ্রজ]। এরই প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এ-ইউনিয়নের একমাত্র গ্রন্থাগার, যা বর্তমানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র কর্তৃক নিবন্ধিত নবীগঞ্জ উপজেলার একমাত্র গণগ্রন্থাগার 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার' (২০১৫)। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যেসকল ছোটো-বড়ো গ্রন্থাগার প্রান্তিক মানুষের পাঠের চাহিদা পূরণ করছে এবং আলোকিত মানুষ তৈরি করতে আলোর বাতিঘর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে, সেইসব

গ্রন্থাগারের অন্যতম হলো 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার'।

'রবীন্দ্র গ্রন্থাগারে পড়ি বই/ জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হই।' স্লোগানকে ধারণ করে ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর এক নতুন দিগন্তের পথে যাত্রা শুরু করে 'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার'। গ্রন্থাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত কিংবদন্তি, কীর্তিনারায়ণ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা, প্রখ্যাত সমাজসেবক, রবীন্দ্র চন্দ্র দাসের বাল্যবন্ধু সদ্যপ্রয়াত মেজর (অবঃ) সুরঞ্জন দাস। গ্রন্থাগারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরই পাঠক-সমাবেশ বাড়তে থাকে। বছরখানেকের মধ্যেই পাঠকের সমন্বয়ে গঠন করা হয় গ্রন্থাগারের পরিচালনা পর্ষদ। গ্রন্থাগারের পরিচালনা পর্ষদের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের পাঠকসেবা বৃদ্ধি এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় 'পাঠক ফোরাম' এবং 'ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ফোরাম' নামক দুটি সহযোগী সংগঠন গঠন করা হয়। প্রতিবছর গ্রন্থাগার পরিচালনা পর্ষদের উদ্যোগে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা বা ছাত্র-ছাত্রীদের মেধাবিকাশে কাজ করে এমন একটি কর্মসূচি পালন করা হয় এবং 'কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা' অনুষ্ঠিত হয়।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ফোরামের উদ্যোগে এবং প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালনা পর্ষদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিবছর একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। তাছাড়া প্রতিবছর ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন করতে গ্রন্থাগারের সদস্যদের নিয়ে একটি শিক্ষা ভ্রমণেরও আয়োজন করা হয়। জাতীয় গ্রন্থাগার দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন করা হয়। বইপাঠ, পাঠক সৃষ্টি, অর্জিত শিক্ষার সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ, সামাজিক চেতনা ও মূল্যবোধের বিকাশ, অপসংস্কৃতির বিপরীতে সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চা এবং বইপড়া আন্দোলনকে গতিশীল করার লক্ষ্যে মাসিক একটি আলোচনা সভা এবং বইপড়া বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ-ছাড়া পাঠকদের মধ্য থেকে লেখক সৃষ্টি করার লক্ষ্যে 'মুক্তাক্ষর' নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হচ্ছে। এই বছর থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি 'সেরা পাঠক সম্মাননা' দেওয়ার। তাছাড়া বই পড়ায় ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষকে আগ্রহী করতে নেওয়া হচ্ছে চমৎকার কিছু উদ্যোগ।

গ্রন্থাগারের সহস্রাধিক বই, মানসম্মত একটি গঠনতন্ত্র এবং ১১১ জন সদস্য রয়েছেন। আমাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ নভেম্বর সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' উক্ত গ্রন্থাগারের নিবন্ধন প্রদান করে। গ্রন্থাগারের স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠাতার পরিবার থেকে প্রদানকৃত জমি দেওয়া হয়। বিগত ৮ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব এনামুল হাবীব গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ঘরের উদ্বোধন করেন। এ-পর্যন্ত গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন–হবিগঞ্জ-১ আসনের তৎকালীন সংসদ সদস্য এম এ মুনীম চৌধুরী বাবু (২০১৭), সংরক্ষিত আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট আমাতুল কিবরিয়া কেয়া চৌধুরী (২০১৭), নবীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মো. ফজলুল হক চৌধুরী সেলিম (২০২১), উপজেলা পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট গতি গোবিন্দ দাশসহ বিভিন্ন

জনপ্রতিনিধি, কবি, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও অনেক গুণিজন।

'বীর মুক্তিযোদ্ধা শ্রী রবীন্দ্র চন্দ্র দাস গ্রন্থাগার' আমাদের একটি স্বপ্নের নাম। যে-স্বপ্নকে রূপায়িত করতে কাজ করে যাচ্ছে এলাকার একঝাঁক গ্রন্থপ্রেমিক তরুণ যুবক। এলাকার ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রন্থাগারমুখী ও বই পড়ায় অভ্যাস গড়ে তুলতে আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। গ্রন্থাগারের যেকোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে আমরা বদ্ধপরিকর। সকল স্থানেই কিছুসংখ্যক মানুষ থাকেন, যারা সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের অনুশীলনে অভ্যস্ত। যা আমাদের দেশে 'ভিলেজ পলিটিক্স' বা 'গ্রাম্য রাজনীতি' নামে পরিচিত। এ-জাতীয় লোকেরা স্বভাবতই এলাকার বিভিন্ন মহৎ উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। এখানেও এর ব্যত্যয় ঘটে নি। যুবকদের এই মহৎ উদ্যোগ কোনো কোনো মানুষের হৃদয়কে লোহার শলাকার মতোই বিদ্ধ করে। প্রতিনিয়তই তারা নানাভাবে গ্রন্থাগার-সংশ্লিষ্ট আলোর পথের অভিযাত্রী যুবকদের বিপথগামী করার চেষ্টা করে।

সমাজের এই সব কলুষিত ঘৃণ্য ব্যক্তিদের 'দুরভিসন্ধি চাল'কে ব্যর্থ প্রমাণ করে আমরা সমাজের সকলকে আলোর পথের দিশা দেখাতে দৃপ্তপায়ে হেঁটে যাচ্ছি। আলোর পথের অভিযাত্রী সাহসী একঝাঁক যুবকের মধ্যে অন্যতম হলো–গৌতম দাস, ঝিনুক দাস, সৈকত দাস, অপূর্ব দাস, রনি দাস, মিশু দাস, সাগর দাস জনি, দেবাশীষ দাস রতন, দ্বীপ দাস, নিউটন দাস, দীপ্ত দাস, বিপ্লব দাশ, জনি দাস, কনিক দাস শুভ, রসেন্দ্র দাস, স্বপন দাস (এস ডি), রিপন দাশ প্লাবন প্রমুখ। আরও অনেকেই রয়েছেন, যাঁরা সকলেই আমার একান্ত আপনজন।

জ্ঞানার্জন করতে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বই পড়ার উৎকৃষ্ট স্থান হচ্ছে গ্রন্থাগার। একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার একটি এলাকাকে আলোকিত করতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমরা সেই আলোকিত মানুষ তৈরির দ্বার উন্মোচিত করার চেষ্টা করেছি। আমাদের এলাকার তরুণ প্রজন্ম প্রকৃত জ্ঞানান্বেষণের মাধ্যমে আলোকিত মানুষ হয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়নে অবদান রাখবে এই প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও করণীয় নির্ধারণ:

ব্রিটেনে ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম গণগ্রন্থাগার আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার ফলে গণশিক্ষা-ব্যবস্থা ব্যাপক প্রসারলাভ করে। সেই আদলে ভারতবর্ষে তৎকালীন জমিদার, সমাজসেবক, সরকারি কর্মকর্তা ও জনহিতৈষী ব্যক্তিদের উদ্যোগে গণশিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন গড়ে ওঠে। এর ঠিক এক বছর পরে ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশে (তৎকালীন অবিভক্ত বঙ্গ প্রদেশ) বেসরকারিভাবে প্রথম একটি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয় যশোরে। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে একযোগে আরও তিন জেলাসদর পর্যায়ে গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সেগুলো হলো উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি, রংপুর পাবলিক লাইব্রেরি ও বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি।

১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দটিকে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে গণ্য করা হয়। পর্যায়ক্রমে জেলা, মহকুমা ও কতক থানা পর্যায়ে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। ১৮৮৪ ও ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে যথাক্রমে রাজশাহী ও কুমিল্লা গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে চলে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় নোয়াখালী ও সিলেট পাবলিক লাইব্রেরি। এরই মধ্যে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে Press and Registration Book Act পাশ হলে গ্রন্থাগার আন্দোলন বহু গুণে গতিসঞ্চারিত হয় এবং সারা দেশের জেলা ও মহকুমা সদরে পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করে।

১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রথম কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান গণগ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একটি মাইলফলক উন্মোচন করেন। যা ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে প্রতিবছর ৫ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'জাতীয় গ্রন্থাগার দিবস' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি থেকে তা উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন কোনো গতানুগতিক আন্দোলন নয়। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বাংলাদেশের মতো জনবহুল দেশের জন্য খুবই নগণ্য। তারপরও গ্রন্থাগার আন্দোলন থেমে থাকে নি। প্রবাহিত হচ্ছে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে।

বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে বইপড়া আন্দোলন তথা পাঠাগার আন্দোলনকে ছড়িয়ে দিতে দেশের তরুণ সমাজ ও সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করে বইপাঠে উদ্বুদ্ধ করতে যেসকল আলোর যোদ্ধারা নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের প্রতি রইল হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ থেকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন–'সোনার বাংলা গড়ার জন্য, সোনার মানুষ গড়তে হবে' (০৯.০১.১৯৭৩)। আসুন স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব জন্মশতবর্ষের মাহেন্দ্রক্ষণে দাঁড়িয়ে আমরা বাংলাদেশকে সোনার বাংলাদেশ গড়ার সংকল্প করি। আর সেটাকে বাস্তবায়ন করতে হলে সোনার মানুষ গড়তে হবে। আর সোনার মানুষ গড়তে হলে বই পড়তে হবে এবং সারা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে আরও গতিশীল করতে হবে।

চীনের একটি প্রবাদ–"তুমি যদি এক বছরের পরিকল্পনা করো তাহলে শস্য রোপণ করো, তুমি যদি দশ বছরের পরিকল্পনা করো তাহলে গাছ লাগাও, আর যদি হাজার বছরের পরিকল্পনা করে থাকো তাহলে মানুষ তৈরি করো।" আসুন আমরা হাজার বছরের পরিকল্পনা করি এবং প্রকৃত মানুষ তৈরি তথা আলোকিত জাতি গঠনে কাজ করি। আলোকিত মানুষ হতে হলে জ্ঞানার্জন করতে হবে। আর জ্ঞানার্জন করতে হলে অবশ্যই জ্ঞানের ভাণ্ডার গ্রন্থাগারে যেতে হবে।

আধুনিক জীবনে পাঠাগার

তাজুল ইসলাম খান

মানুষের এগিয়ে চলার পথে পাঠাগার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এখানে, মানুষের জীবন থেকে ধন-সম্পদ হারিয়ে যায়, কিন্তু মন হারায় না–যদি সে নিয়মিত পাঠাগারে অথবা ঘরে বসে সাহিত্যসাধনা করে। সাধনার বড় অংশ হলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান–যার মাঝে পড়ে আছে নির্ঘুম ছোটো-বড় পাঠাগার। জ্ঞান অন্বেষণের জন্য এই পাঠাগারই একমাত্র পথ, যা মানুষকে সুন্দর পথে চলার জন্য সাহায্য করে। এই চলার পথকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য দেশের আনাচে-কানাচে এবং নিজস্ব পরিসরে অনেক পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। যেখানে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের দশকে অনেক পাঠক ছিল; কিন্তু আশির দশক থেকে তা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে।

কিন্তু কেন?
তাহলে কি লেখাপড়া শিখে, উচ্চ শিক্ষিত হয়ে এই পাঠাগারের পাঠক না হয়ে পাঠাগারবিমুখ হয়ে পড়েছি! সেটা তো মানবসমাজের কিংবা পাঠকসমাজের কাম্য নয়।

আজ বিজ্ঞানের এই ধাপে, বিজ্ঞানের এই ছোঁয়ায় আমাদের অনেক অগ্রগতি হয়েছে; তাতে করে পাঠক বাড়ে নি। ফেসবুক-ইউটিউবের মাধ্যমে কিছু প্রিয়-অপ্রিয় শব্দ চোখে ভাসে–যা থেকে তরুণ সমাজ ভালোটা না নিয়ে মন্দটা বেছে নেয়। তরুণ সমাজ বইকে বেছে না নিয়ে ওই সমস্ত ডিজিটাল মাধ্যমকে বেছে নেয়, তাই পাঠাগার তৈরি হলেও পাঠক তৈরি হয় না। এর জন্য, কিংবা এই অবস্থানের জন্য দায়ী কে–আমাদের সমাজ ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক না অভিভাবক? এখানে কাউকে দায়ী করা যায় না। এখানে একটা কথা বলতে হয়, যে অভিভাবকদের উদাসিনতাকে দায়ী করা যায়। একটা সমাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটা পাঠাগারের ভূমিকা অপরিসীম। যে-সমাজে পাঠাগার নাই, পাঠকসমাজ নাই, সে-সমাজ এগিয়ে যেতে পারবে না। সমাজকে এগিয়ে নিতে হলে আমাদেরকে এখন থেকেই আবার নতুন করে পাঠাগারের দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং পাঠকসমাজ তৈরিতে সচেতন হতে হবে।

পাঠকসমাজ তৈরি করতে হলে প্রথমে নিজ নিজ ঘর থেকে ছেলে-মেয়েদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে; ইচ্ছা-অনিচ্ছার মধ্যেও আমাদের পাড়া-প্রতিবেশিদের বই দিয়ে আকৃষ্ট করতে হবে। কেউ যদি বই না-পড়তে চায় তবে ভালো ভালো কথাগুলো 'আন্ডারলাইন' করে অভিভাবকদের বলতে হবে–তোমরা এই লাইনগুলো পড়ে একবার দেখ, ভাল লাগলে পড়বে, না লাগলে পড়বে না। এইভাবে পাঠকসমাজ বাড়াতে হবে।

প্রথমে তারা বিরক্ত হতে পারে। তাই অভিভাবক ও শিক্ষককে ধৈর্য ধরে বলতে হবে–তোমরা চেষ্টা করো। পাঠক তৈরিতে এই পথটা কাজে লাগতে পারে কিছুটা, তবে যেহেতু তরুণদের একটি বৃহৎ অংশ ডিজিটাল মাধ্যমে অভ্যস্ত, সেহেতু পাঠাগারকে ডিজিটাল করলে ও বইকে ডিজিটাল মাধ্যমে রূপান্তরের মাধ্যমে তাদের সামনে উপস্থাপন করলে আবার পাঠক তৈরি হবে। সময়ের প্রবাহকে অস্বীকার না করে বরং তার দেওয়া বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সুযোগগুলো ব্যবহার করতে হবে।

জীবনদর্শনে পরিবারের কথা না বললেও চলবে। দর্শনের যে-কোনো দিক জানতে হলে তাকে পাঠাগারমুখী হতে হবে। একটা মানুষ জীবনে অনেক কিছুই করতে পারে–যদি তার মধ্য জীবনদর্শন থাকে। আর এই জীবনদর্শন পেতে হলে সমাজে পাঠাগারের বিকল্প নেই।

পাঠাগার মানেই জীবন।
জীবন মানেই দর্শন।
দর্শন মানেই বই।
বই মানেই পাঠাগার।

পাঠাগার-ভাবনা ও আমার অভিজ্ঞতা

সাখাওয়াত হোসেন

বয়স তোমার শরীরের বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটাবে আর বই ঘটাবে অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। একটি বই তোমার ধ্যানধারণা এমনকি আইডিওলজি পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম। একজন শিক্ষিত মানুষ আর একজন নিরক্ষর মানুষ যদি একসঙ্গে ব্যবসায়ে নামে তবে এক বছরের মাথায় দুজনের লভ্যাংশ হবে আকাশপাতাল তফাৎ।

আমিও এই খেলায় মত্ত হই, সমাজের তরুণদের মন-মানসিকতা চিন্তা করে একটি সামাজিক পাঠাগার খুলে বসি। আমার উদ্দেশ্য ছিল তাদের তারুণ্যের সময় ও শক্তি যেন কোনও মন্দ কাজে ব্যয় না হয়। তাই মূল্যবোধ শিক্ষার জন্য যেমন ধর্মীয় গ্রন্থ প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি পড়াশোনায় মনোযোগী করার জন্য বিভিন্ন মোটিভেশনাল বই এবং চিন্তার জগতের বিস্তৃতির জন্য ভালো ভালো উপন্যাস সংগ্রহে রেখেছি। বিজ্ঞানের বইও রয়েছে।

তরুণ তরুণীদের জন্য শুরু হলেও একটা সময়ে সমাজের শিক্ষিত বয়োবৃদ্ধ মা, চাচি, দাদিরা আমার পাঠাগারের বই পড়ার আগ্রহ দেখান। তাদের উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করা শুরু করলাম সংসারে সুখ, শান্তি বজায় রাখার বিভিন্ন বই। মা তাঁর শিশুদের কিভাবে মানুষের মতো গড়ে তুলবেন, শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে পুত্রবধূর সম্পর্ক কেমন হবে এমন নানান ধরনের বই সংগ্রহ করা শুরু করি।

আর আমি অবাক হলাম; এত ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি যা আমার কাজ করার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে দ্বিগুণ। আমি নিজেই প্রথম প্রথম সবার ঘরে ঘরে গিয়ে বই দিয়ে আসতাম। আস্তে আস্তে অনেকে নিজেই আসা শুরু করল বই নিতে। পাশের গ্রামের একটা ছেলে প্রতি সপ্তাহে বই নিতে আসত, এখন তারা নিজেরাই এমন একটা পাঠাগার গড়ে তুলেছে। আমি সবরকম পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করার চেষ্টা করেছি।

তবে আমার বই আর আলমারি কেনার জন্য নিজের তেমন কোনো টাকাই খরচ করতে হয় নি। সমাজের যেসকল ভাই-চাচারা স্বাবলম্বী এবং যারা প্রবাসী, তাঁরা আমাকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করেছেন।

বই যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য এবং যাতে না হারায় তার জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছি, যিনি নেবেন তাঁর নাম ও তারিখ এবং ফিরিয়ে দেওয়ার তারিখ সঙ্গে সঙ্গেই লিখে রাখতে হয়।

আমি আশা করছি এই পাঠাগারের পাঠকদের মধ্য থেকেই এমনকিছু যোগ্য, মেধাবী, আর চারিত্রিক গুণসম্পন্ন মানুষ বের হবেন, যারা আগামীর বাংলাদেশ গড়তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা

শাহিন আহমেদ

সূচনা: মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। তার অনন্ত জিজ্ঞাসা, অসীম কৌতুহল। তার এই সকল প্রশ্নের সমাধান আর অন্তহীন জ্ঞান ধরে রাখে বই। শতাব্দী থেকে শতাব্দী ধরে মানুষের সকল জ্ঞান জমা হয়ে রয়েছে বইয়ের ভেতর। অন্তহীন জ্ঞানের উৎস হলো বই, আর সেই বইয়ের আবাসস্থল হলো পাঠাগার। মানুষের হাজার বছরের ইতিহাস পুঞ্জিভূত হয়ে রয়েছে পাঠাগারের একেকটি তাকের ভেতর। পাঠাগার হলো সময়ের খেয়াঘাট, যার মাধ্যমে মানুষ সময়ের পাতায় ভ্রমণ করতে পারে। এই বইয়ের ভাণ্ডারে যেন সঞ্চিত হয়ে আছে মানব-সভ্যতার প্রতিটি হৃদস্পন্দন। প্রাচীন শিলালিপি থেকে আধুনিক লিপির গ্রন্থিক স্থান হলো পাঠাগার। একটি গ্রন্থাগার মানুষের জীবন পাল্টে দেবার জন্য যথেষ্ট। গ্রন্থ কিংবা গ্রন্থাগার মানুষের মনের খোরাক জোগায়। গ্রন্থাগার হলো শ্রেষ্ঠ আত্মীয়–যার সঙ্গে সম্পর্ক সর্বদাই ভালো থাকে।

পাঠাগারের ইতিহাস: পাঠাগারের ইতিহাস বেশ পুরোনো। আজকের পৃথিবীকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছে যে-পাঠাগার তা প্রতিষ্ঠার পেছনে রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের অনেক আগে থেকেই পাঠাগারের প্রচলন ছিল। তখন মানুষের জ্ঞান সংরক্ষিত হতো পাথর, পোড়ামাটি, পাহাড়ের গা, প্যাপিরাস, ভূর্জপত্র বা চামড়ায়। আর এগুলো সংরক্ষণ করা হতো লেখকের নিজ বাড়িতে, মন্দির, উপাসনালয় বা রাজকীয় ভবনে। মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া, ইরাকের বাগদাদ, দামেস্ক, প্রাচীন গ্রিস ও রোমে প্রাচীন পাঠাগারের নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। ৫,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে মিশরে পাঠাগারের অস্তিত্ব ছিল। ভারতে প্রাচীনকালে পণ্ডিতদের ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল। উপমহাদেশের তক্ষলীলা এবং নালন্দায় সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে উঠেছিল। আব্বাসীয় ও উমাইয়া শাসনামলে 'দারুল হকিমা' নামক গ্রন্থাগার ইউরোপকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে।

পাঠাগারের সুবিধা: জ্ঞানের যেমন সীমা নেই, তেমনি পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তারও কোনও সীমারেখা নেই। সমৃদ্ধ পাঠাগার যেন জ্ঞানের নীরব সমুদ্র। তৃষিত পাঠকের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করাই পাঠাগারের উদ্দেশ্য। পাঠাগার হলো কালান্তরের সকল গ্রন্থের মহাসম্মেলন। যেখানে এক হয়ে গেছে অতীত, ভবিষ্যৎ আর বর্তমান। সন্ধানী হৃদয় পাঠাগারে অতীত-বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের সেতু রচনা করে। একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার, একটি জাতির উন্নতির সোপান। পাঠাগার নারী, পুরুষ, বয়সের কোনও বাধা রাখে নি। যেকেউ চাইলে এখানে এসে জ্ঞানের অতল সমুদ্রে অবগাহন করতে পারে। পাঠাগারের সারি সারি তাকে জমে আছে সহস্রাব্দের কথামালা।

পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা: বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যেমন খাবার দরকার, তেমনই

জীবনকে গতিময় করার জন্য দরকার জ্ঞান। কারণ জ্ঞান হলো মনের খোরাক বা খাবার। জ্ঞানের আধার হলো বই আর বইয়ের আবাসস্থল হলো পাঠাগার। প্রতিটা সমাজে যেমন উপাসনালয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল দরকার তেমনই পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। পাঠাগার মানুষের বয়স, রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী বই সরবরাহ করে থাকে। আর তাই সচেতন মানুষমাত্রই পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। পৃথিবীর যত মহান মনীষী আছেন তাঁদের সবাই জীবনের একটা বড় সময় পাঠাগারে কাটিয়েছেন। সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সংস্কৃতিসহ সব ধরনের জ্ঞানের আধার হতে পারে একটি গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার একটি জাতির বিকাশ ও উন্নতির মানদণ্ড। বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা ছাড়া জাতীয় চেতনার জাগরণ হয় না। আর তাই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পৃথিবীর বহু দেশ পাঠকের চাহিদা পূরণের জন্য গড়ে তুলেছে অগণিত গ্রন্থাগার। শিক্ষার আলোবঞ্চিত কোনও জাতি পৃথিবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে নি।

উপসংহার: পাঠাগার হলো মানবসভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর, সেই সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে তার প্রকৃত উপকার ভোগ করা যায়। জীবনে পরিপূর্ণতার জন্য জ্ঞানের বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণ করতে রয়েছে পাঠাগার। একটি সমাজের রূপরেখা বদলে দিতে পারে একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার। মনকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পাঠাগারের অবদান অনস্বীকার্য। তাই শহরের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রাম-মহল্লায় পাঠাগার গড়ে তোলা প্রয়োজন। যাতে আমরা খুব শীঘ্রই লাভ করতে পারি জ্ঞানী এক সমৃদ্ধ জাতি, যার জ্ঞানার্জনের অন্যতম পথ ছিল পাঠাগার।

পাঠাগার হোক গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়

বুলা বিশ্বাস

'পাঠাগার' শব্দটি বিশ্লেষণ করলে, চোখের সামনে যে-ছবিটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে, তা হলো এক বা ততোধিক ছোটো অথবা বড় কক্ষ, তাতে থরে থরে তাকে সাজানো পুস্তকের সম্ভার। বিষয় অনুযায়ী, সিরিজ অনুযায়ী, ভলিউম অনুযায়ী বই তাকে সাজানো থাকে। আর সেই পুস্তকসমূহ ঘিরে রয়েছেন নানান স্বাদ গ্রহণে আগ্রহী গ্রন্থকীটেরা। তাঁদের সাহায্য করার জন্য থাকেন, গ্রন্থাগারিকগণ।

শুধু পাঠ্যপুস্তক পড়লেই জ্ঞানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয় না। সেখানেও 'ডায়েটিং'-এর দরকার। সুষম খাদ্য না পেলে যেমন শরীর সুস্থ থাকে না, উপযুক্ত এবং পরিমাণ সঠিক না থাকলে যেমন বল পাওয়া যায় না, ঠিক তেমনই পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে রেফারেন্স বইয়ের সমাহার না ঘটলে সেই বিষয়টা সঠিক পুষ্টি পায় না। শুধু তাই নয়, পাঠ্যপুস্তক-বহির্ভূত যত বই পড়তে পারা যাবে, তা পাঠ করলে, শুধু যে চিন্তাশক্তি উর্বর হয় তা নয়, বহু বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা যায়।

এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত পাঠাগারযাত্রী হওয়া। পাঠাগারে যত বইয়ের সম্ভার থাকে, বাড়িতে তো তত বই সবার থাকে না। তাই পাঠাগারের সদস্য হওয়া খুব জরুরি। এতে পড়ার আগ্রহ যেমন বাড়ে, তেমন নিত্যনূতন পুস্তক পাঠে, সঠিক শব্দচয়ন, নতুন নতুন শব্দের সঙ্গে আলাপ, বাক্যগঠন দিনে দিনে শক্তিশালী হতে থাকে। ধীরে ধীরে বইয়ের সঙ্গে একটা সখ্য, প্রেমের নিগূঢ় বন্ধন তৈরি হয়।

আমরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে সম্মান অর্জন করি। এক স্তর থেকে আরেক স্তরে উন্নীত হতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সার্টিফিকেট পাই। ফাইল ভর্তি করে সেসব সম্মান, সংগ্রহের তালিকায় জমা করে রাখি। এরপর ডক্টরেট, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট, আরো আরো গবেষণার ক্ষেত্রে যেগুলোর দ্বারস্থ আমাদের হতেই হয়, তা হলো পাঠাগার।

নেপথ্যে থেকে পাঠাগারই কিন্তু অভিভাবকের মতো আমাদের শিক্ষার মানকে উন্নত থেকে তর, তম করে তোলে। পাঠাগার জনমত নির্বিশেষের জন্য। কিন্তু স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা যে যার গুণগতমান অনুযায়ী করে থাকে। পাঠাগারে বই পড়ার জন্য বিরাট কিছু পড়াশোনা যে জানতে হবে তার কোনও মানে নেই। সামান্য লেখাপড়া করতে পারলেই সে পাঠাগারের সদস্য হতে পারে। এরপর যে যার জ্ঞান অনুযায়ী গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন।

তবে খুব ছোটো থেকে গ্রন্থাগারের সদস্য করে দিলে সেই শিশুর বই পড়ার অভ্যাস গড়ে

ওঠে। ছোটোরা ছোটো ছোটো গল্পের বই, কমিকস, গোয়েন্দা, ভূতের বই পড়তে খুব ভালোবাসে। ধীরে ধীরে ওরা ওদের চাহিদা অনুযায়ী বই পড়ার সুযোগ করে নিতে পারে। এরপর তো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা আরও উচ্চশিক্ষার জন্য পাঠাগার ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

পাঠাগার সর্বসাধারণের জন্য। শুধু কি বই থাকে, অনেক বছর আগের পুরোনো গ্রন্থ, দলিল, দস্তাবেজ সব সুন্দরভাবে সংরক্ষিত থাকে। তবে সেগুলো অবশ্য জাতীয় গ্রন্থাগারেই রয়েছে। বিভিন্ন রকম রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে আজও সেগুলো গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত আছে।

আর থাকে প্রতিদিনের খবরের কাগজ। সবরকম, সব ভাষার খবরের কাগজ গ্রন্থাগারে রাখা হয়। বয়স্ক ব্যক্তিরা সকালবেলায় পাঠাগার খোলার সঙ্গে সঙ্গে এসে জড়ো হন। বিরাট বড় বড় টেবিলের চারপাশে চেয়ার দিয়ে রিডিং সেকশন সাজানো থাকে। সেখানে ওনারা নিজেদের মনে সংবাদপত্র পড়ার সুযোগ পান।

প্রায় সব পাঠাগারেই দুটো সেকশন থাকে। রিডিং এবং লেন্ডিং। এই দুই রকম কার্ড রয়েছে। রিডিংয়ের জন্য টাকা জমা রাখতে হয় না। লেন্ডিংয়ের জন্য পাঠাগারে একটা নির্দিষ্ট টাকা জমা রাখতে হয়। কার্ড উইথড্র করে নিলে, সেই জমা টাকা ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়।

বেশিরভাগ পাঠাগারে একটা নির্দিষ্ট মূল্যের মাসিক মেম্বারশিপ নেওয়া হয়। তবে গ্রামগঞ্জে গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য পাঠাগারে বসে বই পড়তে গেলে কোনও সদস্যপদ গ্রহণ করতে হয় না। বহু শুভাকাঙ্ক্ষী এই পাঠাগার পরিচালনার ব্যয়ভার নিজেরাই গ্রহণ করেন। পাঠাগার খোলা এবং বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে।

মোটামুটি এইসব নিয়মাবলী মানলে, পাঠাগারের সদস্য হওয়া খুব কঠিন কিছু নয়। আর যত বেশি পাঠ, তত বেশি জ্ঞান অর্জন–একথা আমরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করি। সেই অর্থে ‘পাঠাগার গণমানুষের বিশ্ববিদ্যালয়’ এই মূল্যবান কথাটি মানতে আমাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না।

আমাদের বইপড়া এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ

আউয়াল আনোয়ার

ফেব্রুয়ারি মাস, আমাদের ভাষার মাস। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং বইমেলা আমাদের দ্বারে কড়া নাড়ছে। সারা বছর বই নিয়ে মাতামাতি না থাকলেও ভাষার এই মাসটিকে ঘিরে বাঙালি জাতি বই নিয়ে কমবেশি মেতে ওঠেন উৎসবে। বাংলা একাডেমির 'একুশে গ্রন্থমেলা'র পাশাপাশি দেশের নানা প্রান্তে বইমেলার চমৎকার সব আয়োজন চোখে পড়ে। প্রচুর সংখ্যক দর্শনার্থী এসব মেলায় এসে আনন্দ খোঁজেন। অনেকে বইও কেনেন। কবি-সাহিত্যিক-লেখকের নতুন নতুন বই প্রকাশিত হয় বিচিত্র বিষয়ে। প্রকাশকেরা ব্যস্ত থাকেন নতুন বই প্রকাশে। হাজারো বইয়ের ভিড়ে কালজয়ী কিছু বইও আমরা হাতে পেয়ে থাকি এ-সময়টায়। লেখক-পাঠকের মেলবন্ধন চলে মাসজুড়ে। আয়োজন চলে নানা বক্তৃতা ও কথামালার। শহিদ মিনার জুড়ে আয়োজন চলে আবৃত্তি, গান, নাটকসহ নানা অনুষ্ঠানের। বাঙালি এসময় নিজেকে, নিজের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করে নতুনভাবে। নতুন প্রজন্ম তার ইতিহাসকে খুঁজে পায়। মাসটি বিদায় নেবার পরপরই এর মূল আবেদন কমতে থাকে আবারও। কিছু মানুষ আবার এ-মাসটিকে উপজীব্য করে বইয়ের জগতের একজন নান্দনিক মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে প্রয়াস পান। বইকে ভালোবেসে ছড়িয়ে দেন বইয়ের আলো চারিদিকে।

পৃথিবীর নানা দেশের মানুষ এখনও বই পড়েন। গাড়িতে, বাসে, ট্রেনে, প্লেনে, জাহাজে চলমান অবস্থায়ও বই পড়েন। একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে বই উপহার দেন। দুরে কোথাও ভ্রমণে গেলে তাদের সঙ্গে থাকে অন্তত একটি বই। আমাদের দেশের অনেকের ভেতর এমন অভ্যাসটি এখনও বিদ্যমান। দৃশ্যটি বড়ই সুখকর। নতুনতর অনেক কিছুর ভিড়ে তাই তো বই পড়া কখনও শেষ হবার নয়। অথচ, আমাদের দেশের অধিকাংশ বইয়ের লাইব্রেরি দিন দিন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। অবহেলায় থাক থাক বইগুলো নীরবে পড়ে থাকছে অযত্ন অবহেলায়। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় লাইব্রেরি থাকলেও তার অধিকাংশই এখন ধুলোবালি ও উইপোকার দখলে। সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকার অপচয় হচ্ছে মাত্র। লাইব্রেরিয়ান আছেন, অথচ তিনি তার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন না। কমিটিগুলো সক্রিয় নয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর লাইব্রেরিতে শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরিমুখো করা হচ্ছেরননা। অনেকাংশে শিক্ষকেরাও লাইব্রেরিতে যান না, বই পড়ার আগ্রহ দেখান না, বই পড়েনও না। যা অতীব দুঃখজনক ও জাতির জন্য লজ্জাকর। লাইব্রেরিয়ান অন্য কাজে ব্যস্ত থাকছেন। বিভিন্ন লাইব্রেরির বই লুট হয়ে যাচ্ছে। অনেক জায়গায় লাইব্রেরির তত্ত্বাবধায়ক বেতন-ভাতা ঠিকমত না পেয়ে স্বল্প দামে বইগুলো বিক্রি করে দিচ্ছেন। অনাদরে অবহেলায় আসবাবগুলো জরাজীর্ণ। এমন নানা উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জানেই না, তাদের প্রতিষ্ঠানে একটি বইয়ের লাইব্রেরি রয়েছে। শহরে বাজারের

বইয়ের লাইব্রেরিগুলো গাইডবই দিয়ে ঠাসা। সেখানে সাহিত্যমূল্য রয়েছে এমন কোনো বই পাওয়া যায় না। একসময় কিছু সাহিত্যের বইপুস্তক পাওয়া গেলেও বর্তমানে তা একপ্রকার উঠেই গেছে বলা চলে।

পড়াশোনার জন্য নানা প্রযুক্তি তৈরি হলেও বইয়ের বিকল্প এখনও বই-ই। কাগজের পাতার যে সোঁদা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ, তা পাঠককে নিবিষ্ট করে রাখে প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে, শব্দে শব্দে। কাগজের পাতায় পাতায় একধরনের মায়া খেলা করে, ভালোবাসায় আবিষ্ট করে রাখে। তাই তো, আমরা এখনও কমবেশি বই পড়ি। সারা বছর আমরা যদি সেই আগের মতো বইকে, পাঠাভ্যাসকে জনপ্রিয় করতে চাই, তাহলে আমাদের মন-মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। জাতীয়ভাবে শিক্ষার প্রতিটি স্তরে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে গড়ে তুলতে হবে। এ এক ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। বইকে কেন্দ্র করে জাতীয় জাগরণ ঘটাতে হবে। সামাজিকভাবে আমরা সাধারণ মানুষ নানাভাবে বইকে, পাঠাভ্যাসকে জনপ্রিয় করতে নানামুখী কর্মসূচি হাতে নিতে পারি খুব সহজেই। এজন্য দরকার দেশের নেতৃস্থানীয় মানুষের সদিচ্ছা, শিক্ষক সমাজের সচেতন দায়িত্বশীল আচরণ। কর্তৃপক্ষের নিরলস তদারকিতে সচল হয়ে উঠতে পারে এমনতর মহান কর্মযজ্ঞ। শুধু একটি দিবস দায়সারাভাবে পালন করলেই চলবে না। একে গুরুত্ব দিতে হবে, অবহেলা করা যাবে না কোনোভাবেই। সরকারি লাইব্রেরি থেকে অবহেলার চিহ্নগুলো মুছে দিতে হবে।

বইকে জনপ্রিয় করতে আমরা সারা বছর শিশুদের হাতে বই তুলে দিতে পারি। উপহার হিসেবে বইকে বেছে নিতে পারি। নানা উপলক্ষ্যে বইকে উপহার হিসেবে বেছে নিয়ে একটি জ্ঞানবান্ধব জনসমাজ গড়ে তুলতে পারি। পাড়া-মহল্লার লাইব্রেরিকে সময় দিয়ে পাঠাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তুলতে পারি। নিজের পরিবারের সদস্যদের 'বইবন্ধু' হিসেবে গড়ে তুলতে পারি পরম ভালোবাসায়। বাড়িতে, অফিস-আদালতে, দোকান-প্রতিষ্ঠানে বইয়ের সংগ্রহ গড়ে তুলতে পারি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ নানা প্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামুলক বিষয়ের পুরস্কার হিসেবে বইকে বেছে নিতে পারি, বাধ্যতামুলকভাবে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কিংবা সমাজের সর্বত্র বইয়ের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করতে এজন্য রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

আমরা যারা বইমেলায় যাই, তারা যেন শুধু বইমেলায় আড্ডা না দিই, অন্তত একজন মানুষ একটি করে হলেও যেন বই কিনি। মেলায় আগত অতিথিরা শুধুমাত্র বক্তৃতা দিয়েই যেন চলে না যাই, একটি করে হলেও যেন বই কিনি। বই পড়ার অভ্যাসটি আবার ফিরিয়ে আনি। জানি, কাজটি কঠিন, কিন্তু সম্ভবপর; অসম্ভব নয় একটুও। আরও জানি, মানুষ এখন অনেক ব্যস্ত, ভীষণ ব্যস্ত। বইপড়াকে অনেকেই এখন 'loss project' মনে করেন। টাকা-পয়সার দিকেই মানুষের এখন ঝোঁক বেশি। ভোগবাদী সমাজব্যবস্থা মানুষকে সেদিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু চূড়ান্ত বিচারে বিষয়টি বোধ হয় সঠিক নয়। আপনার প্রিয় সন্তানটি বইপাঠে অভ্যস্ত হলে আপনারই লাভ, সমাজেরই লাভ, রাষ্ট্রেরই লাভ, মনুষ্যত্বেরই জয়। নইলে

সন্তানটি আখেরে টাকা income করলেও, আপনার জন্য সে একদিন দুঃসহ বোঝা হয়ে উঠতেও পারে, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। যার নমুনা ইতোমধ্যেই সর্বত্র ক্রিয়াশীল। বইপড়া মানুষগুলো সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে, বিবেকবান মানুষ হিসেবে নৈতিকতা-নির্ভর মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে।

আসুন,আমরা বই পড়তে উদ্যোগী হই। সারা দেশের আসন্ন বইমেলাগুলো সত্যিকারের প্রাণের মেলা, মনুষ্যত্ব বিকাশের চারণমেলা হিসেবে গড়ে উঠুক। সমগ্র জাতি একটি বইপ্রিয় জাতি হিসেবে পরিচিতি পাক। সবার হাতে হাতে শোভা পাক, প্রিয় লেখকের যত বই। শিশুরা বই হাতে খেলতে থাকুক, আর হাসতে থাকুক প্রাণভরে। সহজলভ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার এ-যুগে এক বন্ধু অপর বন্ধুকে কুরিয়ার করতে থাকুক তার পছন্দের বইগুলো, বিনিময় হোক নির্মল ভালোবাসার আদান-প্রদান। আমরা আসক্ত হয়ে পড়ি বইয়ের নেশায়।

লাইব্রেরি কেন দরকার

ইমাম গাজ্জালী

ভাত খেলে পেটের ক্ষুধা মেটে বটে, কিন্তু শরীরের পুষ্টির চাহিদা মেটে না। এজন্য দরকার মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, পনির, মাখন, ডাল, ফলমুল আর শাকসবজি। তদ্রুপ, পাঠ্যবইয়ের পড়া মুখস্থ করে পরীক্ষায় ভালো নম্বর তোলা যায়, চাকরির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বড় বড় কর্মকর্তা হওয়া যায়, ক্যারিয়ার গড়া যায়, দশজনের কাছে বুক ফুলিয়ে নিজের 'সাফল্য' তুলে ধরা যায়, কিন্তু সমাজটি যে ঘোর অমানিশায় ডুবে আছে, সেখান থেকে তাকে টেনে তোলা যায় না। ওই ক্যারিয়ারিস্টদের দিয়ে অন্ধকার অমানিশায় আলো ফেলা যায় না। সুতরাং বলা যেতে পারে, ক্যারিয়ার গড়ার জন্য দরকার পাঠ্যবই মুখস্থ করা, 'ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট' হওয়া। এজন্য দরকার স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোনো। বইয়ের মৃত অক্ষরগুলো মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় বমি করে দিতে পারলেই হল, ব্যাস।

আর সমাজ যে-অন্ধকারে তলিয়ে আছে, সেখান থেকে তাকে মুক্ত করতে দরকার আলোকিত মানুষ। দরকার জ্ঞানচর্চার মুক্ত পরিবেশ; রাজনীতি, সংস্কৃতিসহ দরকার সর্বব্যাপী জাগরণ। দরকার মানুষের ভেতরের মানুষকে জাগিয়ে তোলার আয়োজন। এজন্য লাইব্রেরি ছাড়া আর কোনো কিছু সহায় হতে পারে না। তবে তার আগে দরকার, সমাজটি যে অন্ধকারে তলিয়ে আছে, সেটা উপলব্ধি করা ও স্বীকার করে নেওয়া।

আমাদের শাসনব্যবস্থা এখনও বহু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের ধারাবাহিকতা নিয়ে টিকে আছে। আমরা যদি সেই দুর্বল শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকি, যে-শিক্ষা ঔপনিবেশিক যুগে মানুষ তৈরির বদলে কেবল কেরানি তৈরি করত, আর এখন সুবিধাবাদী সমাজের শ্রমশোষণের উপাদান মাত্র! তাহলে কি আজ আমরা মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনার বিপরীতে গিয়ে দাঁড়াব? ত্রিশ লাখ শহীদের কথা ভুলে গিয়ে, রফিক-শফিক-জব্বারের কথা ভুলে গিয়ে, সুর্যসেন-ক্ষুদিরামের কথা ভুলে গিয়ে আমরা কি বলব–আমাদের কোনো লাইব্রেরির প্রয়োজন নেই?

সম্পদ দুই ধরনের, একটা ভাবগত সম্পদ, আরেকটা বস্তুগত সম্পদ। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্যকলা, নন্দনতত্ত্ব–এসব হলো ভাবগত সম্পদ। আর নগদ অর্থ, খনিজ সম্পদ, ভোগ্যপণ্য, শিল্পকারখানা হলো বস্তুগত সম্পদ। যে-সমাজে ভাবগত সম্পদের অভাব, তারা কেবল ধ্বংস আর যুদ্ধই ভালোবাসে। অপরদিকে যারা ভাবগত সম্পদে সমৃদ্ধ, তাদের কাছে বস্তুগত সম্পদ নিজে এসেই ধরা দেয়। ভাবগত সম্পদ অর্জন করতে পেরেছে বলে বস্তুগত সম্পদেও সমৃদ্ধ হতে পেরেছে ইউরোপ, বিশেষত পশ্চিম ইউরোপের সমাজ। তারা ঝেড়ে ফেলে দিতে সক্ষম হয়েছে মধ্যযুগীয় বর্বরতা, পুরোনো কুসংস্কার আর ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতা। নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছে আধুনিক মন-মনন-মনীষা।

পেটের ক্ষুধা যাদের চিত্তকে কাবু করতে পারে নি, ক্ষুধা নিয়েও তারা ক্ষুধাকে অতিক্রম করতে শিখেছে, লাইব্রেরি তাদের কাছে খুবই মূল্যবান, এ কারণে খাদ্য ও সম্পদ এখন তাদের পিছু পিছু ছোটে। তাদের জীবনের ব্যাপ্তি অনেক বিশাল। পাকস্থলীতে আটকে নেই জীবনের মানে। একটা জাতি জ্ঞানের সাধনার ভেতর দিয়েই সেটা অর্জন করতে পারে। এ-কারণে পশ্চিমের মানুষ লাইব্রেরির কদর বোঝে, শত সীমার মধ্যেও লড়াই করতে জানে। আমাদের এখানেও তেমন আয়োজন ষাটের দশকে অনুরণিত হয়েছিল। কিন্তু তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইতিহাসের সেই আয়োজন এখন দিকভ্রান্ত। চাইলে সেই ভ্রান্তির কারণ অনুসন্ধান করে সেখান থেকেও নবতর যাত্রা শুরু করা যেতে পারে।

ষাটের দশক ছিল বাংলাদেশের উত্থানপর্ব, যে-সময়টা ছিল বাঙালির রাষ্ট্র সাধনার কাল, আত্মপরিচয়ের সন্ধানকাল। যার ফলশ্রুতি স্বাধীনতা। তা কি এমনি এমনি হয়েছে? সেসময়ে গ্রামেগঞ্জে, পাড়ামহল্লার তরুণদের মধ্যে ক্লাব গড়ে তোলার প্রবণতা তৈরি হয়েছিল। সেইসঙ্গে লাইব্রেরি। তখন প্রতিটি ক্লাব ঘিরে গড়ে উঠত লাইব্রেরি। পাশাপাশি গ্রামের রাস্তা নির্মাণ, খালের ওপর সাঁকো তৈরি, গ্রামের অস্বচ্ছল পরিবারের কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সহায়তাদান, নাটক-থিয়েটার মঞ্চস্থ করা, একুশে ফেব্রুয়ারি উদযাপন, এসব কাজে ঝুঁকেছিল তরুণেরা।

একই চিত্র দেখা গেছে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কালেও। সেসময়ে প্রতিটি ক্লাবকে ঘিরে, লাইব্রেরির পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল ব্যায়ামাগার। তারা জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি শরীরচর্চার দিকেও মনোনিবেশ করেছিলেন। সেই সময়ে যত ভালো ভালো উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধের বই প্রকাশ হতো, সবগুলোই পড়ে ফেলার একটা প্রতিযোগিতা তৈরি হতো তরুণদের মধ্যে। সেটাও ছিল আরেক স্বপ্ন-জাগানিয়া কাল।

এখন আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আসলে আমরা কী চাই। তার ওপরই নির্ভর করবে লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা। এই মুহূর্তে সমাজের জন্য বেশি দরকারি কারা? ক্ষমতাভোগী ও সুবিধাভোগীর দল নাকি মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ মানুষ? নাকি সমাজের নানা কোণে জমে থাকা অন্ধকারে আলো ফেলতে পারে–এমন ব্যক্তিত্ব। জনগণের কাছে দায়বদ্ধ সাহসী মানুষ, নাকি স্বার্থলোভি ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানুষ–আমরা কোনটা বেছে নেব, তার উপরেই নির্ভর করবে আমাদের লাইব্রেরির প্রয়োজনীয়তা।

বইয়ের কদর কমে যাওয়ার মধ্যেই বোঝা যায়, আমরা একটা স্বপ্নহীন, প্রশ্নহীন মানসিক আকাল অতিক্রম করছি। যে-অন্ধকার জমে আছে হাজার বছর ধরে, যে-অন্ধকার টিকে আছে মানুষের কুসংস্কারে আর ক্ষমতার প্রতিক্রিয়ায়; যে-অন্ধকার দূর করতে রেনেসাঁস ঘটিয়েছিল পশ্চিম, এখানে তাকে দূর করার কোনো কার্যকর আয়োজন এখনও অনুপস্থিত।

আমরা যদি সমাজের এই অন্ধকার দূর করতে চাই, সর্বব্যাপী জাগরণকে ধারণ করতে চাই,

তাহলে দরকার লাইব্রেরি। শরণ নিতে হবে বইয়ের। যার যেখানে যতটুকু সুযোগ রয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়েই শুরু করতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে লাইব্রেরি গড়ার আন্দোলন।

সেই লক্ষ্যে কয়েকটি প্রস্তাব:

১. লাইব্রেরি, বিশেষত ঢাকা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ২৪ ঘণ্টা খোলা রাখতে হবে। ঈদ-পূজাসহ যাবতীয় ছুটির দিনেও লাইব্রেরি বন্ধ হবে না;

২. প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতেও একই পদ্ধতি চালু করতে হবে;

৩. পাঠকদের থাকার জন্য লাইব্রেরিতে ডর্মিটরির ব্যবস্থা করতে হবে, সেখানে স্বল্পমূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে;

৪. প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনে বইয়ের স্টল রাখতে হবে, সামান্য টাকা দিয়ে যাতে যাত্রাকালে বই ধার নিয়ে পড়ার সুযোগ পায় রেলযাত্রীরা; একইভাবে প্রতিটি রেল-স্টেশনে এবং বাস-স্টপেজে বইয়ের স্টল বা স্ট্রিট লাইব্রেরি তৈরি করতে হবে;

৫. প্রতিটি পাড়ামহল্লায়, গ্রামেগঞ্জে ব্যক্তির লাইব্রেরির উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে, গ্রামে ও শহরে লাইব্রেরি-আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে হবে।

মন পুষ্টিবিতান ‘লাইব্রেরি’

শাজাহান চাকলাদার

গ্রন্থাগারের আক্ষরিক অর্থ বই, পত্রপত্রিকার আলয় বা নিবাস। ‘পাঠাগার’ একই ব্যাকরণে পঠনকে প্রথম গুরুত্ব দেয়, তারপর আসে পাঠের জন্য নিভৃত নিকেতন, সেখানে নামকরণটি ভাবযোগে বিষয়ের অন্তরে যতটুকু প্রবেশযোগ্য মনে হয়, বই বা পুস্তকের গন্ধ প্রত্যক্ষভাবে ততটুকু মনে ছায়া ফেলে না। এসব বিবেচনায় বাংলায় প্রচলিত ‘লাইব্রেরি’ শব্দ হিসেবে ও সামগ্রিক ব্যঞ্জনায় এবং ভর ও ওজনের মাপে এগিয়ে আছে বলে আমার বিশ্বাস। কাব্য করে কেউ একে ‘বইঘর’ও বলেন, যা ‘গ্রন্থাগার’-এর বিকল্পমাত্র। তবে ‘লাইব্রেরি’র ভিন্ন অর্থ আছে আমাদের দেশে; প্রায় সব পুস্তক ব্যবসায়ী ও কিছু পুস্তক প্রকাশক তাদের বাণিজ্যিক কর্মস্থলের নামকরণে ‘লাইব্রেরি’ যুক্ত করেন। এটি ‘Book shop’-এর দেশীয় সংস্কারসিদ্ধ নামকরণমাত্র।

একুশ শতকের গোড়ার দিকে ইউনেস্কো লাইব্রেরির যে-সংজ্ঞা দিয়েছে, সেটি যথার্থই আধুনিক ও অর্থবহ। ইউনেস্কোর মতে “Any organized collection of printed books and periodical or any other graphic or audio-visual materials with a staff to provide and facilitate the use of such materials as are required to meet the information research, educational and recreational needs of users”. আজ তাই দেশের লাইব্রেরিগুলোকেও নবসজ্জায় সমৃদ্ধ করার সময় এসেছে।

বেঁচে থাকার নানা উপাদান খুঁজতে মানুষ বিশ্বব্যাপী যাযাবরের মতো জলে-স্থলে ঘুরে বেড়িয়েছে, সন্ধান করেছে অচিন দেশ ও সম্পদ, বাঁধিয়েছে যুদ্ধ, সংহার করেছে অসংখ্য প্রাণ। আবার আবিষ্কারও করেছে একই পথে নানা কিছু, বাড়িয়েছে জ্ঞান। এসব নিয়ে জীবন থেকে জীবনান্তরের দীর্ঘ পথে তার প্রয়োজন হয়েছে শব্দ ও ভাষার। ভাষা অভিন্ন হতে পারে নি জীবনাচারের বৈচিত্র্যময়তার কারণে, কিন্তু মাধ্যম সে খুঁজেছে অবিরাম একটি সংগ্রহশালার–যেখানে আহরিত ও উদ্ভাবিত বিষয়গুলো সংরক্ষণ করা যায়। পশুর চামড়া, শিলা, গাছের বাকল, পাতা, মাটি, প্যাপিরাস ইত্যাদির মধ্যে নানা উপকরণে আঁচর কেটে সে অক্ষয় করে রাখতে প্রয়াস পেয়েছে।

আজকের বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলার যত শাখা এমনকি মহাকাশতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা–সবই সে নানা ভাণ্ডারে জমা করেছে যুগে যুগে। এই পথচলার নাম সংস্কৃতি। ক্রমাগত এর বিকাশ হয়, বৈচিত্র্যময়তায় রাঙিয়ে তোলে তার রূপ। আর রূপায়ণের এই পথেই সার্থকভাবে সংরক্ষণের স্বপ্নীল অভিপ্রায় জন্ম দেয় ‘লাইব্রেরি’র। আধুনিক জীবন-ব্যবস্থায় লাইব্রেরির কোনও বিকল্প নেই। কম্পিউটার-নির্ভর জীবনেও এর অপরিহার্যতা পরীক্ষিত সত্য। জাতিগঠন প্রক্রিয়ায় লাইব্রেরির ভূমিকা এতই প্রবল যে, বলা হয় যে-জাতির

লাইব্রেরি যত সমৃদ্ধ সে-জাতি তত উন্নত। মহাকালের অসীম প্রান্তরে যে-কল্পিত কাল ও যুগবিভাগ সেখানে লাইব্রেরি ভাষিক, শাব্দিক ও বাচিক সেতু হয়ে অসামান্য দৃঢ় এক বন্ধন তৈরি করেছে, যার স্পর্শে মানুষ হয় 'মানবিক'।

ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী জলধোয়া সবকটি দেশ বিশ্বসভ্যতায় যে-প্রাথমিক ছাপ রেখেছিল তার মাঝে ব্যাবিলনভিত্তিক আসিরিয় সভ্যতার অগ্রগামিতা ছিল উজ্জ্বলতর। আসিরিয় সম্রাট আসুরবানির লাইব্রেরির কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে রূপকথার মতো। পার্চমেন্ট, প্যাপিরাস, ক্লে-ট্যাবলেট, পাথরের চাঁই ইত্যাদির মাঝে অঙ্কিত হতো বর্ণ-ছবি-সংকেতের ভাষায় নানা বিষয় যা কালিক নিদর্শন শুধু নয়, অতীতের ইতিহাস হিসেবে চিহ্নিত হতো। অনাগত মানুষ ও সময়কে সেই কালেই লাইব্রেরির অভিধায় সেতুবন্ধনের বৃত্তে আসীন করার চেষ্টা হয়েছিল কর্মোদ্দীপনার ঐন্দ্রজালিক আকাঙ্ক্ষায়। সম্রাট আসুরবানির ওই লাইব্রেরিতে শুধু বস্তুখণ্ডই ছিল, বই বলে আজ যাকে আমরা জানি, সেটি তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। প্রাচীন সভ্যতার ওই লাইব্রেরিটি খ্রি.পূ. সপ্তম শতকে দাঙ্গা ও যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যায়।

তবে খোদাইকৃত ক্লে-ট্যাবলেট মাটি পুড়িয়ে পাথরের মতো শক্ত করে তৈরি ছিল বলে বহুসংখ্যক ট্যাবলেট প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এর কয়েক হাজার নিদর্শন ব্রিটিশ মিউজিয়ামে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। একই ভাবাদর্শে জ্ঞানপাল্লা ভারী করেছিল মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রিক রাজা টলেমি। খ্রি.পূ. তিনশ অব্দে হিব্রু ও লাতিন ভাষায় লিপিবদ্ধ কয়েক লক্ষ পাণ্ডুলিপির সংগ্রহ ছিল আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে। তখনকার সময়ে ওই লাইব্রেরির গঠনশৈলীর কথা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। সেখানে পাঠকক্ষ, হলঘর, খাবার ঘর, উপাসনালয় ইত্যাদি সবই ছিল, যা পরিচালিত হতো ও মুখরিত থাকত বিদ্যানুরাগী ও জ্ঞানপিপাসুদের দ্বারা। সভ্যতার অগ্রযাত্রায় মানুষের মানবিক হয়ে ওঠার কারিগর 'লাইব্রেরি' কী ভূমিকা রাখে, এই প্রাচীন দুটি কীর্তিই তার উদাহরণ। মুক্তবুদ্ধি চর্চার এই বিশাল স্থাপনা আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিটি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার-প্রসারের ডামাডোলে ও জুলিয়াস সিজারের আক্রমণকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একদা নাস্তিকতার চর্চাস্থল ও কাল্পনিক অপশিক্ষার কেন্দ্র অভিহিত করে ৩৯০ খ্রিস্টাব্দে অর্থোডক্স বিশপ থিওটিলাস এটি পুরোপুরিই ধ্বংস করে।

উপমহাদেশে ভারতের বিহার রাজ্যের অর্ন্তগত পাটনার নালন্দা নামক স্থানে ছিল বৌদ্ধবিহার। খ্রি.পূ. ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের দিকে এখানে গড়ে ওঠে নালন্দা মহাবিহার লাইব্রেরি। প্রধাত পাতার মধ্যে লেখা দর্শন, সাহিত্য, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যার বিপুল সংগ্রহ ছিল এখানে। তের শতকের গোড়ার দিকে তুর্কি আক্রমণে এই লাইব্রেরিটি ধ্বংস হয়ে যায়। এ-বিষয়ে জানা গিয়েছে মাত্র আড়াইশ বছর আগে। ঐতিহাসিক আলেকজান্ডার কানিংহামের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় এই তথ্য প্রকাশ পায়।

মধ্যযুগে বাংলায় হোসেন শাহীর রাজবংশ রাজকীয় লাইব্রেরি গঠন করেছিল। সেখানেও

পুস্তকাকারে নয় বরং পূর্বোক্ত বিভিন্ন মাধ্যমে সংকলিত বিষয়াদির সংগ্রহই ছিল মূখ্য। প্রথম মুদ্রিত বই ও পাণ্ডুলিপির লাইব্রেরি ছিল কলকাতার শ্রীরামপুর মিশনে। আঠারো শতকের শেষের দিকে এটি গঠিত হয়েছিল। বই-পুস্তক ও পুঁথির সংগ্রহশালা ছিল কলিকাতা মাদ্রাসা ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। সামন্ত সমাজ-কাঠামোর আওতায় জমিদার ও জমিদার-পোষ্য বিদ্যানুরাগীদের আনুকূল্যে কালে কালে বাংলার গ্রামাঞ্চলে 'লাইব্রেরি' গড়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। হিন্দু ধর্মানুশীলনের জন্য ও ব্রাহ্মবাদীদের আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার-সুবিধার জন্যও লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ঢাকার বিখ্যাত রামমোহন লাইব্রেরি ছিল ব্রাহ্মবাদ-উদ্দীপক বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ফসল। ভারত ভাগের আগে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ইংরেজি শিক্ষার প্রস্তুতিকালে গ্রন্থপাঠ অপরিত্যাজ্য হয়ে ওঠে (যেমনটি দেখি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠবিকাশকালে মুদ্রণসুবিধার বিস্তারে) এবং ঔপনিবেশিক পরিবেশেই আপন সত্ত্বার সন্ধানে মানুষের পুস্তক সংগ্রহে আগ্রহ তৈরি হয়।

এই সামাজিক অগ্রযাত্রায় গ্রামভিত্তিক একক অনুপ্রেরণায় আপন গৃহে পুস্তকভাণ্ডার তৈরিতে একরকম আত্মার আনন্দ-উৎস ঘনীভূত হয়। গৃহস্থালি মানুষ এই শ্রেণীর বাড়িকে 'বইওয়ালা বাড়ি' বলে জানত। অনধিক পঞ্চাশখানা বইয়ের একটি সংগ্রহকেই সৌখিন পাঠক 'লাইব্রেরি' নাম দেয়। কিন্তু ১৯৪০-এর দিকে ব্যাপক নগরায়ণ ও শিক্ষিত শ্রেণীর শহরকেন্দ্রিক আন্দোলনের কারণে গ্রাম-লাইব্রেরিগুলো ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। অন্যদিকে তারও আগে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠে শহরভিত্তিক মুদ্রিত সম্ভারের সংগ্রহশালা। এক তথ্যে জানা যায়, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কলেজের সংগ্রহে থাকা প্রায় ১৮,০০০ পুস্তক ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছিল।

এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত বাংলাপিডিয়ার তথ্যানুসারে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত ন্যাশনাল লাইব্রেরি বা জাতীয় গ্রন্থাগার হচ্ছে দেশের সকল গ্রন্থের কপিরাইট সংরক্ষণশালা। শেরেবাংলা নগরে স্থাপিত এই লাইব্রেরিটি এ পর্যন্ত প্রকাশ করেছে 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল বায়োগ্রাফি' সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের সংক্ষিপ্তসার, প্রকাশক-অভিধান এবং বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের জীবনী। অবিভক্ত বাংলায় পূর্বাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরির মধ্যে ছিল ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত বরিশাল, যশোহর ও রংপুরের পাবলিক লাইব্রেরি এবং বগুড়ার উডবার্ন লাইব্রেরি। এরপর ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে পাই ঢাকার নর্থব্রুক হল লাইব্রেরি। ঢাকার কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫৩ খ্রি.। এতে ঢাকার পূর্বতন পাবলিক লাইব্রেরি নামক সংস্থাটি যুক্ত করা হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র এর শাখা রয়েছে। বাংলাদেশ শিশু একাডেমির কেন্দ্রীয় অফিসেও রয়েছে গুণমানসম্পন্ন একটি লাইব্রেরি।

এ-ছাড়া দেশের প্রায় সব বড় এনজিও সংস্থা যেমন ব্র্যাক, কারিতাস, আহসানিয়া মিশন ইত্যাদির রয়েছে নিজস্ব লাইব্রেরি। বিভিন্ন পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়েও রয়েছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। বিষয়ভিত্তিক ও পেশাজীবী শিক্ষা-প্রশিক্ষণেরও রয়েছে মানসম্মত লাইব্রেরি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমসাময়িক জ্ঞানচর্চার সহজগামিতায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক

পুস্তক, পিরিয়ডিকলস, ম্যাগাজিন, ডকুমেন্টরি ইত্যাদি নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। এ-ছাড়া রয়েছে ইসলামিক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (আইআইটি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি) এবং বাংলাদেশ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনিক্যাল ইনফরমেশন অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক)। শেষেরটি সার্ক ডকুমেন্টেশন সেন্টার-এর সদস্য।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য ন্যাশনাল হেলথ লাইব্রেরি অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন সেন্টার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব চিকিৎসা বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বারডেম লাইব্রেরি ছাড়াও দেশের প্রায় সব মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রয়েছে বিষয়ভিত্তিক লাইব্রেরি। জাতীয় নানা প্রতিষ্ঠানেও রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণা-সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরি, যেমন– বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, ইনস্টিটিউট অব স্টাডিজ, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, পরিসংখ্যান গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পরিকল্পনা কমিশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী একাডেমি, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ইনস্টিটিউট। ব্যানবেইস বলছে, এ ধরনের বিশেষ লাইব্রেরির সংখ্যা প্রায় ৭০০। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে গড়ে ওঠা লাইব্রেরি রয়েছে প্রায় সব মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও অধিদপ্তরে। সরকারি লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি হচ্ছে বাংলাদেশ সচিবালয় লাইব্রেরি। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র' পুস্তক সংগ্রহ, প্রকাশনা ও বিপণনের একটি গুরুতপূর্ণ সংস্থা যার তত্ত্বাবধানে রয়েছে 'মহানগর পাঠাগার' নামক একটি লাইব্রেরি। ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (এফবিসিসিআই) এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (ডিসিসিআই)-এরও রয়েছে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্বনামধন্য অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ মননশীলতার উৎকর্ষের লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকায় একটি প্রকল্প গঠন করেন এবং দেশের সর্বত্র পাঠাভ্যাসের আন্দোলন গড়ে তোলেন। 'মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়' মন্ত্রবাণী তরুণ-যুবাদের মধ্যে সঞ্চার করার অভিপ্রায় নিয়ে গড়েন 'বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র,' যেখানে পাঠাভ্যাসের অনুশীলন ছাড়াও রয়েছে সংগৃহিত পুস্তকের বিশাল ভাণ্ডার। আজ তার নতুন আবাহনী সুর 'আলোকিত মানুষ চাই।' বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র লাইব্রেরিপ্রেমিদের কাছে চমৎকার এক জ্ঞানবৃক্ষ।

একটি বিশেষায়িত লাইব্রেরি–প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়:

৩১ হাজারেরও বেশি প্রকাশনা-সংগ্রহ রয়েছে এই লাইব্রেরিতে। সকল প্রকাশনা Dewey Decimal Classification নিয়ম অনুসারে বিন্যস্ত। তার মধ্যে ১৮ হাজারেরও বেশি বই অনলাইন ব্যবস্থাপনায় সন্নিবেশিত এবং ৫ হাজারেরও বেশি নানা আঙ্গিকের রয়েছে ই-বুক। জাতীয় উন্নয়ন ও মানসিক পুষ্টির জন্য লাইব্রেরি ও বইপত্র পাঠ কতটা অপরিত্যাজ্য সেটি

বুঝতে হলে দার্শনিক-কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘পয়লা নম্বর’ গল্পে উল্লেখিত চরণদ্বয়ের কথা বলতেই হয়-

‘যাবজ্জীবেৎ নাই-বা জীবেৎ
ঋণং কৃত্বা বহিং পঠেৎ।’

চার্বাকদের লোকায়ত দর্শনের বাহ্যিক সুখাস্বাদনে ঋণ করে হলেও ঘি খাওয়ার যে-প্রবণতার কথা প্রবচনরূপে মানুষের মুখে মুখে ফিরত, কবিগুরু সেই ইচ্ছারূপকে ‘বইপড়া’র জালে জড়ালেন। আর সেজন্যই চাই ‘লাইব্রেরি’র মতো নিরাপদ পুস্তক-বিতান।

শিশু-কিশোরদের বইয়ের মেলা ‘শিশু একাডেমী গ্রন্থাগার’

তাসলিমা আক্তার তাহমিনা

জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিশু-কিশোরদের রয়েছে বিশাল ভূমিকা। সেক্ষেত্রে শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে অবশ্যই তাদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে নজর দিতে হবে। সে লক্ষ্যে ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশবলে গঠন করা হয় ‘বাংলাদেশ শিশু একাডেমী’। এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য যে-কয়টি বিভাগ রয়েছে এগুলোর অন্যতম একটি হলো–গ্রন্থাগার। একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক জোবেদা খানমের স্মৃতি রক্ষায় কেন্দ্রীয় ভবনের এই গ্রন্থাগারের নামকরণ করা হয়েছে ‘জোবেদা খানম শিশু গ্রন্থাগার’।

এই গ্রন্থাগারে রয়েছে শিশুদের উপযোগী দেশি-বিদেশি লেখকের ২০ হাজার ধরনের প্রায় ৪০ হাজার বই। যেমন: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, অর্থনীতি, ইতিহাস, সাহিত্য-সংস্কৃতি, উপন্যাস, আইন, ধর্ম, ভ্রমণ, নাটক, ছড়া, কবিতা, রান্না, চিকিৎসা, খেলাধুলা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ক বই, ম্যাগাজিন ও জার্নাল। বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন শেলফে বইগুলো সাজানো রয়েছে। যাতে শিশু-কিশোররা পছন্দের বইটি সহজে খুঁজে পেতে পারে। গ্রন্থাগারে প্রায় শতাধিক শিশু-কিশোর ও তাদের অভিভাবক নিয়মিত বই পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। অনেক গবেষকও এখানে গবেষণাকাজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতি রক্ষার্থে এখানে রয়েছে বিশেষ ‘বঙ্গবন্ধু কর্নার’। শিশু-কিশোরদের বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে জানার জন্য এই কর্নারে রয়েছে অসংখ্য গ্রন্থাদি। যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে তাঁর অবদান, স্বাধীনতার ঘোষণা, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর নেওয়া বিভিন্ন কর্মসূচি, বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত ও শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাঁর অবদান সম্পর্কে জানার বিশেষ সুযোগ।

শিশু একাডেমীর গ্রন্থাগারে বইয়ের বাইরেও রয়েছে পত্রপত্রিকা পাঠের বিশেষ ব্যবস্থা। দেশ ও দেশের বাইরের অসংখ্য পত্রপত্রিকা এখানে নিয়মিত রাখা হয়। এ-ছাড়া এখানে পাঠকের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে পুরোনো পত্রিকাও সংরক্ষণ করা হয়। ফলে শিশু-কিশোররা এখানে বই পড়ার পাশাপাশি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের দৈনন্দিন খবরও জানতে পারছে। এতে তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ও জ্ঞানের ভাণ্ডারও সমৃদ্ধ হচ্ছে।

শিশু একাডেমীর গ্রন্থাগারে শিশু-কিশোরদের জন্য রয়েছে বই পড়ার বাড়তি সুযোগ। ৬-১৮ বছর বয়সের যেকোনো শিশু-কিশোর মাত্র একশ টাকা ফি দিয়ে এই গ্রন্থাগারের নিয়মিত সদস্য হতে পারে। এ-ছাড়া নিয়মিত সদস্যরা বাড়িতে বই নিয়েও যেতে পারে। এবং প্রতি

১৫ দিনে দুটি করে বই তুলতে পারে। তবে নির্দিষ্ট সময়ের আগেও পুরোনো বই জমা দিয়ে নতুন বই নেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এ-ছাড়া শিশুদের মধ্যে পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি ও গ্রন্থাগারের প্রতি আগ্রহী করে তোলার উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগারভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কার্যক্রমের নানা আয়োজন রয়েছে এখানে। যেমন– রচনা প্রতিযোগিতা, কুইজ, বিতর্ক, বইপড়া উৎসব, দেখো এবং আঁকো। এমনকি উপস্থিতির ভিত্তিতে সেরা পাঠকের পুরস্কারও দেওয়া হয়।

সম্পূর্ণ নিরিবিলি ও কোলাহলমুক্ত পরিবেশে এখানে রয়েছে বই পড়ার অফুরন্ত সুযোগ। গ্রন্থাগারের ভেতরে রয়েছে অসংখ্য টেবিল ও শতাধিক চেয়ার। আলো ও বাতাসের জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত লাইট ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। তথ্যপ্রযুক্তিগত সুবিধাও রয়েছে এখানে। রয়েছে দুটি কম্পিউটার। যার মাধ্যমে শিশু-কিশোর পাঠক এখান থেকে বাড়তি সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। অন্যদিকে, পাঠকেরা বিশেষ লেখা কপি করে নিতে চাইলেও সে-সুযোগ পাচ্ছেন। এখানে রয়েছে ফটোকপির বিশেষ ব্যবস্থা। গ্রন্থাগারে আগত পাঠকের সঙ্গে থাকা ব্যাগ ও অন্যান্য মালামাল কাউন্টারে জমা দিয়ে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করতে হয়। এজন্য আলাদা কোনো ফি দিতে হয় না।

গ্রন্থাগারের অভ্যন্তের ব্যাগ, কোনোপ্রকার বই ও মলাট বাঁধানো খাতা নিয়ে প্রবেশ করা যায় না। কোনো খাদ্যদ্রব্য নিয়ে প্রবেশ নিষেধ। পাঠ্যবই, ম্যাগাজিন ও অন্য কিছুর পাতা কাটা/ছেঁড়া যাবে না। মূল্যবান সামগ্রী, নগদ অর্থ, মোবাইল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি নিজ দায়িত্বে রাখতে হয়। পড়া শেষ হলে বই টেবিলেই রেখে আসতে হয়। এক শেলফের বই অন্য শেলফে রাখা যায় না। প্রয়োজনে গ্রন্থাগারিকের সহায়তা নেওয়া যায়।

এই গ্রন্থাগারটিতে মূল সিঁড়ি ও ফায়ার-এক্সটিংগুইসার ছাড়া নিজস্ব কোনও অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা নেই। তবে গ্রন্থাগারের বইপত্র সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য সি.সি. ক্যামেরা রয়েছে। একাধিক ক্যামেরা দিয়ে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ হয়। শিশু একাডেমীর এই গ্রন্থাগারটি একাডেমীর মূল ভবনের দোতলায় অবস্থিত। যার অবস্থান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরের কাছাকাছি ঐতিহাসিক কার্জন হলের ঠিক উল্টোপাশে। শুক্রবার সাপ্তাহিক বন্ধ। এ-ছাড়া সপ্তাহের অন্যান্য দিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা থাকে। গ্রন্থাগারটি সবার জন্য উন্মুক্ত।

কবিতা

নাম

আরাফাত রিলকে

কানাগলি ঠাওরে বলতেছিলাম নাম,
কেউ কি শুনতেছিল কিনা সন্দেহ।
তবু নাম তো বলাই লাগে,
নামের পরে পদবি থাকলে ভালো।

যেমন ধরুন সরকারি কর্মকর্তা
অথবা দলীয় হোমরাচোমরা কিছু।
নাম সুন্দর সঙ্গে পদবি আরও সুন্দর,
স্বর্ণের দামে বেচা হয় রাস্তাঘাটে।

আত্মীয় বাড়িতে মেজবানির সময়ে
অথবা সম্বন্ধ গোছের কিছু হলে
তুমি ছুঁড়ে মারো নাম,
শক্ত হলে ঢিলের মতো শব্দ হবে।

কবিতাদের পাড়ায় নাম বেচে মেলে
অঢেল সুনাম, লাফাঙ্গা সঞ্চালকের
মুখে খদ্দেরের মতো রসমালাই হাসি,
পদক বিক্রেতার কাছে নাম হলো
ক্ষিরসার মতো দুধেল মিঠাই।

আর যারা নাম রাখে সততার কাছে,
তারা দাঁড়ায় দীর্ঘ লাইনে,
একে একে ছেঁচড়া কন্ডাকটর,
মেট্রিকে থার্ড ক্লাস পাওয়া পুলিশ,
এলাকার গুন্ডা মাস্তানের কাছে
ধমক খেয়ে চুপচাপ সরে পরে।

তবু আমি আমার নাম খুঁজি
জামরুল ফুলের কাছে একা একা
গোপনে, নামের আরেক অর্থ মানুষ
অথবা গণতন্ত্র, পোয়েটিক সেন্স নাই

জানি, তবু আমার নাম খুঁজি
কবিতার কাছে, সুন্দরের কাছে
গোপনে রাখি আমার নাম,
সমুদ্রের কাছে সব বদনাম রেখে

নিগৃহীত শিল্পের কাছে একা একা
বলি, কেউ বলুক নামকে বৃদ্ধাঙ্গুলি
দেখানো লোকটি একজন কবি
আর আমি দীর্ঘ বহেরা গাছ,
আমাদের চারপাশে অনেক নদী
বয়ে গেছে হৃদয়ে সহস্র বছরব্যাপী।

পাঠাগার মানে
রকিবুল ইসলাম

পাঠাগার মানে কী
তোমরা তা জানো কি?

পাঠাগার মানে হলো–বই আর বই
পাঠাগারে বইগুলো করে হইচই।
পাঠাগার মানে হলো–জ্ঞানের বাতি
পাঠাগারে জ্ঞানী হয় মানবজাতি!

পাঠাগার মানে হলো–আনন্দে পড়া
পাঠাগারে হয় মন সানন্দে গড়া।
পাঠাগার মানে হলো–পৃথিবীটা এই
পাঠাগারে কত কিছু থাকে এখানেই।

পাঠাগার মানে হলো–পড়ে হই প্রীত
পাঠাগারে সকলের মন আলোকিত
পাঠাগার মানে হলো–সমাজের ভালো
পাঠাগারে জ্বলে থাকে আলো আর আলো।

পাঠাগার মানে হলো–মিলেমিশে থাকা
পাঠাগারে থাকে তাই বইগুলো রাখা।
পাঠাগার মানে হলো–সারি সারি বই
পাঠাগারে খুঁজে পাই বন্ধু ও সই!

মুক্ত কোথায়

মো. ফরিদুল ইসলাম

বলতে গেলে মুখ থাকে না
পড়তে গেলেই শেষ,
লিখতে গেলে কলম থাকে না
বলতে মানা বেশ।

হাঁটতে গেলে পা থাকে না
দাঁড়ানো সে তো আগেই নিষেধ,
বাধা দিলে মান থাকে না
লেগে যায় বিভেদ।

গাড়িতে গেলে সিট থাকে না
দাঁড়িয়েই জীবন শেষ,
চলতে গেলে পথ থাকে না
হোক না যতই বেশ।

কাজ করতে দিতে হয়
বাড়তি অনেক মায়না,
সুযোগ বুঝে রক্তচোষারা
ধরছে অনেক বায়না।

প্রত্যাশা

আর্য হিমাদ্রি (আল আমিন)

কখন দূর হবে গোঁড়ামি?
বিদ্বেষ ভাঙি বৈরিতা?
কখন ঘুচাবে চিরচেনা সেই অসাম্প্রদায়িক চেতনার বুলি?
কখন চাপ কমবে সমাজ কিংবা পরিবার থেকে মরুর সংস্কৃতির আদলে গড়ে ওঠা
শিক্ষার বুনিয়াদ কিংবা ভক্তিবিশ্বাসকে না বলতে?
কখন হবে কুসংস্কার দূর?
আসবে জীবনধারার ভিন্নতা–

কখন কাটবে নিরাপত্তাহীনতার ভয়?
কখন সন্দেহ দূর হবে?
কখন মন ভালো হবে?
কবে ভেজা শহরগুলো হাসবে?
কবে নতুন এক সকালে সবাই যার যার মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ে ঘরে ফিরবে?
আর নদীগুলো নিজেদের তীরে ফিরে যাবে?

দেখো প্রকাশ্য দিবালোকে
আয়ু কেড়ে নেয় যখন-তখন।
নিরাপত্তা যে দেবে
সেই তো স্বয়ং ঘাতক!

অপেক্ষায় আছি সে বিকশিত মানুষের জন্য;
আমি অপেক্ষায় আছি–
একদল উন্মাদের জন্য, যারা
প্রকাণ্ড স্ফটিকের মতো সপ্রতিভায় বিকশিত হবে।
আসবে সুন্দর সকাল।
পালন করবে।

পাঠাগার গড়ে উঠুক গ্রামে গ্রামে

সোহেল সৌকর্য

পাঠাগারের তাকে
থরে থরে দেশ-বিদেশের বই সাজানো থাকে।
বইগুলো রোজ ডাকে
গ্রন্থপ্রেমী, বই-পড়ুয়া পাঠক-পাঠিকাকে।

পাঠক গেলে কাছে
অপঠিত বইগুলো খুব হাত-পা ছুঁড়ে নাচে।
পাঠক যখন পড়ে
চোখের সামনে নতুন জগৎ বই-ই মেলে ধরে।

বই যে জ্বালে আলো
বই-ই শেখায় জগৎটাকে বাসতে হবে ভালো।
বই যে বন্ধুর মতো
দর্শন, বিজ্ঞান আর সাহিত্যের বই যে আছে কত।

মানবো চিরদিনই
এ সভ্যতা পুরোপুরি বইয়ের কাছে ঋণী।
বই যে প্রিয় সঙ্গী
বই-ই পারে পাল্টে দিতে মন ও দৃষ্টিভঙ্গি।

বই পড়ে না যারা
হতভাগ্য আর করুণার পাত্র হলো তারা।
তোমরা বিশ্বাস করো
বই পড়ার আনন্দ হলো সবচে মহত্তর।

সবাই রাখো শিখে
প্রতিভাবান মানুষেরাই বই গিয়েছেন লিখে।
বলছি তাঁদের নামে
আধুনিক পাঠাগার গড়ে উঠুক গ্রামে গ্রামে।

পর্ব-৩

বাংলাদেশে শতবর্ষী গ্রন্থাগার: গোড়ার কথা

আশরাফুল আলম ছিদ্দিক

১৮৩২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে ৫৫টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া যায়। এসকল লাইব্রেরিগুলোর মধ্যে বর্তমানে ৪২টি সচল এবং ১৩টি বিলুপ্ত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটির কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়েছে এবং কয়েকটি আর্থিক সংকট ও সঠিক পরিচালনার অভাবে বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। সবগুলো শতবর্ষী গ্রন্থাগার বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হচ্ছে; কেবল বগুড়ার উডবার্ন সরকারি গণগ্রন্থাগার ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে সরকারিভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

শতবর্ষী ৪২টি সচল গ্রন্থাগারের মধ্যে ১৬টি গ্রন্থাগার ব্যক্তির নামে, ২২টি গ্রন্থাগার স্থানের নামে এবং ৫টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানের নামে নামকরণ করা হয়েছে। ৩টি গ্রন্থাগার ইংরেজদের নামে, ৫টি মুসলিম ও ৮টি সনাতন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়েছে। ৪২টি গ্রন্থাগারের মধ্যে মাত্র ২টি গ্রন্থাগার নারীর নামে নামকরণ করা হয়েছে। কয়েকটি গ্রন্থাগারের নাম একাধিকবার পরিবর্তন করে বর্তমান নামকরণ করা হয়েছে। ৪২টি শতবর্ষী লাইব্রেরির মধ্যে ২১টি গ্রন্থাগারের নাম একাধিকবার পরিবর্তন করা হয়েছে। রাজশাহীর 'শাহ্ মখদুম ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি'র নাম ৫বার পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী শহরে প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমান-ই-ইসলাম'-এর নাম পরিবর্তন করে ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে 'রাজশাহী মুসলিম ক্লাব' রাখা হয়। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে এই ক্লাবের নামকরণ করা হয় 'মুসলিম ইনস্টিটিউট'। আবার ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে 'মুসলিম ইনস্টিটিউট'-এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'জিন্নাহ ইনস্টিটিউট'। স্বাধীনতার পর এই ইনস্টিটিউটের নাম রাখা হয় 'শাহ্ মখদুম ইনস্টিটিউট ও মাদার বখস হল' এবং বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'শাহ্ মখদুম ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি'। শতবর্ষী কয়েকটি লাইব্রেরির নামকরণ করা হয়েছে ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির নামে যেমন: রামমোহন রায় পাঠাগার, ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি, শেরে বাংলা পাবলিক লাইব্রেরি, নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি।

শতবর্ষী গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে ৩টি গ্রন্থাগার ঢাকা জেলায় অবস্থিত। কুমিল্লা, বরিশাল, বগুড়া, কুষ্টিয়া, রাজশাহী ও ঝিনাইদহ এই ৬টি জেলায় ২টি করে গ্রন্থাগার আছে। ১টি করে শতবর্ষী গ্রন্থাগার আছে ২৬টি জেলায়– কক্সবাজার, কুড়িগ্রাম, খুলনা, গাইবান্ধা, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, ঠাকুরগাঁও, পিরোজপুর, পাবনা, মুন্সিগঞ্জ, নোয়াখালী, নাটোর, নড়াইল, নওগাঁ, নারায়ণগঞ্জ, নিলফামারী, রাজবাড়ী, রংপুর, সিরাজগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, মেহেরপুর এবং যশোর। বাংলাদেশের ৩১টি জেলায় শতাধিক বছরের পুরোনো কোনো গ্রন্থাগার নেই। ১৩টি বিলুপ্ত গ্রন্থাগারের মধ্যে মুন্সিগঞ্জ জেলায় শতাধিক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ৫টি লাইব্রেরি বর্তমানে বিলুপ্ত। বাগেরহাট, সিলেট, সিরাজগঞ্জ, রংপুর, মেহেরপুর, খুলনা, কিশোরগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ এই ৮টি জেলায় শতাধিক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত

৮টি গ্রন্থাগার বর্তমানে বিলুপ্ত। শতবর্ষী ৪২টি সচল গ্রন্থাগারের মধ্যে ২৩টি গ্রন্থাগার একাধিকবার স্থান পরিবর্তন করে বর্তমান স্থানে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ৪টি গ্রন্থাগার ৪বার এবং ১২টি গ্রন্থাগার ৩বার স্থানান্তরিত হয়েছে। ৪টি গ্রন্থাগারকে ভূমিকম্প, আগুন ও নদীভাঙনের জন্য স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে।

১৮৩২ থেকে ১৯২২ এই ৯১ বছরে বাংলাদেশে ৫৫টি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৯১০ ও ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ৪টি করে, ১৮৮২, ১৮৯০, ১৯০৯ এবং ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ৩টি করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মসালে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজ জেলা গোপালগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও এবং পিরোজপুরে ১টি করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ২টি করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৮৫৪, ১৮৯৫, ১৯০১, ১৯০৭, ১৯১৫ এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার পর ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আর কোনো লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৮৭৩-১৮৮১ এই ৯ বছরে কোনো গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা হয় নি। 'ললিত মোহন স্মৃতি গ্রন্থাগার, নারায়ণগঞ্জ'–এই লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠার সাল পাওয়া যায় নি, মনে করা হয় ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

শতবর্ষী ৪২টি সচল গ্রন্থাগারের সবগুলোতেই প্রতিষ্ঠাকালে স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও উদ্যোগী ব্যক্তিগণের সংশ্লিষ্টতা এবং সহযোগিতা লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে ১৪টি ইংরেজ কর্মকর্তা, ১৪টি রাজা-জমিদার-নবাব এবং ১৩টি স্থানীয় উদ্যোক্তা কিংবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য-সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অধিকাংশ ইংরেজ কর্মকর্তাগণ নিজের ব্যক্তিগত অর্থ নয় বরং সরকারি তহবিল থেকেই লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের জমিদার-নবাবরা লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছেন। নড়াইল, রংপুর এবং নাটোরের জমিদারগণ বেশ কয়েকটি লাইব্রেরিতে জমিসহ আর্থিক অনুদান প্রদান করেছেন। নড়াইল, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, বরিশাল, বগুড়া, নাটোর, রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জেলার লাইব্রেরিগুলোতে তাঁদের সহযোগিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইংরেজ কর্মকর্তা, জমিদার ও নবাবগণ অনেকে নিজের অথবা তাদের বংশধরদের নামে লাইব্রেরির নামকরণ করেছেন। কয়েকটি মিউনিসিপ্যালিটি, পৌরসভা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় সংগঠনের উদ্যোগেও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সবকটি শতবর্ষী লাইব্রেরি নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

শতবর্ষী গ্রন্থাগারগুলোর প্রতিষ্ঠাতা-উদ্যোক্তাগণ:

বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের কুন্ডি পরগনার জমিদারদের উদ্যোগে রংপুর জেলার সদর থানায় কুন্ডি সদ্যপুস্করিণী গ্রামে 'রঙ্গপুর পুস্তাকাগার (রঙ্গপুর পাবলিক লাইব্রেরি)' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জমিদার রাজমোহন রায় চৌধুরী (১৭৮৬-১৮৪৭) এই লাইব্রেরির আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে যশোরের জেলা কালেক্টর আর. সি. রেক্স লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠায় বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে 'যশোর পাবলিক

লাইব্রেরি'র সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। তখন নড়াইল আর নলডাঙ্গার দুই জমিদার ও তাদের সঙ্গে কিছু নীলকর সাহেব লাইব্রেরির জন্য অর্থ যোগান দিতেন। 'বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি' ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন জেলা জজ মিস্টার কেম্প আইসিএস সিভিল কোর্ট কম্পাউন্ডে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বিবির পুকুরের পূর্ব পাড়ে সরকারিভাবে লাইব্রেরির জন্য জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়। এসময়ে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত, বিনয়ভূষণ গুপ্ত, নওয়াব মীর মোয়াজ্জেম হোসেন প্রমূখ সহযোগিতা করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে তদানীন্তন ম্যাজিস্ট্রেট ও রেজিস্ট্রার মি. হ্যানরি রাসেল বগুড়া শহরে স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারি ও ভূস্বামীদের সহযোগিতায় একটি পাবলিক লাইব্রেরি (উডবার্ন সরকারি গণগ্রন্থাগার) স্থাপন করেন। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে বগুড়ার রাজস্ব আদায়কারী টি. পি. লারকিন্স লাইব্রেরির উন্নতিকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও পাকা ভবন তৈরি করেন। এই লাইব্রেরির জন্য বগুড়ার সৈয়দ আলতাফ আলী এবং রংপুরের কাকিনার মহারাজা মুক্তহস্তে সাহায্য করেছেন।

ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সম্পাদক অভয় চন্দ্র দাস ঢাকার পাটুয়াটুলীতে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে মন্দিরের দোতলার একটি কক্ষে পাঠগৃহ (রামমোহন রায় পাঠাগার) সূচনা করেছিলেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাগারটির উন্নয়নকল্পে ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা আজমসহ আরও অনেকেই যথেষ্ট অনুদান দিয়েছিলেন। কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ১৮৭২ (১২৭৮ বাংলা) খ্রিস্টাব্দে কবি ভোলা নাথের আহ্বানে মুকুন্দলাল সাহা, রায়বাহাদুর জলধর সেন, কাঙ্গাল হরিনাথ, শিবচন্দ্র, অক্ষয় মৈত্রেয়, মথুরা নাথ কুণ্ডু, রাধা বিনোদ সাহা, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখ জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির প্রচেষ্টায় 'দরিদ্র বান্ধব পুস্তকালয়' (কুমারখালী পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ঢাকার নবাব খাজা আবদুল গণি ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে 'নর্থব্রুক হল পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন। নবাব আবদুল গণির পুত্র নবাব আহসান উল্লাহ, জমিদার ব্রজেন কুমার রায়, কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়, অভয়চরণ দাস, গোবিন্দ লাল বসাক প্রমুখ ব্যক্তির পৃষ্টপোষকতায় এটি একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারে পরিণত হয়।

১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দ, বাংলা ১২৯০ সনে নীলফামারীতে ব্রাহ্মসমাজের আর্দশে প্রভাবিত হয়ে কিছু সংস্কারমুক্ত হিন্দু ব্যক্তিত্ব 'নীলফামারী সম্মিলনী লাইব্রেরি' (নীলফামারী সাধারণ গ্রন্থাগার) প্রতিষ্ঠা করেন। পরে তমিজউদ্দিন চৌধুরী এবং মজিবুর রহমান চৌধুরী নামে দুই ব্যক্তি গ্রন্থাগারের জন্য ৫৭ শতক জমি দান করেন। নাটোরের রাজা আনন্দনাথ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিটি ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'রাজশাহী সাধারণ পুস্তকালয়' (রাজশাহী সাধারণ গ্রন্থাগার) নামকরণ করা হয়। দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায় দেড় বিঘা জমি লাইব্রেরিকে দান করলে কেদারনাথ প্রসন্ন লাহিড়ী ১০ কক্ষবিশিষ্ট দ্বিতল ভবন তৈরি করে দেন এবং এখানে লাইব্রেরির কার্যক্রম চালু হয়। ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তি একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য কুমিল্লার জেলা প্রশাসক মিস্টার এ.এইচ. স্ট্রাইনের সঙ্গে আলোচনা করেন। জেলা প্রশাসক পাঠাগারের ভূমি এবং ভবনের জন্য ত্রিপুরা জেলার চাপলা রুসনাবাদের জমিদার মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর-এর শরণাপন্ন হন। মহারাজ কুমিল্লা শহরের কান্দিরপাড়ে নিজস্ব ১০ বিঘা ৫ কাঠা ১৪ ছটাক ভূমিসহ 'বীরচন্দ্র মাণিক্য

গণপাঠাগার ও মিলনায়তন' নির্মাণ করে দেন।

১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে জমিদার বরদা গোবিন্দ চৌধুরীর দত্তকপুত্র অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরী নিজ-নামানুসারে পাবনা শহরে 'অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন। অন্নদা গোবিন্দ চৌধুরীর পুত্র শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা গোবিন্দ চৌধুরী এই লাইব্রেরিকে আরও সমৃদ্ধ করেন। তেরো শতাংশ জমির ওপর দু-কক্ষের একটি অট্টালিকায় লাইব্রেরির যাত্রা শুরু হয়। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্থানীয় মুসলিমদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে এবং গবেষণা ও প্রচারের উদ্দেশ্যে 'আঞ্জুমান-ই-ইসলাম' (শাহ্ মখদুম ইনস্টিটিউট পাবলিক লাইব্রেরি) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে 'শাহ্ মখদুম দরগাহ এস্টেট' এই সংগঠনকে কিছু জমি দান করে এবং শ্রীরামপুর মৌজায় ৬ একর জমির উল্লেখযোগ্য অংশে লাইব্রেরি-ভবনটি অবস্থিত।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে কুড়িগ্রাম মহকুমা শহরের কোর্ট প্রাঙ্গণে মহকুমা প্রশাসন, শহরের শিক্ষানুরাগী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে 'কুড়িগ্রাম ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি' (কুড়িগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাকালে স্থানীয় জোতদার ও ম্যাজিস্ট্রেট যোগেশ চন্দ্র রায় চৌধুরী সহযোগিতা করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ ফেব্রুয়ারি খুলনা শহরের কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি একটি পাবলিক লাইব্রেরি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। নড়াইলের জমিদার প্রয়াত উমেশ চন্দ্র রায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র রায় কিরণ চন্দ্র রায়বাহাদুর আর্থিক সহায়তা করেন। খুলনা পৌরসভা ও টাউন হল সংলগ্ন একটি কক্ষে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে উদ্বোধন করা হয় 'উমেশ চন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরি'।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায়ের আমন্ত্রণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটোরে আগমন করেন। মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরামর্শে মহারানি ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুবর্ষ ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে নাটোরের লালবাজারে 'ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাজা বই, দেওয়ালঘড়ি এবং এককালীন অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের পরে লাইব্রেরিটি লালবাজার হতে কাপুড়িয়া পট্টির ৫০ শতাংশ নিজস্ব জমিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরে 'বাকল্যান্ড ঘাট পাবলিক লাইব্রেরি ও রিডিং হল' (চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠা হয়। শোনা যায়, কলকাতায় অবস্থিত চট্টগ্রাম সমিতির উদ্যোগে লাইব্রেরিটি গড়ে উঠেছিল। চিটাগাং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নূর আহম্মদের কর্মতৎপরতায় গ্রন্থাগারের সদস্য ও বইয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মিউনিসিপ্যালিটি কর্তৃপক্ষ ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে লালদিঘির দক্ষিণ পাড়ে একতলা বিল্ডিংয়ে লাইব্রেরিটি স্থানান্তরিত করে এবং লাইব্রেরিটি ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম পৌরসভার অধীনে পুরোপুরি ন্যস্ত হয়।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও সুধীজনের প্রচেষ্টায় পৌরসভার রেস্টহাউজে 'কক্সবাজার পাবলিক লাইব্রেরি' প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে লাইব্রেরিটিকে 'জর্জ অ্যান্ড

মেরি হলে' স্থানান্তরিত করা হয়। প্রথম দিকে লাইব্রেরির সঙ্গে জড়িত ছিলেনঃ মহকুমা প্রশাসক বাবু তারাপ্রসন্ন আচার্য, মুন্সেফ বাবু বি.বি. মুখার্জী, ডাক্তার কে.জি. মুখার্জী, অ্যাডভোকেট এ.কে. দত্ত প্রমুখ। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নড়াইলের লোহাগড়ায় ড. মহেন্দ্রনাথ সরকার দুই বংশের (মজুমদার ও সরকার) দুটি পারিবারিক পাঠাগারকে একত্র করে 'শ্রীকৃষ্ণ লাইব্রেরি' (রামনারায়ণ পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠা করেন। এক দশক পর রামনারায়ণ সরকারের ছেলে ভুবন মোহন সরকার লাইব্রেরির জন্য একটি দ্বিতল ভবন তৈরি করেন।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর 'গাইবান্ধা নাট্য সংস্থা'র ভবনের পাশে ছোট্ট একটি ঘরে শহরের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছিল 'গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরি অ্যান্ড ক্লাব'। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের তাজহাটের জমিদার গোবিন্দ লাল রায় দাস প্রায় ২ বিঘা জমি পাবলিক লাইব্রেরি অ্যান্ড ক্লাবকে দান করেছিলেন। তখন এই জমিতে বর্তমান ভবনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। তৎকালীন মহকুমা প্রশাসককে সভাপতি এবং সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে সাধারণ সম্পাদক করে প্রথম কমিটি গঠন করা হয়।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে মুন্সিগঞ্জে জমিদার হরেন্দ্রলাল রায় বাহাদুরের দান করা ৬ শতাংশ জমিতে ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি.সি. অ্যালেন 'হরেন্দ্রলাল লাইব্রেরি'র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ৩ আগস্ট শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের এক সভায় মহকুমা প্রশাসক গঙ্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে সভাপতি নির্বাচিত করে লাইব্রেরির কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বি.সি. অ্যালেন লাইব্রেরির উন্নয়নে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। তৎকালীন বাংলার গর্ভনর লর্ড লিটন ইংল্যান্ড থেকে সুদৃশ্য রাজকীয় আলমারিসহ এক সেট বিশ্বকোষ লাইব্রেরিতে উপহার দেন।

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিদের উদ্যোগে 'বাণী লাইব্রেরী' (কোটচাঁদপুর পৌর সাধারণ পাঠাগার) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠার পর পাঠাগারটি মিউনিসিপ্যালিটির আনুকুল্য পায়। বাবু হেমচন্দ্র মুখার্জী কোটচাঁদপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান থাকাকালে (১৯১৩-৩৮) পাঠাগারটির উন্নয়নে সহযোগিতা করেন। লাইব্রেরিটি বাজারের ম্যাকলিয়ডের টালী-ঘরের পূর্ব দিকে তাজউদ্দিনের তৈরি দালানের একটি কক্ষে দীর্ঘদিন চালু ছিল।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক কৃষ্ণ দয়াল প্রামাণিক কর্তৃক পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে সাড়া দিয়েছিলেন বাড়াদির জমিদার হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী ও গৌরীশঙ্কর আগরওয়াল। জমিদার হরিশচন্দ্র রায়চৌধুরী 'হরিশচন্দ্র হল' (কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরি) নামে লাইব্রেরিভবন এবং লাইব্রেরির পাশেই গৌরীশঙ্কর আগরওয়াল পিতা রামচন্দ্রের নামে 'রামচন্দ্র পার্ক' নির্মাণ করেন। কুষ্টিয়া পাবলিক লাইব্রেরিকে নড়াইলের জমিদার ২০০ টাকা সাহায্য করেছিলেন; সহায়তায় আরও যুক্ত হন মেদিনীপুরের জমিদারি কোম্পানি, কয়েকজন নীলকর ও শিল্পপতি। নদীয়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এম.সি. মুখার্জি এবং কুষ্টিয়ার মুন্সেফ

দাশরথী দত্ত বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।

১৯১০ খ্রিস্টাব্দে জমিদার শ্রী প্যারীমোহন স্যান্যাল (১৮২৭-১৯১৮)-এর জমি ও অর্থ সাহায্যে নওগাঁয় 'প্যারীমোহন সাধারণ গ্রন্থাগার'টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার ফরাশগঞ্জে মোহিনী মোহন দাশের ভাড়াবাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনে একটি পাঠাগার (রামকৃষ্ণ মিশন পাঠাগার) প্রতিষ্ঠা করেন স্বামী পরমানন্দ। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে লাইব্রেরিটি গোপীবাগে স্থানান্তর করা হয়। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কুমিল্লায় নিজ বাড়িতে 'ঈশ্বর পাঠশালা টোল' এবং এর সঙ্গে একটি সংস্কৃত শাস্ত্রের গ্রন্থাগার (রামমালা গ্রন্থাগার) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে গ্রন্থাগারটি 'ঈশ্বর পাঠশালা টোল' থেকে রামমালা ছাত্রাবাসে, এবং ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় পৃথক ভবন তৈরি করলে গ্রন্থাগারটি সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন গোয়ালন্দ মহকুমার রাজবাড়ীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় ফরিদপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্যার জন শেফার্ড উডহেড-এর উদ্যোগে রাজবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'উডহেড পাবলিক লাইব্রেরি' (রাজবাড়ি পাবলিক লাইব্রেরি)। রাজবাড়ীর বিশিষ্ট ব্যক্তি বৃন্দাবন চন্দ্র দাসের পৈত্রিক জমির উপর লাইব্রেরিটি প্রতিষ্ঠিত। তিনি কার্যকরী কমিটির একজন সদস্য হিসেবে লাইব্রেরির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে কাজ করেছেন। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে নারায়ণগঞ্জ শহরে শীতলক্ষ্যার পশ্চিম পারে কয়েকজন সাহিত্যামোদী ও উদ্যোগী ব্যক্তির প্রচেষ্টায় 'ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরি ও ক্লাব' (আলী আহাম্মদ চুনকা নগর মিলনায়তন ও পাঠাগার) গড়ে ওঠে। এই লাইব্রেরিটিকে ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে পৌরসভার সহযোগিতায় পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার হিসেবে গঠন করা হয়।

১৯১৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে বগুড়ার শেরপুরে স্থানীয় জমিদার ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের সহযোগিতায় 'শেরপুর টাউন ক্লাব পাবলিক লাইব্রেরি' নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জের রাজারামপুরে মিঞা বংশের সহযোগিতা ও পৃষ্টপোষকতায় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে 'রাজারামপুর রিডিং ক্লাব' (রাজারামপুর হিতসাধন সমিতি ও পাঠাগার) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংগঠনের প্রথম সভাপতি ছিলেন ড. ফজলুর রহমান মিঞা এবং প্রথম সম্পাদক ছিলেন তরিকুল আলম মিঞা। প্রথমে আজিজুর রহমান এবং পরে নাজমুল হক মিঞার ঘরে গ্রন্থাগারটি পরিচালনা করা হতো। ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে কুষ্টিয়ার মহকুমা প্রশাসক ললিতচন্দ্র গুহ এবং চুয়াডাঙ্গার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্থানীয় শ্রীমন্ত টাউন হলের পূর্ব দিকের গ্রিনরুমে সভা করে 'আবুল হোসেন স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার' (চুয়াডাঙ্গা আবুল হোসেন পৌর পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠা করেন।

জমিদার সৈয়দ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর ১ একর ৬৮ শতক জমির ওপর ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে 'ঠাকুরগাঁও ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরি' (ঠাকুরগাঁও সাধারণ পাঠাগার) প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ বদরুদ্দোজা চৌধুরী এই জমি লাইব্রেরির নামে দান করেন। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে

ব্রিটিশ রাজা পঞ্চম জর্জ ক্ষমতায় এলে রাজকোষ থেকে আমোদ-প্রমোদের জন্য উপনবিশেগুলোতে অর্থ পাঠানো হয়। তা দিয়ে গোপালগঞ্জের নাট্যামোদী আইনজীবীরা 'করোনেশন থিয়েটার ক্লাব' গড়ে তোলনে। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে করোনেশন থিয়েটার ক্লাবের একটি কক্ষে 'করোনেশন পাবলিক লাইব্রেরি' (নজরুল পাবলিক লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে গোপালগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক হামিদ খান এই লাইব্রেরির জন্য ১০ শতক জমি বন্দোবস্ত করেন এবং এই জমিতে সাইদ আলী খান লাইব্রেরি ভবন তৈরি করে দেন। 'লক্ষ্মীপুর পাবলিক লাইব্রেরি ও টাউন হল' ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়, লক্ষ্মীপুর দালালবাজারের জমিদারপত্মী পূর্ণশশী চৌধুরানী প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রায় ২১ শতাংশ ভূমি দান করেন।

তথ্যসূত্রঃ

০১. 'বাংলাদেশের গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার', ফজলে রাব্বি; ফেব্রুয়ারি ২০০৩; অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা
০২. 'বাংলাদেশের শতবর্ষের গণগ্রন্থাগার', মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান; ফেব্রুয়ারি ২০০৩
০৩. 'রংপুরের ইতিহাস', ড. মুহম্মদ মনিরুজ্জামান; এপ্রিল ২০১২, গতিধারা, ঢাকা
০৪. 'বিক্রমপুরের পুরাতন পাঠাগার', মো. শাহজাহান মিয়া; বিক্রমপুর সাহিত্য সাংস্কৃতিক পরিষদ, আগস্ট ২০১৪ (অনলাইন সংস্করণ)
০৫. 'সিলেটে ইংরেজি শিক্ষার পথিকৃৎ প্রাইজ ও তাঁর স্মৃতিতে লাইব্রেরি', সেলিম আউয়াল; দৈনিক সিলেট মিরর, সেপ্টেম্বর ২০২০
০৬. 'শতবর্ষী গ্রন্থাগার পরিচিতি', হাফিজা খাতুন এবং আশরাফুল আলম ছিদ্দিক; ফেব্রুয়ারি ২০২২

আর্থিক সংকটে বন্ধ হয়েছে ইলা মিত্র পাঠাগার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রকাশ: ১৩ অক্টোবর ২০২১, দৈনিক প্রথম আলো

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় দরজায় লাগানো তালাতেও জং ধরেছে। প্রবেশপথ ছেয়ে আছে আগাছায়। সামনের খোলা জায়গায় গজিয়েছে ঘাস। দেখে মনে হয়–দীর্ঘদিন সেখানে কারও পা পড়ে না। এমন চিত্র ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের নামে নির্মিত পাঠাগার ও সংস্কৃতি কেন্দ্রের। চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল উপজেলার নেজামপুর রেলস্টেশনের পেছনে এই পাঠাগার। বিপ্লবী ইলা মিত্রের ১৯তম মৃত্যুবার্ষিকী আজ বুধবার। এ উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সরেজমিনে নাচোলে তাঁর নামের পাঠাগারটির বেহাল চোখে পড়ে।

স্থানীয় লোকজন জানান, আট মাসের বেশি সময় ধরে পাঠাগারটি বন্ধ। এ পাঠাগার থেকে বই নিয়ে পড়াশোনা করত ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীরা। গল্প-উপন্যাসসহ বিভিন্ন ধরনের বইপড়ুয়া বাঙালি হিন্দু, মুসলিম ও ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর পাঠকরাও বই নিতেন পাঠাগার থেকে।

আদিবাসী ছাত্র পরিষদের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক দিলীপ পাহান পাঠাগারটি সম্পর্কে বলেন, নাচোলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর বেশিরভাগ লোকজনই গরিব। অভাব-অনটনের কারণে অনেক শিক্ষার্থী স্কুল-কলেজ থেকে ঝরে পড়ে। যাদের আগ্রহ ও মনের জোর বেশি, তারাই কেবল টিকে থাকে। এসব শিক্ষার্থীকে সহায়তার জন্য পাঠাগারে পাঠ্যবইও রাখা আছে। বই নিয়ে পড়ে পরীক্ষাশেষে ফেরৎ দিয়ে যেত তারা। পাঠাগার বন্ধ থাকায় সে সুযোগ মিলছে না।

গ্রন্থাগারিক নির্মল বর্মণ প্রথম আলোকে জানান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় পাঠাগারটি পরিচালিত হয়। সহায়তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় গত মার্চ মাস থেকে পাঠাগারের কার্যক্রম বন্ধ। এছাড়া অনেক বই পড়ে আছে পাঠকের কাছে। পাঠাগার পরিচালনা কমিটির সভাপতি বিধান সিং বলেন, এর আগেও দুইবার তহবিল বন্ধের কারণে পাঠাগারের কার্যক্রম থেমে যায়। নাচোলের ইউএনও শরিফ আহম্মেদ জানান, তহবিলের বিষয়ে শিগগিরই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে।

কেমন চলছে পৌনে ২০০ বছরের উডবার্ন লাইব্রেরি

আসাফ-উদ-দৌলা নিওন

ছোটো থেকেই বই পড়তে ভালোবাসেন বগুড়ার খান্দার এলাকার বাসিন্দা জিয়াউল হক। নিজের সংগ্রহেও রয়েছে কয়েকশ বই। তবু ৬৭ বছর বয়সেও উডবার্ন সরকারি গ্রন্থাগারে নিয়মিত আসা-যাওয়া করছেন এই পাঠক। এখানকার সদস্যও তিনি। জিয়াউল হক বলেন: "বগুড়ার উডবার্ন লাইব্রেরি অনেক পুরোনো, ঐতিহ্যবাহী ও সমৃদ্ধশালী পাঠাগার। এখানে ভ্রমণ ও পাখিবিষয়ক বইগুলো বেশি পড়ছি। একটা সময়ে আমার চাচাতো ভাইরাও এসেছেন। তাদের দেখে আমিও পাঠাগারমুখী হয়েছি।"

শুধু জিয়াউল হক নয়। পৌনে ২০০ বছরের পুরোনো উডবার্ন সরকারি লাইব্রেরি থেকে বই পড়ে আলোকিত বগুড়ার অসংখ্য মানুষ। প্রায় সাড়ে ৪৮ হাজার বই ও পত্রিকা নিয়ে শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রত্যাশীদের পক্ষে এই লাইব্রেরি বিদ্যাচর্চার জন্য অবারিত স্থান। প্রতি মাসে গড়ে দেড় হাজার পাঠক নিয়মিত এই সেবা নিয়ে আসছেন। সরকারি আজিজুল হক কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী অমৃত কুমার মণ্ডল। তার বাড়ি নওগাঁর পত্নীতলায়। বগুড়ার সাতমাথা এলাকায় মেসে থাকেন। চাকরির জন্য পড়াশোনা করছেন। তিনি বলেন: "উডবার্ন লাইব্রেরির পরিবেশ খুব সুন্দর। এখানে এসে অনেক উপকৃত হই। কারণ এখানে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পড়ালেখা করতে পারি।"

তিনি আরও বলেন–"আমি মূলত একাডেমিক পড়ালেখা করি। পাশাপাশি এখানে কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। সেখানেও টাইপের চর্চা করতে পারি, যা দোকানে ব্যয়বহুল।" আজিজুল হক কলেজের আরেক সাবেক শিক্ষার্থী লিপি আক্তার প্রতিদিন আসেন শেরপুর উপজেলার রানীরহাট এলাকা থেকে। তিনিও চাকরিপ্রত্যাশী হিসেবে গ্রন্থাগারের নিয়মিত পাঠক।

লিপি জানান, বাড়িতে পড়ালেখার তেমন পরিবেশ পাওয়া যায় না। এখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পড়া যায়। এজন্য উডবার্ন সরকারি গ্রন্থাগারে আসা। চাকরিপ্রত্যাশীদের বাইরে বিনোদনের জন্য বই পড়ার মতো পাঠক আগের থেকে কিছুটা কমেছে। এর কারণ হিসেবে বেশিরভাগই কিশোর-তরুণদের মোবাইলে বা ইন্টারনেটের প্রতি আগ্রহকে দায়ী করছেন পাঠক ও গ্রন্থাগারের কর্মকর্তারা। জিয়াউল হক বলেন–"এখনকার ছেলেমেয়েরা বই পড়ার প্রতি উদাসীন। তারা মোবাইল, ল্যাপটপ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। এ বিষয়ে সরকারকে আরও সচেতন হওয়া উচিত। যাতে তরুণরা বইয়ের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে।"

এর মাঝেও অনেক শিক্ষার্থীকে দেখা যায় প্রাতিষ্ঠানিক সিলেবাসের বাইরের বই পড়তে। গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় এমন এক শিক্ষার্থীকে। নাম আশিক রহমান। তিনি বগুড়া সরকারি

কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। প্রায় সাত মাস ধরে এই গ্রন্থাগারে আসছেন তিনি। আশিক জানান, তার এক শিক্ষকের কাছ থেকে এই উডবার্ন গ্রন্থাগারের খোঁজ পান। এর পর থেকে আসা-যাওয়া শুরু। এখানে বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোটোগল্প পড়েন তিনি।

পাঠাগারের কর্মকর্তারা জানান–চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের তথ্য অনুযায়ী সরকারি এ গ্রন্থাগারে রেজিস্টারভুক্ত বই রয়েছে ৪৮ হাজার ৩৯২টি। এর মধ্যে বাংলা বই রয়েছে ৪৪ হাজার ৪৫টি। ইংরেজি ৪ হাজার ২৭০টি এবং অন্যান্য আরও ৭৭টি বই রয়েছে পাঠাগারে। এ-ছাড়া বাংলা দৈনিক পত্রিকা ১০টি ও ইংরেজি দৈনিক একটি, বাংলা সাময়িকী আটটি, ইংরেজি সাময়িকী একটি নিয়মিত কেনা হয়। এখানে প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো তিনটি পাণ্ডুলিপি রয়েছে। সেগুলো হলো *পদ্মপুরাণ*, *গোবিন্দকথামৃত* ও *হিরণ্যকশিপু*। এগুলো কার মাধ্যমে এখানে এসেছে তার সঠিক তথ্য নেই।

পাঠক কেমন:

জানুয়ারিতে ১ হাজার ৫৬০ জন পাঠাগারে বই ও পত্রিকা পড়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ পাঠক ১ হাজার ৩৫৮ জন। আর নারী পাঠক ১৭৪ জন। ফেব্রুয়ারিতে পাঠকের এই সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৫৩৭। এর মধ্যে পুরুষ ২ হাজার ১৩৯, নারী ৩৬২ ও শিশু ৩৬। ধারে বা বই ইস্যু নেওয়ার সদস্য রয়েছেন ৩৩১ জন–যারা নিয়মিত বই বাসায় নিয়ে পড়াশোনা করতে পারেন।

কী বলছেন লাইব্রেরির কর্মকর্তারা:

উডবার্ন সরকারি গ্রন্থাগারের সহকারী লাইব্রেরিয়ান আমির হোসেন বলেন: "বাংলাদেশে যে-কয়েকটি প্রাচীন লাইব্রেরি রয়েছে, তার মধ্যে উডবার্ন অন্যতম। প্রায় দেড়শ বছরের বেশি এই লাইব্রেরিতে অনেক পুরোনো ও রেফারেন্স বই এবং কিছু পাণ্ডুলিপি রয়েছে। এমন প্রাচীন সংগ্রহ সাধারণত অন্য লাইব্রেরিতে নেই। এসব বইয়ের মাধ্যমে প্রতিদিন অসংখ্য পাঠক সেবা নিচ্ছেন। পাঠকের উপস্থিতি আগের চেয়ে ভালো। গবেষক, শিক্ষার্থী ও কবি-সাহিত্যিক এখানে সেবা নিয়ে থাকেন।" আমির হোসেন আরও বলেন: "এই পাঠকসেবা আরও বাড়ানোর লক্ষ্যে আগামীতে দেশব্যাপী লাইব্রেরিগুলোকে ডিজিটাল করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৭১টি জেলা ও উপজেলার লাইব্রেরি ডিজিটাল করা হবে।"

শুরু যেভাবে:

বগুড়া শহরের কেন্দ্রবিন্দু এলাকার এডওয়ার্ড পৌরপার্কের পশ্চিম পাশে অবস্থিত উডবার্ন সরকারি গ্রন্থাগার। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ৪০ শতক জমির ওপর স্থাপন করা হয়েছে চারতলা ভবনের এই গ্রন্থাগার। তবে এটি একটি আধুনিক গ্রন্থাগার। এটির জন্মের ইতিহাস আরও পুরোনো।

লাইব্রেরির ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যে জানা গেছে–পুরাতন উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে জেলার খ্যাতনামা ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা ও সহায়তায় 'রয়েল উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি' স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর বগুড়ার নবাব সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী লাইব্রেরির জন্য একটি নতুন ভবন নির্মাণ করেন। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে জে এন গুপ্ত জেলা কালেক্টর সে-সময়ের বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর জন উডবার্নের নাম অনুসারে এই লাইব্রেরির নামকরণ করেন উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি।

যেসব কবি-সাহিত্যিক এসেছিলেন:
ওয়েবসাইট থেকে জানা যায়, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর বড় ভাই শরৎচন্দ্র বসু, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম, কবি কিরণ শংকর দাসের মতো ব্যক্তিরা এসেছিলেন এই লাইব্রেরিতে।

সরকারীকরণ যেভাবে:
প্রতিষ্ঠার পর দীর্ঘ সময়ের বিবর্তনে উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরির অবস্থা একসময়ে শোচনীয় হয়। পরে পাঠাগারটি সরকারীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত বগুড়া জেলা সরকারি গণগ্রন্থাগারের সঙ্গে একীভূত করা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। ওই সময়ে পাঠাগারটি ছিল শহরের শিববাটি এলাকায়।

১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের জুনে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সবার সিদ্ধান্তে এই লাইব্রেরিকে সরকারি গ্রন্থাগার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর থেকে এটির নাম হয় 'উডবার্ন সরকারি গ্রন্থাগার'। পরে পার্কের পশ্চিমে নির্ধারিত স্থানে নির্মাণ হয় ভবন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই গ্রন্থাগার পুরোদমে চালু হয়। এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন উডবার্ন সরকারি গ্রন্থাগারের লাইব্রেরি অ্যাসিসট্যান্ট আনিসুল হক। প্রায় ৩০ বছর ধরে তিনি গ্রন্থাগারে কর্মরত। আনিসুল হক বলেন: "১৯৯৫-৯৬ খ্রিস্টাব্দের দিকে এসে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই পাবলিক লাইব্রেরির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়। তখন ওই লাইব্রেরি ছিল পৌরপার্কের ভেতর। তাদের অনেক বই, আলমারি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবে এটি সরকারীকরণ হওয়ার পর আমরা পুরোনো লাইব্রেরির বইগুলো নিয়ে আসি।"

লাইব্রেরি অ্যাসিসট্যান্ট আরও বলেন: "সেই সময়ে অন্তত সাড়ে ৮ হাজার বই নতুন গ্রন্থাগারে আনা হয়। কিন্তু তাদের তালিকায় প্রায় ২৫ হাজার বই ছিল। যেগুলোর মধ্যে অনেক বই নিখোঁজ ছিল। এ-ছাড়া প্রচুর বই একেবারে নষ্টও হয়ে যায়।"

সংকট:
বিপুল বইয়ের সমাহারে সমৃদ্ধশালী এই লাইব্রেরিতে রয়েছে জনবল সংকট। উডবার্ন সরকারি গ্রন্থাগারে পদ রয়েছে ৯টি। এর বিপরীতে লাইব্রেরিতে কর্মরত মাত্র তিনজন।

সহকারী লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরি অ্যাসিসট্যান্ট ও নৈশপ্রহরী। সম্প্রতি 'রিডিং হল অ্যাসিসট্যান্ট' হিসেবে লুৎফর রহমান নামে একজন এখানে কর্মরত। তবে তিনি সংযুক্তিতে এখানে কাজ করছেন। তার মূল কর্মস্থল রাজশাহীতে। আর আউটসোর্সিং হিসেবে বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করছেন রিপন মিয়া। জ্যেষ্ঠ লাইব্রেরিয়ান, কম্পিউটার অপারেটর, টেকনিক্যাল অ্যাসিসট্যান্ট, বুক-সর্টার, অফিস সহায়ক এবং চেকপোস্ট অ্যাসিসট্যান্ট পদ দীর্ঘদিন ধরে ফাঁকা রয়েছে। লাইব্রেরি অ্যাসিসট্যান্ট বলেন–"উডবার্ন সরকারি গ্রন্থাগার হওয়া থেকেই এখানে জনবল সংকট রয়েছে। ওই পদের কাজগুলো আমরাই করে থাকি।"

সহকারী লাইব্রেরিয়ান আমির হোসেন বলেন: "প্রাচীন লাইব্রেরি হলেও এখানে পাঠকসেবা ঠিকমতো দেওয়া যায় না। কারণ এখানে ৯টি পদের বিপরীতে তিনজন আছি। প্রায় সাড়ে ৩০০ সদস্য ও বিপুল বই থাকায় এই তিন জনকে নিয়ে পাঠকদের সেবা দেওয়া কষ্টকর। এখানে জনবল বাড়ালে আমরা পাঠকদের আরও বেশি সেবা দিতে পারব।"

পাঠাগার আছে পাঠক নেই

নাটোর প্রতিনিধি/ ০৫ জানুয়ারি ২০১৯/ ইত্তেফাক

পাঠক সংকটে এখন প্রাণহীন অবস্থা নাটোরের ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরির। অথচ দেশের অন্যতম প্রাচীন একটি পাঠাগার এটি। এককালে বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করেছে; এ এলাকার মানুষকে জ্ঞানের আলোর সন্ধান দিয়েছে এই পাঠাগারটি। জানা যায়, নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের আমন্ত্রণে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছিলেন নাটোরে। তাঁর পরামর্শে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্যিক ও শিক্ষানুরাগী মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রতিষ্ঠা করেন 'ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি'। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে লাইব্রেরিটি হয়ে ওঠে শিক্ষিত, সচেতন, গণমানুষের প্রিয় অঙ্গন। রাজা, জমিদার, শিক্ষিত মানুষের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে পাঠাগারটি।

সে-সময়ে অক্ষয়কুমার মৈত্র ও রায় বাহাদুর জলধর সেন পালন করেন বই নির্বাচনের দায়িত্ব। স্যার যদুনাথ সরকার, প্রমথ বিশির মতো বরেণ্য ব্যক্তিদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে পাঠাগারের আঙিনা। ত্রিশের দশকে প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ কাজী আবুল মসউদ ও লেখক গোবিন্দ সাহার মতো ব্যক্তিদের গতিশীল নেতৃত্বে পাঠাগারটি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। তখন পূর্ণিমা তিথিতে নিয়মিত আয়োজিত হতে থাকে বিশেষ সাহিত্যসভা। বিভিন্ন সময়ে সাহিত্যসভায় অতিথি হয়ে আসেন কথাসাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যুগান্তর সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, আনন্দবাজার সম্পাদক চপলাকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ। ৪৭-এর ভারত বিভক্তির পর ষাটের দশকে পাঠাগারটি পুনরায় প্রাণ ফিরে পায়। ৭১-এ মহান মুক্তিযুদ্ধে ধ্বংসের শিকার হয় এই পাঠাগারটি।

আশির দশকে তৎকালীন এসডিও এ.এইচ.এস. সাদেকুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কথাসাহিত্যিক শফীউদ্দিন সরদারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে প্রাণ ফিরে আসে পাঠাগারটির। আর ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে জেলা প্রশাসক জালাল উদ্দিন আহমেদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বিদ্যমান নতুন ভবনের নির্মাণকাজের মধ্য দিয়ে পাঠাগারটির নতুন যাত্রা শুরু হয়। পাঁচ শতাংশ জমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা বর্তমান ভবনের তৃতীয় তলা জুড়ে মিলনায়তন নির্মাণের কাজ এখন শেষের পথে।

পাঠক সমাগমে ভরপুর নব্বইয়ের দশক ছিল পাঠাগারটির সোনালি সময়। বিভিন্ন দিবস উদযাপন, সাহিত্য-আসর আয়োজন, দেওয়াল-পত্রিকার প্রকাশনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এককভাবে আয়োজন করা হয় একুশের বইমেলার। কালের পরিক্রমায় বর্তমানে পাঠাগারটিতে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, বাংলাপিডিয়া, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসসহ ১২ হাজার বই রয়েছে। জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে একুশের বইমেলা আয়োজন ছাড়াও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, স্বাধীনতা ও জাতীয়

দিবস, বিজয় দিবস উদযাপন এবং অনিয়মিত আয়োজনে রয়েছে সাহিত্য আসর।

প্রতিবছরের ডিসেম্বরে আলোচনা-সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে বার্ষিক সাধারণ সভাটি। গত বার্ষিক সাধারণ সভায় পাঠাগারটির শ্রীবৃদ্ধি করতে অনেক প্রস্তাব আসে পাঠকদের মধ্য থেকে। এরমধ্যে 'ই-বুক চালু' ও শিক্ষার্থীদের জন্যে 'বইপড়া প্রতিযোগিতা' আয়োজন উল্লেখযোগ্য। এসব প্রস্তাবনার ব্যাপারে পাঠাগারটির সাধারণ সম্পাদক মো. আলতাফ হোসেন বলেন: "প্রয়োজনীয় কম্পিউটার সংগ্রহ করা গেলে ই-বুকের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। এর আগে বইপড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শনসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেও পাঠক বৃদ্ধি করা যায় নি।"

পাঠাগারটির পাঠক-রেজিস্টারে দেখা যায়, প্রতিদিন গড়ে সাতজন পাঠকের উপস্থিতি। একই দাবি লাইব্রেরিয়ান অসীম অধিকারীর। নিয়মিত-পাঠক কবি গনেশ পাল বলেন–'পড়ার নেশা থেকেই আসা।' পাঠক না-আসা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "শিক্ষার্থীরা এখন রয়েছে পাঠ্য বইয়ের চাপে, রয়েছে কোচিংয়ের চাপ–ওদের আর সময় নেই।" পাঠক মুহাম্মদ রবিউল হক 'বইয়ের সংগ্রহ আরও বৃদ্ধির' পরামর্শ দেন।

নাটোরের সজ্জন ও পাঠাগারটির আজীবন সদস্য মুজিবুল হক নবী–এখানে পাঠকদের নিয়মিত না-আসা প্রসঙ্গে বলেন, "ব্যস্ততা, ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা এবং ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ের কারণে লাইব্রেরিতে পাঠক থাকছে না।" পাঠাগারটির আজীবন সদস্য, গবেষক ও উপসচিব মো. মখলেছুর রহমান বলেন, "ই-বুক চালু ও সাম্প্রতিক প্রকাশনা সংযোজনের মাধ্যমে সংগ্রহ বৃদ্ধিসহ গবেষণাধর্মী বইয়ের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে পাঠাগারটিকে যুগোপযোগী করতে পারলে অবশ্যই এটি জমজমাট হবে।"

স্মৃতি নেই সালাম স্মৃতি জাদুঘরে, গ্রন্থাগারে বই সংকট

নুর উল্লাহ কায়সার

ভাষাশহীদ আবদুস সালাম। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শহীদদের অন্যমত। জাতির এই বীর সন্তানের গ্রামের বাড়ি ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার লক্ষ্মণপুর (বর্তমানে সালাম নগর) গ্রামে। বাড়ির অদূরে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে তার স্মৃতিরক্ষায় সরকারিভাবে নির্মাণ করা হয় 'ভাষাশহীদ আবদুস সালাম গ্রন্থাগার ও স্মৃতি জাদুঘর'। তবে 'স্মৃতি জাদুঘর' নামেই এর বেশি পরিচিতি। সুন্দর এ স্থাপনাটির ভেতরে সালামের কোনো স্মৃতি সংরক্ষিত হয় নি এখনও। লাইব্রেরিটির অবস্থাও নাজুক। নেই পর্যাপ্ত বই। তাই দর্শনার্থী ও পাঠকও কম।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আগে সরেজমিনে ভাষাশহীদ সালাম স্মৃতি পাঠাগার ও জাদুঘরে গিয়ে দেখা যায়, কয়েকদিন আগেই ভবনটিকে পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। সেখানে কয়েকজন পাঠক বিভিন্ন রকমের বই পড়ছেন। পুরো জাদুঘর ঘুরেও দু-একটি ছবি ছাড়া কোথাও সালামের স্মৃতি সংরক্ষণের কোনো নমুনা দেখা গেল না

পাঠাগারের লাইব্রেরিয়ান মো. লুৎফর রহমান বাবলু 'জাগো নিউজ'কে বলেন, "পাঠাগারে সাড়ে তিন হাজার বই রয়েছে। প্রায় সবই পুরাতন। বছরজুড়ে পাঠাগারটিতে পাঠকের আনাগোনা কম থাকে। পাশের রাস্তাটি সংস্কার হওয়ায় বর্তমানে পাঠকের সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও নতুন বই না থাকায় পাঠক এখানে আসতে আগ্রহ পাচ্ছেন না।" তিনি আরও জানান–পাঠাগারে বর্তমানে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভাষা আন্দোলনসহ গুরুত্বপূর্ণ অনেক বই রয়েছে। তবে ভাষাশহীদ সালামের ওপর বাংলা একাডেমি প্রকাশিত বইটি এখনও সরবরাহ করা হয় নি।

ভাষাশহীদ আবদুস সালামের ছোটো ভাই আবদুল করিম জাগো নিউজকে বলেন: "আমাদের বাড়ির কাছে স্থাপিত গ্রন্থাগারটিকে প্রাণচাঞ্চল্য রাখতে পাশের স্কুলটিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা গেলে পাঠক সৃষ্টি হবে। তা ছাড়া এটিকে স্মৃতি জাদুঘর নাম দেওয়া হলেও মূলত এখানে সালামের কোনো স্মৃতিই সংরক্ষণ করা হয় নি। ভাষাশহীদ সালাম স্মৃতি পরিষদের সভাপতি ও ফেনী রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন জানান–শহীদ সালাম বরকতদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষা এখনই দেশে সর্বস্তরে চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে।

সালাম নগরে জনসমাগম নিশ্চিত করার জন্য সেখানে একটি পার্ক অথবা বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তোলার দাবি জানান সালাম পরিষদের এ নেতা। এ বিষয়ে ফেনীর জেলা প্রশাসক আবু সেলিম মাহমুদ উল হাসান জাগো নিউজকে বলেন, "ভাষাশহীদ সালামের গ্রামের সঙ্গে আমাদের আগামী প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয়দের

দাবির সম্ভাব্যতা যাচাই করে সেখানে বিনোদনকেন্দ্র গড়ে তোলা যায় কি না তা নিয়ে ঊর্ধ্বতনদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।"

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ নভেম্বর ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার মাতুভূঞা ইউনিয়নের লক্ষ্মণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ভাষাশহীদ আবদুস সালাম। বাংলাভাষা রক্ষার আন্দোলনে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন তিনি। সেখানে গুলিবিদ্ধ হন। পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন থেকে ৭ই এপ্রিল মারা যান। পরে তাকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। পরিবার ও স্বজনদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ভাষা আন্দোলনের ৬৫ বছর পর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে আজিমপুর কবরস্থানে আবদুস সালামের কবর শনাক্ত করা হয়।

ভাষাশহীদ আবদুস সালামকে স্মরণীয় করে রাখতে তাঁর গ্রামের বাড়ি লক্ষ্মণপুরের নাম পরিবর্তন করে সেটিকে সালাম নগর করা হয়েছে। সালামের বাড়ির সামনে লক্ষ্মণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ভাষাশহীদ আবদুস সালাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ফেনীতে স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয় ভাষাশহীদ সালাম। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দে দাগনভূঞা উপজেলা অডিটোরিয়ামের নামকরণ করা হয় ভাষাশহীদ সালাম মিলনায়তন। নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হলের নাম করা হয়েছে ভাষাশহীদ আবদুস সালাম। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে সালামের নিজ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয় ভাষাশহীদ সালাম মেমোরিয়াল কলেজ। এ-ছাড়া সালামকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অন্যতম যুদ্ধ-জাহাজের নামকরণ করা হয় বানৌজা সালাম। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে ভাষাশহীদ সালামকে মরণোত্তর একুশে পদক দেওয়া হয়।

নেত্রকোনার পথে প্রান্তরে...

মো. জিল্লুর রহমান

সম্মিলিত পাঠাগার আন্দোলনের ব্যানারে আগামী ডিসেম্বরে টাঙ্গাইলের অর্জুনায় পাঠাগার সম্মেলন ২০২২ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলন উপলক্ষে 'পাঠাগার আন্দোলন: সঙ্কট, উত্তরণ ও সম্ভাবনা' শীর্ষক একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বেসরকারি গ্রন্থাগারের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে। পাঠাগার সম্মেলন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক আবদুস ছাত্তার খানের ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানতে পেরে গবেষণাকাজে ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে তথ্য সংগ্রহের সুযোগ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানাই। উদ্দেশ্য ছিল, এই সুযোগে আমাদের এলাকার পাঠাগারগুলোর কার্যক্রম আরও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং পাঠাগার-উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করা। সেইসঙ্গে নিজের দেশটাও ঘুরে দেখার একটা সুযোগ পেলে মন্দ হয় না।

তো যেই ভাবা, সেই কাজ। আবদুস ছাত্তার খান মহোদয়ের কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই পরিকল্পনা করতে থাকি কীভাবে কম সময়ে এবং কম খরচে ময়মনসিংহ বিভাগের তথ্য সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করতে পারি। এরই মাঝে গবেষণাকাজের বিভিন্ন কারিগরি দিক সম্পর্কে অনলাইন প্ল্যাটফরমে বেশ কয়েকটি প্রস্তুতিমূলক সেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরই মাঝে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে সিলেট এবং খুলনা বিভাগের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু আমার একাডেমিক শিক্ষা সফরের কারণে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শুরু করতে পারি নি।

এরপর শিক্ষাসফর থেকে ফিরে এসে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভ্রমণ-পরিকল্পনা সম্পন্ন করি। প্রথমেই নেত্রকোনা জেলায় কাজ করার চিন্তা করি, কেননা ময়মনসিংহ জেলার পর নেত্রকোনাই সবচেয়ে বড় জেলা। আর, ময়মনসিংহের সবগুলো উপজেলায় আমার আগে থেকেই ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা থাকায় ময়মনসিংহকে সবার শেষে রাখি।

এরপর ছিল আবার মাস্টার্সের ক্লাস শুরুর বিষয়। তবে, ৫ তারিখে জানতে পারি এই সপ্তাহে ক্লাস শুরু হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সেদিন রাতেই ঢাকা থেকে নেত্রকোনার ট্রেনের সময়সূচি জেনে নিই; এবং হাওর এক্সপ্রেসের সময়টাই আমার কাছে যৌক্তিক মনে হয়েছিল। পরদিন সকালেই অনলাইনে ট্রেনের টিকিট কেটে ফেলি একদম শেষ স্টপেজ মোহনগঞ্জ পর্যন্ত। রাত ১০টা ১৫ মিনিটে ছিল ট্রেন ছাড়ার সময়। সন্ধ্যার দিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রওনা দিয়ে ঢাকায় গিয়ে ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করি। ফাইজুল ভাই ময়মনসিংহের 'আলোর ভুবন' পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা এবং বইপড়া আন্দোলন, নান্দাইলের সাধারণ সম্পাদক।

নান্দাইল হচ্ছে নেত্রকোনার একেবারে কাছাকাছি উপজেলা। এজন্যই নেত্রকোনা এবং ময়মনসিংহের ভ্রমণ-পরিকল্পনা নিয়ে ওনার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। এ সময়ে দেখা হয়ে গিয়েছিল কুষ্টিয়ার খোকসা কমিউনিটি লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠাতা জসিম উদ্দিন ভাইয়ের সঙ্গে। ওনার সঙ্গেও পাঠাগার সম্মেলন এবং গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বেশ কিছু বিষয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়। এ সময়ে ফাইজুল ভাই 'জাগ্রত আছিম গ্রন্থাগারের' জন্য বেশ কিছু বই উপহার প্রদান করেন। বইগুলো আমাদের গ্রন্থাগারের সহ-সভাপতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জাকির হাসান কাউসারের কাছে রেখে আমি কমলাপুর চলে যাই।

ভোর ৫টার দিকে আমাদের ট্রেন মোহনগঞ্জ পৌঁছায়। মসজিদ থেকে ফজরের আজান ভেসে আসছিল তখন। স্টেশন মসজিদেই ফ্রেশ হয়ে, নামাজ পড়ে সূর্যোদয়ের পর আমার গন্তব্যের বিষয়ে চিন্তা করি। মোহনগঞ্জ পৌরভবনের পাশেই অবস্থিত 'মোহনগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার'। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে স্থানীয় শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কাজে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছে এই প্রতিষ্ঠান। এ পাঠাগারের সাবেক সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলম বিপ্লব স্যারের সঙ্গে আগের দিন ফোনে কথা বলেছিলাম। গত মাসেই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত বেসরকারি গ্রন্থাগারিকদের একটি প্রশিক্ষণে ওনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। স্যার আমাদেরকে দেখা করার জন্য সকাল ৯টায় সময় দিয়েছিলেন। কিন্তু তখন বাজে মাত্র ৬টা। আগের পরিকল্পনা ছিল ট্রেন কিছুটা বিলম্বে পৌঁছালে এই সময়টা মোহনগঞ্জেই অপেক্ষা করব। কিন্তু সঠিক সময়ে ট্রেন পৌঁছানোর কারণে ৩ ঘণ্টা সময় কোনো কাজ ছাড়া অপেক্ষা করতে ভালো লাগছিল না।

পাঠাগারের পাশেই একটা সিএনজি-চালিত অটোরিকশা-স্ট্যান্ডে চলে যাই। স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে পার্শ্ববর্তী উপজেলা খালিয়াজুড়ি, মদন ও আটপাড়ার দিকে যাওয়ার প্ল্যান করি। দ্রুতগতির জন্য অটো-চালকের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, ট্রেনে আসা সকল যাত্রী নিজ নিজ গন্তব্যে আগেই চলে গিয়েছে। এখন অটো'র যাত্রী ভর্তি হতে সময় লেগে যাবে। তবু অটোরিকশা করেই রওনা দিই খালিয়াজুড়ি উপজেলার বোয়ালি ঘাটের উদ্দেশে। ধীরগতির কারণে ২২ কি.মি. দূরত্বের বোয়ালি ঘাট পর্যন্ত পৌঁছতেই ৮টা বেজে গেল। খালিয়াজুড়ি যাওয়ার ব্যাপারে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে জানলাম ট্রলারে করে খালিয়াজুড়ি যাওয়া আসায় দীর্ঘসময় লেগে যাবে। যার ফলে অন্য কাজগুলো পরিকল্পনামতো সম্পন্ন করা যাবে না। এদিকে আবার খালিয়াজুড়ির কোনো পাঠাগারের ঠিকানাই আমার জানা ছিল না। এজন্যই খালিয়াজুড়ির পরিবর্তে আবার রওনা দিই পার্শ্ববর্তী মদন উপজেলার দিকে। বোয়ালি ঘাট থেকে মদন উপজেলা শহরের দূরত্ব ১২/১৩ কি.মি. মাত্র।

মোহনগঞ্জ থেকে বোয়ালি ঘাট পর্যন্ত আসার পথেই ডিঙ্গাপোতা হাওর এবং রাস্তার পাশের নাম না-জানা বিল ও হাওরগুলোর মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য দেখেছি আমরা। সেইসঙ্গে গ্রামের মানুষের সকালের ব্যস্ততাও আমাদের চোখে পড়েছে। মদন যাওয়ার পথে উচিতপুরের

হাওরগুলো মুগ্ধ করেছে আমাদেরকে। দর্শনার্থীদের কাছে এই হাওরগুলো উচিতপুর মিনি কক্সবাজার নামে পরিচিত। সকাল ৯টার দিকে মদন পৌঁছে এখানেও আমরা কোনো পাঠাগার খুঁজে পাই নি। তবে কাছেই আটপাড়া উপজেলার লোক-গবেষক হামিদুর রহমান পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক হাসান ইকবাল ভাইয়ের সঙ্গে আগের দিন যোগাযোগ করেছিলাম। তাই এবার এগিয়ে চলি সেই পাঠাগারের পথেই।

এরই মধ্যে গুগলম্যাপ থেকে আটপাড়া উপজেলায় আরও দুটি পাঠাগারের সন্ধান পেয়েছিলাম। তেলিগাতী সরকারি কলেজের পাশে অবস্থিত তেলিগাতী সাধারণ পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে। আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন পাঠাগারের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ভেতরে ঘুরে দেখতে পারি নি। তবে, স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে পাঠাগার পরিচালকের মোবাইল নাম্বার নিয়ে আসি। আমাদের পরবর্তী গন্তব্য ছিল আটপাড়া উপজেলা পাঠাগার। দৃষ্টিনন্দন ভবন থাকলেও এই পাঠাগারটির কার্যক্রম এখন বন্ধ আছে বলে জানালেন স্থানীয়রা। তারপর আমরা রওনা দিই আগে থেকেই যোগাযোগ করে রাখা লোক-গবেষক হামিদুর রহমান পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের দিকে। এ পাঠাগারটির কার্যক্রম ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হলেও নতুন ভবনে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে এ বছরের জানুয়ারি থেকে। ইতোমধ্যেই পাঠাগারটিতে বিভিন্ন বিষয়ের কয়েক হাজার বই এবং শিশুদের জন্য খেলার সামগ্রীও যুক্ত হয়েছে। খুবই মনোরম পরিবেশে এই পাঠাগারটির অবস্থান। স্থানীয় স্কুলের শিক্ষার্থী এবং এলাকার মুরুব্বীরা এখানে সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত পড়াশোনা করতে পারেন। শিশুদের জন্য বেশ কয়েকটি ব্যতিক্রমী কার্যক্রম চোখে পড়েছে এখানে।

আটপাড়া উপজেলা থেকে আমাদের পথচলা ছিল নির্মলেন্দু গুণের স্মৃতিবিজড়িত বারহাট্টা উপজেলায়। অনলাইন প্ল্যাটফরম থেকে নির্মলেন্দু গুণের গ্রামের বাড়িতে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামসুন্দর পাঠাগার, বীণাপাণি-চারুবালা সংগ্রহশালাসহ আরও বেশ কিছু কার্যক্রমের বিষয়ে জানতে পেরেছিলাম। বারহাট্টা বাজার থেকে অটোরিকশায় কাশতলা গ্রামে পৌঁছই দুপুর ১টার দিকে (নির্মলেন্দু গুণ গ্রামটির নাম দিয়েছেন কাশবন)। কিন্তু এই সময়ে পাঠাগার ও সংগ্রহশালা ছিল তালাবদ্ধ। স্থানীয়রা জানান, আগে নিয়মিত খোলা থাকলেও নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারিক না থাকায় পাঠাগারের কার্যক্রম এখন অনিয়মিত পরিচালিত হয়। এরপর আবার আমরা বারহাট্টায় চলে আসি।

গুগলম্যাপ দেখে এবার চলে যাই বারহাট্টা পাবলিক লাইব্রেরিতে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারটি উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এখনও ধুঁকে ধুঁকে চলছে। একজন গ্রন্থাগারিক সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত পাঠাগারটি খোলা রাখেন। কয়েক হাজার বই থাকলেও নতুন বইয়ের বেশ অভাব রয়েছে এখানে। পাঠকসংখ্যাও খুব কম বলে জানা গেল। এরপর আবার আমরা চললাম মোহনগঞ্জের দিকে। কেননা মোহনগঞ্জের পাঠাগারগুলোতে সকালে যাওয়া সম্ভব হয় নি। মোহনগঞ্জ পৌঁছে দুপুরের খাওয়া শেষ করে গুগলম্যাপ দেখে চলে যাই ডা.

আখলাকুল হোসাইন আহমেদ গ্রন্থকুঞ্জে।
মোহনগঞ্জের বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সাবেক এমপি ডা. আখলাকুল হোসাইন আহমেদ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সঙ্গেই ২০২১ খ্রিস্টাব্দে এই পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সপ্তাহের ৩ দিন বিকালবেলায় এই পাঠাগারটির কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা এবং মোহনগঞ্জ সাধারণ পাঠাগারের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব স্যার পাঠাগার এবং বইগুলো ঘুরে ঘুরে দেখান আমাদের। এরপর তিনি আমাদের নিয়ে যান মোহনগঞ্জ সাধারণ পাঠাগারে। এই পাঠাগারটি প্রতিদিন বিকেল ৪টা থেকে রাত পর্যন্ত খোলা থাকে। পদাধিকারবলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার পাঠাগারটির সভাপতি হলেও সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হয় খুব আড়ম্বরের সঙ্গে। শুধু মোহনগঞ্জ নয়, পুরো নেত্রকোনা জেলায় অন্যতম ৩/৪টি সচল পাঠাগারের মধ্যে মোহনগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার একটি। বিস্তৃত পাঠকক্ষ, হলরুম এবং আলাদা অফিসরুম রয়েছে পাঠাগারটির। নিয়মিত পাঠাগার খোলা রাখার জন্য এবং সবকিছু রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য বেতনভুক্ত গ্রন্থাগারিক এবং একজন কর্মচারী রয়েছেন এখানে। ম্যাগাজিন প্রকাশনাসহ নানা উদ্যোগে সারা বছরই সচল থাকে পাঠাগারের কার্যক্রম। সেইসঙ্গে রয়েছে অসংখ্য বইয়েরও সংগ্রহ। মোহনগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার ঘুরে দেখার পর আমরা রওনা দিই নেত্রকোনার উদ্দেশে। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় এ দিন আর কোনো পাঠাগার পরিদর্শন করা সম্ভব হয় নি।

নেত্রকোনা সরকারি কলেজের ছাত্র, পরিচিত এক ছোটো ভাইয়ের বাসায় রাত্রিযাপনের পর–ভোরে আবার বের হই কলমাকান্দা, দুর্গাপুরের পথে। এর আগে দেখা করি আঞ্জুমান আদর্শ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নেত্রকোনার সহকারী শিক্ষক সারোয়ার আলম জিয়া ভাইয়ের সঙ্গে। জিয়া ভাই আমাদের জাগ্রত আছিম গ্রন্থাগারের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী। আগের দিন ওনার সঙ্গে কথা বলে সময় নেওয়া ছিল। পাঠাগার সম্মেলন এবং আমাদের গবেষণাকাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তখন। এরপর সময়-স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে মোটরসাইকেলে আমরা যাই কলমাকান্দা উপজেলার নাজিরপুরে। কিন্তু এখানে কোনো পাঠাগার খুঁজে পাই নি। আগের দিন হাসান ইকবাল ভাইয়ের কাছ থেকে নেত্রকোনা জেলার সরকার-নিবন্ধিত পাঠাগারের একটি তালিকা পেয়েছিলাম। সেই তালিকায় কলমাকান্দার মাত্র একটি পাঠাগারের নাম ছিল। অনলাইনে খুঁজতে গিয়ে এই পাঠাগারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ দেখে এখানে আর যাওয়া হয় নি।

এরপর বাসে করে রওনা দিই সোমেশ্বরীর তীরে দুর্গাপুর উপজেলার ‘পথ পাঠাগারের’ অস্থায়ী কার্যালয়ের উদ্দেশে। দুর্গাপুর পৌঁছে টঙ্ক শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ ও কমরেড মণি সিংহ স্মৃতি জাদুঘর ঘুরে দেখে আমরা যাই পথ পাঠাগারের কার্যালয়ে। পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠাতা নাজমুল হুদা সারোয়ার ভাইয়ের সঙ্গে আগেই কথা হয়েছিল। ওনার নির্দেশনা অনুযায়ী পথ পাঠাগারের কার্যালয়ে গিয়ে দেখি একটি ফটোকপি ও অনলাইন সার্ভিস প্রদানকারী দোকানের একপাশে এর অবস্থান। দোকানটির পরিচালকও নাজমুল হুদা সারোয়ার ভাই নিজেই। কাজের সুবিধার্থে দুটি প্রতিষ্ঠানকেই একসঙ্গে নিয়ে এসেছেন উনি। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে ২০টি

বই নিয়ে কাজ শুরু করে নেত্রকোনা, সুনামগঞ্জ ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে এখন তিনি ১৪টির বেশি শাখা স্থাপন করেছেন। তবে, পথ পাঠাগারের 'জারিয়া ঝাঞ্জাইল রেলওয়ে স্টেশন শাখা' পরিদর্শন করে আমার খুব একটা সুখকর অভিজ্ঞতা হয় নি। যথেষ্ট সময় নিয়ে অন্যান্য শাখাগুলোও ঘুরে দেখে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে হয়তো।

সোমেশ্বরী নদী পেরিয়ে এবার আমাদের পথচলা ছিল বিরিশিরির জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্র অভিমুখে। সোমেশ্বরী নদীর সেতুর সঙ্গেই একটি সেলুনে স্থাপিত হয়েছে জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্রের ২য় শাখা। প্রায় ২ শতাধিক বই রয়েছে এই সেলুন-পাঠাগারটিতে। পাঠাগারটিতে প্রবেশের পূর্বেই আমরা দেখতে পাই একজন পত্রিকা পড়ছেন চেয়ারে বসে। বেশ কিছু বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে টেবিলের উপর। শুধুই যে সাজিয়ে রাখার জন্য নয় বইগুলো, সেটাই বুঝতে পারলাম এতে। এখান থেকে ৫ কি.মি. দূরে গাভিনা গ্রামে অবস্থিত জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্রের প্রধান শাখা। নিজস্ব দুটি ভবনে খুবই সাজানো-গোছানোভাবে পাঠাগারটির কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আগের দিন ফোনে কথা হয়েছিল পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠাতা দীপক সরকার ভাইয়ের সঙ্গে। উনি ময়মনসিংহের একটি কলেজে শিক্ষকতা করায় স্থানীয় এক ব্যক্তি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে আছেন এখন। তিনিই আমাদের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখালেন এবং জলসিঁড়ির কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন। এদিন সন্ধ্যার পর আবার দীপক ভাইয়ের সঙ্গে নেত্রকোনা শহরে সরাসরি দেখা করেছিলাম। তখন আরও বিস্তারিতভাবে নেত্রকোনার শিল্প, সাহিত্য ও বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলোর অবস্থা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। দীপক সরকার ভাই ২০১২ খ্রিস্টাব্দে জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আরও ১০ বছর আগে থেকেই জলসিঁড়ি অধ্যয়নসভার মাধ্যমে বিভিন্ন সৃজনশীল কাজ করে আসছেন।

জলসিঁড়ি পাঠকেন্দ্র থেকে আমরা যাই জারিয়া ঝাঞ্জাইল স্টেশনে। সেখানে পথ পাঠাগারের শাখা পরিদর্শনের পরই দেখি–ময়মনসিংহগামী লোকাল ট্রেন ছাড়ার সময় এখন। জারিয়া ঝাঞ্জাইল থেকে ২৩ কি.মি. দূরের শ্যামগঞ্জের টিকিটের মূল্য মাত্র ১০ টাকা। অথচ এই ১০ টাকার টিকিট কাটতেই সকলের মাঝে কত যে অনীহা দেখলাম। আমরা শ্যামগঞ্জ এসে পৌঁছলাম দুপুর আড়াইটার দিকে। আগে থেকেই যোগাযোগ করে রাখায় পূর্বধলার শাহেদা স্মৃতি পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক লেনিন খান পাঠান ভাই অপেক্ষা করছিলেন শ্যামগঞ্জ বাজারেই। ওনার সঙ্গে রওনা দিই বীর উত্তম কর্নেল তাহেরের স্মৃতি বিজরিত কাজলা গ্রামের দিকে। ক্রাচের কর্নেল পড়ে কর্নেল তাহের এবং তাঁর গ্রামের বাড়ি সম্পর্কে আলাদা একটা আবেগ কাজ করছিল। শাহেদা স্মৃতি পাঠাগারটি কর্নেল তাহেরের বাড়ি এবং কবরস্থানের পাশেই অবস্থিত।

কাজলা বাজারের সামান্য দূরে একদম পাকারাস্তার পাশেই নিজস্ব জায়গায় দৃষ্টিনন্দন পাঠাগারভবন। বেশ কয়েক হাজার বইয়ের পাশাপাশি এখানে রয়েছে নিরিবিলিতে বসে

সারা দিন বই পড়ার ব্যবস্থা। একসঙ্গে ৩০/৪০ জন পাঠক এখানে বই পড়তে পারেন। রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ম্যাগাজিনের একটি বিশাল সংগ্রহ। অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার আনসার উদ্দিন খান পাঠান তার মায়ের নামে প্রতিষ্ঠিত এই পাঠাগারে কোনো কিছুর কমতি রাখেন নি। গ্রামের নারী থেকে শুরু করে শিশু, কিশোর এবং বৃদ্ধরাও এখানে নিয়মিত বই পড়তে আসেন। সেইসঙ্গে গ্রন্থাগারিক লেনিন খান পাঠান ভাইয়ের দরদ মাখানো পরিচর্যায় পাঠাগারটি জ্ঞানের আলো ছড়াচ্ছে সর্বত্র। এখান থেকে আমরা আবার চলে যাই নেত্রকোনা শহরে। গুগলম্যাপ দেখে নেত্রকোনা শহরের দুটি পাঠাগারের খোঁজ করলেও আমরা সফল হই নি। অতঃপর দীপক ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎশেষে ময়মনসিংহের দিকে রওনা দিই আমরা।

এই ২ দিনের পথচলায় আমরা নেত্রকোনার ৯টি উপজেলায় গিয়েছিলাম। শুধু কেন্দুয়া উপজেলায় আমাদের কাজ করা বাকি ছিল। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ জেলায় ভ্রমণের সময়ে গৌরিপুর থেকে আমরা যাই কেন্দুয়ার দলপা ইউনিয়নের বেখৈরহাটি বাজারে অবস্থিত অন্বেষা পাঠাগারে। অন্বেষা পাঠাগারটি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। কয়েক হাজার বই রয়েছে এখানে। তবে অধিকাংশই বেশ পুরোনো বই। আমরা যখন পাঠাগারটি পরিদর্শন করি তখন দেখতে পাই–একজন বাঁধাইকর্মী পাঠাগারের পুরাতন বই বাঁধাইয়ের কাজ করছেন। তিনি জানালেন, ৪০০ বই বাঁধাইয়ের কাজ দেওয়া হয়েছে তাকে। স্থানীয় এক স্কুলছাত্রের কাছ থেকে জানতে পারি, জীর্ণশীর্ণ এই টিনের ঘরের পরিবর্তে অন্য জায়গায় পাঠাগারটি স্থানান্তর করার কাজ চলছে।

পুরোনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে এনে আবারও সগৌরবে পরিচালিত হবে বেসরকারি গ্রন্থাগারগুলো। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর হিসেবে কাজ করবে এসব পাঠাগার। এমনটাই প্রত্যাশা আমাদের।

আমাদের সংস্কৃতি: প্রাসঙ্গিক কথা

মুক্তার হোসেন

এখন বিশ্বায়নের যুগ। মোবাইলের কয়েকটি বাটন চাপলেই ইচ্ছেমতো পৃথিবী ভ্রমণ করা যায়। কল্পনার মতো দ্রুত সবকিছুই চলে আসে চোখের সামনেই। সাহিত্য-সংস্কৃতিও বিশ্বায়নের মতো বদলে যাচ্ছে। কোনো একটা দেশ কিংবা জাতির হাজার বছরের ঐতিহ্য ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্ম বুঝতেই পারছে না কোনটা তাঁর নিজস্ব সংস্কৃতি আর কোনটা বিদেশি। সবকিছুই তাঁর কাছে এক মনে হচ্ছে। এই মিশ্র সংস্কৃতি প্রজন্মকে তাঁর নিজস্বতা চিনতে দিচ্ছে না।

কয়েক বছর আগেও আমাদের সংস্কৃতির সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম 'কথা সাহিত্যে' যে-ধরনের আবেগ জড়ানো, মায়া জড়ানো, ভালোবাসা জড়ানো কাল্পনিক চরিত্র উঠে আসত, সেইসব চরিত্র দেদারসে পাঠক গ্রহণ করত। যে কথাশিল্পী যত বেশি কাল্পনিক অথবা রূপকথার মতো গল্প লিখতে পারত, সে তত জনপ্রিয় হয়ে যেত।

এখন আর রূপকথা কিংবা আবেগ জড়ানো গল্পের সাহিত্য পাঠককে খুব একটা টানে না। তার চেয়ে বরং কল্পবিজ্ঞান, রান্না-বান্না, প্রবন্ধ, ধর্ম এবং গবেষণামুখী বইয়ের প্রতি পাঠকের চাহিদা বেশি। তার মানে যেটা তাঁর প্রয়োজন সেটা নিচ্ছে। আবেগ, রূপকথা, আর কল্পনার প্রতি পাঠকের আগ্রহে ভাটা। মানে মানুষের কল্পনার জগৎটাই সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। আর কল্পনার জগৎ যত ছোটো হবে, মানুষও তেমন সঙ্কুচিত হয়ে যাবে, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাবে। ভালো করে লক্ষ করলে তার প্রভাব আমরা ইতোমধ্যেই আমাদের চারপাশে দেখতে পাব।

এর থেকে উত্তরণের পথ কিংবা দায়িত্ব কবি-সাহিত্যকদের উপরই বেশি বর্তায়। সমাজে, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ব আর নমনীয় মনোভাব গড়ে তুলতে কথাসাহিত্য অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সেইসঙ্গে প্রয়োজন এই প্রজন্মকে বইমুখী করে তোলা। বইয়ের পাতা উল্টিয়ে, বইয়ের ঘ্রাণ নিয়ে পড়তে পড়তে যে-আনন্দ আর জ্ঞান অর্জন করা যায়, 'ভার্চুয়াল স্ক্রিনে' তা কখনই সম্ভব নয়। এমনকি ভালো একটা বই বুকে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমানোর মধ্যেও আছে এক ধরনের শান্তি। তাই আমাদের বইমুখীই হতে হবে।

আর তার জন্যই প্রয়োজন প্রতিটি গ্রামে, মহল্লায় পাঠাগার স্থাপন এবং সেখানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। আমাদের সমাজে পাঠক সৃষ্টি করতে পারলে কমত সামাজিক অস্থিরতা, অবক্ষয়। বাড়ত হৃদ্যতা, জ্ঞানেগুণে মানুষ হয়ে উঠত নৈতিক চরিত্রবান। নৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের পথ বই, বই এবং বই।

এক জোনাকি-শোভিত রাতের মায়াকান্না

রোজিনা শিল্পী

কী দুষ্ট মেয়ে! নাম তার জোনাকি। তার দেখা মেলা ভার দিনের বেলায়। বড্ড দুষ্ট তো, তাই দিনে পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখেন মা। বিশেষ করে বিকালবেলায়। আজ জোনাকি শোভিত চিরচেনা রাত। চারিদিকে কালো অন্ধকার। ডাহুকেরা ডাকে, মনে অচেনা ভয় জাগে। আমাদের বাড়ির নাম 'কাজী বাড়ি'। বাড়িটি খালপাড় ঘেঁষে উঁচু টিলার উপর বড় বড় গাছ আর ফল, ফুল, বাঁশঝাড়ে ঘেরা। দিনের বেলায় গা ছমছম করে। ভুতের বাড়ি বলা চলে।

সেদিন জোনাকি আর আমি মিলে খাল পার হয়ে মাঠে বসে আছি। দুপাশেই পুকুর আর বিশাল বিশাল নারিকেল গাছ। কানামাছি খেলবে–বায়না ধরেছে ডলি, মনি, নীল আর জোনাকি। সবার বাড়ি কাছাকাছি মাঠের শেষ কোনায়, মোল্লাবাড়ির কনিষ্ঠ সদস্য জোনাকি ছাড়া বাকি সবাই। জোনাকির বাবা একজন ব্যবসায়ী। বাবাকে কাজের জন্য প্রায়ই ঢাকা শহরে থাকতে হয়। মা আর বোনকে নিয়ে আধাপাকা বাড়িতে থাকে জোনাকির পরিবার। খাল পার হয়ে সরু যে-রাস্তা তার শেষে, বেল-তালগাছের নিচ দিয়ে যেতে হয় জোনাকিদের বাসা। আমাদের কাজীবাড়ির একতলা ছাদ থেকে স্পষ্ট দেখা যায় ওদের বাড়ির উঠান। আমার বাবার পেশা শিক্ষকতা। জোনাকি, ডলি, মনি, নীল আর আমি সুবাহ'র বাবার কাছে প্রতিদিন পড়তে যাই।

এখন স্কুল বন্ধ, বাবা বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন। কী মজা, সাত দিন ছুটি পেয়ে আমরা ভীষণ খুশি! পাঁচ জনে মিলে কাঠের সাঁকো দিয়ে পার হচ্ছি। আসলে খালটি গিয়ে বংশাই নদীতে মিশে গেছে। আমি আর জোনাকি খেলা শুরু করলাম। আম-জাম-বটপাতা দিয়ে টস করে খেলা শুরু করলাম। কানামাছি ভোঁ ভোঁ, যাকে পাবি তাকে ছোঁ...। সেদিন সন্ধা নেমে এসেছে। পাখিদের ঝাঁক ঘরে ফিরছে। ডলি, মনি আর নীল বাসায় চলে গেলে রইলাম আমি আর জোনাকি। জোনাকি ভুলেই গেছে যে, রাত হয়ে গেলে বাসায় পৌঁছনো খুবই ভয়ংকর হবে। জোনাকি আজ বাসা থেকে লুকিয়ে খেলতে এসেছে। মা তো জানেই না জোনাকি খেলতে গেছে। মেয়েটা বড়ই দুষ্ট। তাই তার মা ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল, যেন সে বাইরে যেতে না পারে। কিন্তু মা জানেই না যে, মেয়ে জানালা খুলে লুকিয়ে খেলতে চলে গেছে সুবাহর সঙ্গে।

সন্ধা নেমে গেছে, চারিদিকে অন্ধকার, জোনাকিরা মিটিমিটি আলো দিচ্ছে। আর সুবাহকে দেখলাম দূরের একটি তালগাছের নিচে একজন লোকের সঙ্গে কী যেন কথা বলছে। অন্ধকারে ঠিক মতো বোঝা যাচ্ছে না। জোনাকি আর আমি কাঠের সাঁকো পার হয়ে, মানে কাজীবাড়ির সামনের রাস্তা দিয়েই জোনাকিদের বাড়ি যেতে হয়, আর আজ রাতে হয়ে

গেছে। আমাদের বাড়ির দারোয়ানকে দিয়ে জোনাকিকে ওদের বাড়িতে পৌঁছে দিলাম। তালগাছতলা পার হয়ে জোনাকি বাড়ি গেল। প্রায় ১৫ মিনিট পর পাহারাদার কাকু ফিরে আসলেন, আর আমিও আমার ঘরে ঢুকলাম।

মা বসে আছে হাতে লাঠি নিয়ে, ভয়ে ভয়ে কাছে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মার রাগ পানি হয়ে গেল। যাই হোক, মায়ের মমতার কথা নাই-বা বললাম। গোসল করার পর মা আমাকে কবুতরের মাংস দিয়ে নিজ হাতে খাওয়াল। একটু অবসর নিয়ে রাতে পড়তে বসাল। কবিতা মুখস্ত করে মার কাছে পড়া দিয়ে, তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

দূর থেকে আজানের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আলো ফুটলে মা জালানা খুলে দিলেন, দক্ষিণের জালানা দিয়ে রোদ আসছে। ইহ! পাখির কিচিরমিচির শব্দে আর ঘুমোতে পারলাম না। মা বাগানে হাঁটতে গেলেন। আমিও নাস্তা সেরে মার পিছু নিলাম। দেখলাম মা আরও কিছু ফুলের গাছ লাগাচ্ছেন। আমাদের পরিবারের সবাই বৃক্ষপ্রেমী। আমরা দু-বোন। আমি আর রেখা আপু। রেখা আপু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বিভাগের ছাত্রী তখন। আমি তখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ি। ঢাকাতে ছোটো ফুপুর বাসায় আপু থাকেন রেখা আপু। বাবা প্রায় আপুকে দেখতে ঢাকায় যায়।

আমাদের বাড়ি সাভারের বংশাই নদীতে মিশে যাওয়া খালের পাশেই। আমাদের ফুলবাগান থেকে কুড়িয়ে নিলাম কিছু শিউলি আর বেলি। বারান্দায় বসে মালা গাঁথা শুরু করলাম। হাতে জড়িয়ে নিলাম বেলি ফুলের মালা। আর মাকে দিলাম শিউলি ফুলের মালা। কাজীবাড়িকে এককথায় ভূতের বাড়ি বলা যায়। পুরো বাড়িটা জলপাই, আম, কাঁঠাল, তেঁতুল, বেল, তাল, লিচু, জাম, কামরাঙা, পেয়ারাসহ আরও অনেক গাছে ঘেরা। আজ জোনাকিকে দাওয়াত দিয়েছিলাম। তখন তার কাছে জানতে চাইলাম, কাল তার বাড়িতে সমস্যা হয়েছিল কি না। ও যা বলল, তা শুনে আমি অবাক। ও বলল, রাতে নাকি হোসেন কাকা তালগাছের সঙ্গে বলছিলেন। প্রায় রাতে ওনাকে তালগাছের নিচে পাওয়া যায়। মাও বলল।

হোসেন আর হাসান কাকারা দুই ভাই। পাশাপাশি বাড়ি। দুজনই বেশ ভালো। টাকা পয়সার কোনো অভাব নাই, জমিজমারও কোনও অভাব নাই। যাক সেসব কথা। বিকাল হয়ে গেছে, আমি জোনাকিকে নিয়ে ছাদে গেলাম। গিয়ে দেখি জালালি কবুতর ছাদের ছোট্ট কোণে বাসা তৈরি করেছে। এরা কিন্তু পোষা নয়। নতুন তিন জোড়া কবুতর কিনে ছাদের এক কোনায় রেখেছি। আব্বু আরও দুটো কবুতর কিনে দিয়ে ঢাকায় ছোটো ফুপুর বাসায় গেলেন। এখন জোনাকি আর আমার প্রিয় পুতুল–নাম তার ডলফিন, ওদের নিয়ে ছাদেই খেলছি। তেঁতুল গাছে অনেক তেঁতুল ধরেছে। ওয়াও!

আমি লাঠির মধ্যে একটা ছোটো কাঠি বাঁধলাম। একে কুটা বলে। দুজন মিলে ধরে গাছের

ডালে আটকালাম কুটাটা। ওমা, একি! কুটাটা ধরে টানার পর আর আসছে না! ঘন পাতার নিচে কে জানি টানছে। হঠাৎ চারপাশে বাতাস বইতে শুরু করল। পিছে তাকালাম, আরও অবাক হলাম–একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। আবার কুটা ধরে টান দিলাম, একই অবস্থা। এবার খুব ভয় পেলাম দুজনই। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে প্রায়। শেষবারের মতো আবার দুজন মিলে দিলাম টান। যা ঘটল তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। যেই টান দিয়েছি, লাঠিটা গাছের ভিতরে গেল হাত থেকে ছুটে। আমরা দুজনই চিৎকার দিয়ে পড়ে গেলাম কবুতরের বাসায় কাছেই।

মা চিৎকার শুনে আমাদেরকে ঘরে নিয়ে গেছে। পরে কি ঘটেছে মা আমাদেও আর জানায় নি। প্রায় এক মাস অসুস্থ ছিলাম। জোনাকিও অসুস্থ ছিল। মা এরপর থেকে আমাদেরকে আর একা ছাদে যেতে দিতেন না।

প্রায় দুমাস পর জোনাকিকে দেখতে যাব ভাবলাম। মাও চলল আমার সঙ্গে। সকাল সকাল রওনা হলাম। পথে হাসেম কাকার কান্নাকাটি শুনে দাঁড়ালাম। যা শুনলাম তা খুবই দুঃখজনক। তালগাছটা হঠাৎ ভেঙে হোসেন কাকার বাড়ি গিয়ে পড়েছে। তালগাছটা মৃত ছিল। হঠাৎ করেই কাল রাতের ছোটো ঝড়ে ভেঙে গেছে। কাকা নাকি সারা জীবনে যা আয় করেছেন সব এই গাছের ভিতরে জমিয়েছেন। খেয়ে না খেয়ে জমিয়েছেন। কৃপণ তো, তাই কাউকে জীবনে কিচ্ছু দেয় নি। তার বুকফাটা কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে গেল।

অদ্ভুত হলেও সত্য এই তালগাছ দশজন লোক দিয়েও এক চুল সরাতে পারল না। যার বাড়িতে তালগাছ ভেঙে পড়ে আছে উনি অনেক দয়ালু, দানশীল মানুষ। দুই ভাইয়ের মধ্যে এটাই সবচেয়ে বড় অমিল। একজন খরচ না করে শুধু জমিয়ে গিয়েছে। আর একজন নিজের দরকারে খরচ করেছেন। রশি দিয়ে বেঁধেও নিয়ে যাওয়া হলো না। দয়ালু হোসেন কাকা ও আমি অনেক চেষ্টা করেও সফল হলাম না। পরে হোসেন কাকা টাকাগুলো গাছের ভিতর থেকে বের করে বালতিতে ভরে সেই কৃপণ কাকা হাসেমকে দিলেন। এমন ঘটনা নিজ চোখে দেখব ভাবি নি।

মা আর আমি জোনাকিদের বাসায় আজ থাকলাম। সকাল হলে বাড়ি চলে এলাম। দুদিন পর, বিকেলে শুনলাম কৃপণ হাসেম কাকা মারা গেছেন। বালতিভরা সব টাকাপয়সা ওভাবেই ছিল। তিনি শান্তিতে নিজ টাকা খরচ করেও যেতে পারলেন না। সবার মুখে একই কথা।

অনেক দিন কেটে গেল, জোনাকিরা মিটিমিটি করে জ্বলছে। আজকের প্রকৃতি কেমন যেন নিথর। শীতল দমকা বাতাস শরীরে শিহরণ জাগায়। কীভাবে দিন চলে যাচ্ছে টেরই পাই নি। আমরা অনেকদিন হলো খেলতে যাই না। হঠাৎ বিকালে জোনাকি হাজির। আগের মতোই খেলতে যাই খালপাড়ের মাঠে। মাঠের নাম দিয়েছি স্বপ্নভূমি। আসলে খালপাড়ের নাম হচ্ছে কুদালধুয়া। কথিত আছে এই খাল নাকি কয়েকজন পরী সোনার কোদাল দিয়ে

কেটে তৈরি করেছে। নদীতে একজন লোক রাতে মাছে ধরতে এসে ঘুমিয়ে যায়। ভোরে আজানের ধ্বনিতে ঘুম ভেঙে দেখে একজন পরী কাদামাখা কোদাল রেখে চলে যাচ্ছে। এক রাতেই সেই খাল তৈরি হয়েছিল। এ কারণেই এই জায়গার নাম কুদালধুয়া।

শুনেছি প্রতিবছর এই খালে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটে। চৈত্র মাসে খালে পানি কম থাকে। এখন শ্রাবণ মাস, খালে অনেক পানি। রেখা আপু থাকলে কচুরিপানা দিয়ে ভেলা তৈরি করে ঘুরতাম। কাঠের সাঁকো প্রায় ডুবে যাবে মনে হচ্ছে। আমরা সেখানে প্রায়ই ওড়না দিয়ে মাছ ধরে টুনাপতি মানে পিকনিক খেলতাম। রান্না করে সবাই যার যার বাসা থেকে নিয়ে আসতাম। পরে খালে বেঁধে রাখা ডিঙিনৌকায় বসে খেতাম। সে কি ভোলা যায়! সকালে প্রায়ই ঘুরতাম। খালের পানিতে গোসলও করতাম। একদিন আমরা খালের পাশে খেলতে যাই। প্রতিদিনের মতোই।

সন্ধ্যা প্রায় হবে, কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলছি। ডলি, মলি, আছে আমাদের সঙ্গেই। গোধুলিবেলায় আমরা লুকোচুরি খেলছি। হঠাৎ পানিতে কী যেন পড়ল মনে হল। ওমা! যা ঘটল তা আমি আজও ভুলতে পারি নি। শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে আষাঢ় চলছে। খালের পানি অদ্ভুদভাবে বেড়েই চলেছে। জোনাকি পানির খুব কাছেই ছিল। সেই শব্দ শুনে ভয়ে যেই না সামনে এগোবে, ঠিক তখনই পা পিছলে পানিতে পড়ে যায়। আমরা সবাই এই দৃশ্য দেখে থমকে যাই। সজল ভাই তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। সে দেখেই পানিতে লাফিয়ে পড়ে; কিন্তু জোনাকিকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। আস্তে আস্তে সবাই খালপাড়ে এল।

ওর বাবা-মা প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছে। রাত হয়ে যাচ্ছে এখনও পানি থেকে মেয়েকে উদ্ধার করতে পারল না। চিৎকার আর শোকে আকাশ ভারী হয়ে গেছে। মা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে আছে। অন্ধকারে চারপাশ ঘেরা। তার মধ্যে জোনাকিরা সামান্য আলো দিচ্ছে। ডুবুরিদের দিয়েও খুঁজে আনতে পারেন নি জোনাকিকে। সেই জোনাকি-শোভিত রাতেও তাকে খুঁজে পাওয়া হলো না। জোনাকি সেই জোনাকিদের মিটিমিটি আলোকে ভালোবাসত। পরদিন কাছের সাঁকোর নিচে ওর পরনের জামাটা যাওয়া যায়। কথিত আছে প্রতি বছরই বংশাই নদী নাকি একজন মায়ের সন্তানকে টেনে নেয়। সেই ভয়েই তো জোনাকিকে আটকিয়ে রাখা হতো।

বংশাই নদীতে প্রায় শিশু দেখা যায়, মানে ডলফিনের মতো এক প্রাণী ভেসে উঠত, যার চোখে ধরা পড়ে তার পরিবারের দশ বছরের কন্যা নিখোঁজ হয়। যে-ভয় মানুষ বেশি করে, সে-ভয় তাকে গ্রাস করে। চোখের সামনে এসব দেখে আমি কখনও স্বাভাবিক হতে পারি নি। জোনাকি-শোভিত ঘুটঘুটে অন্ধকারে কাঠের সাঁকোর নিচে কে যেন কাঁদে, শব্দগুলো হাওয়ায় মিশে যেত। খালের মধ্যে এমন ঘটনা আজই প্রথম। অনেকেই বলে, নদী থেকে শিশু এসে নিয়ে যায়। জোনাকিকে হয়তো ওরাই নিয়ে গেছে। আজও মনে পড়ে সেই সময়গুলো। আমার মানসিক অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে। আব্বু আমাকে নিয়ে ঢাকা চলে

আসে। আজও সেই জোনাকি-শোভিত রাত। মনটা পুড়ে গেল প্রিয় জোনাকিকে ভেবে।

বেঁচে থাকার কারণ

ফারজানা ইয়াসমিন

নিতুর আজ খুব মন খারাপ। আজ তার বিবাহবার্ষিকী। খুব শখ করে হাসবেন্ড সিয়ামের পছন্দের পিৎজা অডার করেছে। সিয়াম সব সময় নিতুকে বলত, কেক-টেক আনবে না তো। ভালো লাগে না।

সিয়াম জানত নিতুর কেক ভালো লাগে। তাই প্রতিবার নিতুকে নিষেধ করে, নিজেই কেক আনত। নিতুর খুশি এতে বেড়ে যেত। ৫৫ বছরের সংসার কত মায়া, কত ভালোবাসা জমা আছে। মান-অভিমানও তো কম না।

আজ পিৎজা ডেলিভারি দিতে দেরি হয়ে গেছে রুবেলের। টাকাটা পায় কিনা সন্দেহ। অনেকে দেরি হলে টাকা দিতে যেন কেমন করে। দিলেও হাজার কথা শোনায়। কিছু করার নেই। চাকরিটা খুব দরকার তার। এই চাকরির উপর তার সংসার চলে। তার ছেলেটা আজকে খুব করে বলেছে, বাবা আজ আমার জন্মদিন। আমি পিৎজা খাব। অথচ পিৎজা কেনার টাকা নেই। এদিকে সস্তা একটা দোকান থেকে পিৎজা নিবে ভেবে ছিল। কিন্তু কাজের চাপে ভুলে গেছে। দোকান বন্ধ হয়ে গেছে সব। ছেলেটা আজ খুব কষ্ট পাবে।

রুবেল পিৎজা হাতে ডোরবেল বাজাল। নিতু দরজা খুলে দেখল পিৎজা ডেলিভারি দিতে এসেছে। নিতু কিছু বলার আগেই রুবেল বলল, ম্যাডাম সরি, দেরি হয়ে গেল। বৃষ্টির জন্য রাস্তায় কাদা। আর প্রচুর জ্যাম। সরি ম্যাডাম।

নিতু হাত নাড়িয়ে বলল, সমস্যা নেই। টাকা নিয়ে এসে রুবেলের হাতে দিল। পিৎজার প্যাকেটটা তখনও রুবেলের হাতে। নিতু রুবেলকে বলল, খুব ইচ্ছা ছিল পিৎজা খাওয়ার। কিন্তু পারব না মনে হয়।
রুবেল বলল, ম্যাডাম খেতে পারবেন সমস্যা নেই।
নিতু আনমনে বলল, আজ আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী। কিন্তু যার জন্য আনলাম সেই তো নেই পৃথিবীতে। এটা নিয়ে যান আপনি। রুবেল কী বলবে, বুঝতে পারছিল না। নিতুর চোখে পানি চকচক করছে।

রুবেল হঠাৎ তার ছেলে রনিকে ফোন করে বলল, বাবা আজ তোমার না জন্মদিন। একজন আন্টি তোমার জন্য পিৎজা গিফট করেছেন। ওনাকে সালাম দিয়ে ধন্যবাদ বলো। আর দোয়া চেয়ে নেও। নিতু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রুবেলের দিকে।
রুবেল ফোনটা এগিয়ে দিল নিতুর দিকে। নিতু মোবাইল ধরে কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, হ্যালো।

ওপাশ থেকে রনি বলল,
–আসসালামু আলাইকুম আন্টি। আজ আমার জন্মদিন। আমার জন্য দোয়া করবেন। আর অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।
–ওয়ালাইকুমুস সালাম। শুভ জন্মদিন বাবা। ভালো থেকো। দোয়া রইল তোমার জন্য। অনেক বড় আর ভালো মানুষ হও। তোমার কী খেতে ভালো লাগে বাবা?
–আমি পিৎজা পছন্দ করি। কিন্তু বাবাকে আনতে বললে, বাবা সবসময়ই ভুলে যায়।

নিতু বুঝতে পারল। বাবা ভুলে যায় না। ভুলে যাওয়ার অভিনয় করে।
নিতু রনিকে বলল, আজ আর ভুল হবে না। আন্টি দিয়ে দিলাম। ভালো থেকো বাবা।
নিতুর এক ছেলে এক মেয়ে, তারা খুব ব্যস্ত। তাই আসতে পাওে নি। মেয়ে অনলাইনে একটা 'চকলেট কেক' অডার করে পাঠিয়ে দিয়েছে। মায়ের পছন্দ তাই।
নিতু রুবেলকে কেকটা দিয়ে বলল, এটা আপনার ছেলের জন্য। ও কাটলে আমার কাটা হবে।
রুবেল তাড়াতাড়ি বলল, না ম্যাডাম। তা কী করে হয়?
নিতু বলল, এমনিতেও আমি কোক কাটতাম না। নিয়ে যান। আর আমার হাসবেন্ডের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ যেন তাকে মাফ করেন।

রুবেল কেক আর পিৎজা নিয়ে বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে এল রনি। পিছনে তার মা। কেক আর পিৎজা দেখে রনি তো মহাখুশি।
রুবেলের বউ এসব দেখে খুশি হলেও রুবেলকে বলল, এত টাকা এক দিনে খরচ করলে? মাস যাবে কীভাবে?
রুবেল হেসে বলল, পৃথিবীতে আজও ভালো মানুষ আছে জানো রূপা। তারপর সবকিছু খুলে বলল রূপাকে। রূপাও মনে থেকে দোয়া করল নিতু ও সিয়ামের জন্য। নামাজে বসেও তারা দোয়া করতে ভুলে নি।

একাকীত্বের মাঝেও আজ নিতু একটু সুখ পেল। এখন তার মনটা আগের চেয়ে অনেক ভালো।
তাই নিজের জন্য বা অন্যের জন্য কিছু করে আনন্দ নেওয়াই যায়। অনেক সময় মানুষ বেঁচে থাকার কারণ ভুলে যায়।

রঞ্জন-রশ্মির ইতিকথা

হাবিবুর রহমান

আমরা একটা ঘটনা কল্পনা করি। আমি চাইব এরকম ঘটনা যেন কার সঙ্গেই না ঘটে। তবুও চলো আমরা কল্পিত ঘটনাটা শুনি।
মনে করো তোমার বন্ধু আশরাফ। সে খুবই ডানপিটে একটা ছেলে। সারাদিন দৌড়-ঝাঁপ লাফালাফিতে ব্যস্ত থাকে সে। কারও কোনও কথাই সে শোনে না। দুষ্টামি বন্ধ করতে বললে আরও বেশি করে দুষ্টামিতে মেতে ওঠে।

গ্রীষ্মের এক দুপুর। তোমরা স্কুল থেকে ফিরছিলে। আশরাফও তোমাদের সঙ্গেই আছে। রাস্তার পাশেই একটা বিশাল বড় আমগাছ। গাছটার মগডালে একটা আম পেকে হলুদ হয়ে আছে। হঠাৎ করেই আশরাফের চোখে পরে গেল পাকা আমটা। আর সঙ্গে সঙ্গেই কারও কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে উঠে গেল গাছটাতে।

তুমি হয়ত জানো, আমগাছের ডাল নরম ও হালকা হয়। আশরাফ মগডালে উঠে যেই না ধরতে যাবে আমটা, ঠিক তখনই একটা শব্দ কানে এল তোমাদের। শব্দকে অনুসরণ করে সেদিকে তাকাতেই দেখলে আশরাফ মাটিতে পরে চিৎকার করে কাঁদছে। কান্না শুনে আশপাশ থেকে মানুষ চলে এল। তাড়াতাড়ি করে আশরাফকে রিকশাভ্যানে তুলে নিয়ে গেল কাছের কোনো হাসপাতালে। তুমিও গেলে তোমার বন্ধুর সঙ্গে।

প্রথমেই আশরাফকে নিয়ে গেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। সেখানে কর্তব্যরত ডাক্তার ভালো করে দেখে একটা এক্স-রে করে আনতে বললেন। তোমরা আশরাফকে নিয়ে গেলে হাসপাতালের রেডিওলজি বিভাগে। সেখানে কর্মরত চিকিৎসা-প্রযুক্তিবিদ আশরাফকে এক্স-রে রুমে নিয়ে গিয়ে তার আঘাতপ্রাপ্ত স্থানের একটা এক্স-রে করে দিল।

সেই এক্স-রে নিয়ে তোমরা ফিরে আসলে জরুরি বিভাগের ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার এক্স-রে দেখে বললেন, আশরাফের হাড় ভেঙে গেছে। তারপর ডাক্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেন। দীর্ঘ চিকিৎসা নেওয়ার পর সে সুস্থ হয়ে গেল। তোমরা আবার আগের মতো আশরাফের সঙ্গে খেলাধুলা করা শুরু করলে।

যদিও ঘটনাটা কাল্পনিক তবুও এরকম বহু ঘটনা সারা পৃথিবীতে ঘটে চলেছে। কারও গাছ থেকে পরে, কারও-বা সড়ক দুর্ঘটনার ফলে, অথবা কোন ভারী বস্তুর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে; এরকম বহু ঘটনার ফলে সৃষ্ট আঘাত আমাদের শরীরের বাহির থেকে দেখে বোঝা যায় না। সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের প্রয়োজন হয় এক্স-রে করানোর।

আবার ধরো, তোমার বাসার কারও হয়তো কিছুদিন ধরে কাশি হচ্ছে। তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে চিকিৎসার জন্য। ডাক্তার দেখে প্রথমেই একটা বুকের এক্স-রে করাতে বললেন। এক্স-রে দেখে ডাক্তার বললেন তার ফুসফুসের কোনও একটা রোগ হয়েছে। কিংবা ধরো, তোমার দাদু দীর্ঘদিন ধরে হাঁটুর ব্যথায় ভুগছেন। উঠলে বসতে পারেন না, বসলে উঠতে। তোমরা তাঁকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গেলে। ডাক্তার দেখার পর যথারীতি একটা হাঁটুর এক্স-রে দিল। এক্স-রে দেখে ডাক্তার বললেন তোমার দাদুর হাঁটুতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস নামাক রোগ হয়েছে।

আরও একটি ঘটনা কল্পনা করি আমরা। তোমার পাশের বাড়ির বড় কাকু অনেক দিন ধরেই উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন। এত দিন সব ঠিকই ছিল। একদিন হঠাৎ করেই তার ভীষণ মাথাব্যথা শরু হলো। তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। তাড়াতাড়ি করে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। ডাক্তার সব শুনে তোমার কাকার মাথার একটা সিটি-স্ক্যান করাতে বললেন। সিটি-স্ক্যানরুমে নিয়ে যাওয়ার পর সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসা-প্রযুক্তিবিদ সিটি-স্ক্যান করে দিলেন। সিটি-স্ক্যান দেখে ডাক্তার বললেন তোমার কাকুর একটা স্ট্রোক হয়েছে।

উল্লিখিত প্রত্যেকটি ঘটনার সমাধান হচ্ছে এক্স-রে অথবা সিটি-স্ক্যান। কারণ ডাক্তার এক্স-রে অথবা সিটি-স্ক্যান দেখার পরই সঠিক রোগটা নির্ণয় করতে পেরেছেন। এরকম হাজারও রোগ আছে যেসব রোগ সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য এক্স-রে অথবা সিটি-স্ক্যান এর প্রয়োজন পরে। কোনো কোনো রোগ ধরতে দুটি পরীক্ষা করারই প্রয়োজন হয়। তাহলে বুঝতে পারছ, এক্স-রে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার সঙ্গে কীরকম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এখনে একটা প্রয়োজনীয় তথ্য তোমাদেরকে বলে নিই। সিটি-স্ক্যান কিন্তু ভিন্ন কিছু নয়। সিটি-স্ক্যানও করা হয় এক্স-রেকে ব্যবহার করেই। ভরতে পারো, সিটি-স্ক্যান হচ্ছে এক্স-রের অত্যাধুনিক সংস্করণ।

এতক্ষণ ধরে আমি এক্স-রে নিয়ে অনেক কথা বললাম। কিন্তু এক্স-রে কীভাবে এল? কেই-বা নিয়ে এল এক্স-রেকে আমাদের কাছে, চলো জেনে আসি সেসব তথ্য।

উইলহেলম কনরাড রন্টজেন নামক একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি জার্মানির নাগরিক। এই মহান বিজ্ঞানী ৮ নভেম্বর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর পরীক্ষাগারে কাজ করার সময়ে এক্স-রে আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে এক্স-রেকে "রঞ্জন-রশ্মি" নামেও ডাকা হয়। এক্স-রে আবিষ্কার করার জন্য জনাব রন্টজেনকে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান এক্স-রে এবং সিটি-স্ক্যান ছাড়া অসম্পূর্ণ। কোটি কোটি অসুস্থ মানুষের রোগ নির্ণয়ের জন্য পৃথিবীর সকল প্রান্তে প্রতিনিয়ত এক্স-রে ও সিটি-স্ক্যানের ব্যবহার হচ্ছে। এক্স-রে আবিষ্কারের পর যখন এর ব্যবহার চিকিৎসাবিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত

হলো, তখন থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে সম্পূর্ণ নতুন ও স্বতন্ত্র একটি বিভাগেরও জন্ম হলো। এ-বিভাগের নাম হলো 'রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং' বিভাগ। রেডিওলজিস্ট এবং চিকিৎসা-প্রযুক্তিবিদরা কাজ করেন এখানে। এঁরা উভয়ে মিলে এক্স-রে এবং সিটি-স্ক্যান মেশিনের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার দ্বারা কোটি কোটি অসুস্থ মানুষের রোগ নির্ণয়ের মতো মহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে থাকেন।

সবার জন্য একটি সতর্কবার্তা দিয়ে নিই! কারও ইচ্ছে হলেই এক্স-রে বা সিটি-স্ক্যান করা উচিৎ নয়। কারণ, এক্স-রে মানব শরীরের জন্য ক্ষতিকর! তাই যথাযথ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনও অবস্থাতেই এক্স-রে অথবা সিটি-স্ক্যান করানো যাবে না।

নিচে কিছু ছবি যোগ করা হলো। যাতে তোমরা উপরের আলোচনা আরও ভালো করে বুঝতে পারো।

১ নং চিত্রঃ উইলহেলম কনরাড রন্টজেন

২ নং চিত্রঃ ভাঙা হাড়

৩ নং চিত্রঃ এক্স-রে মেশিন

৪ নং চিত্রঃ সিটি-স্ক্যান মেশিন

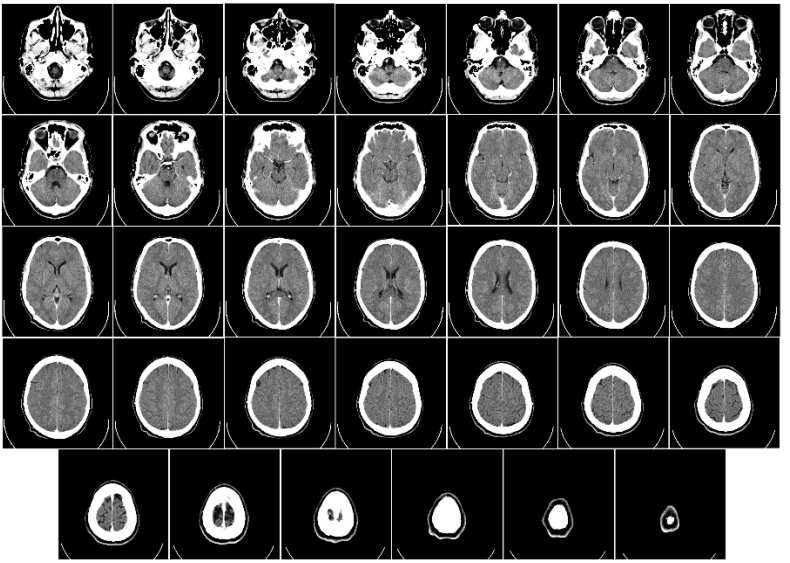

৫ নং চিত্রঃ মাথার সিটি-স্ক্যান

তথ্যসূত্রঃ

1. https://en.wikipedia.org/wiki/X-ray
2. https://en.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_R%C3%B6ntgen
3. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Roentgen2.jpg
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Femoral_fracture#/media/File:Medical_X-Ray_imaging_IYN05_nevit.jpg
5. ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Inodayahospitals_X_ray_machine.jpg
6. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/UPMCEast_CTscan.jpg
7. ttps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Computed_tomography_of_human_brain_-_large.png

মৃদুমন্দ সমীরণ

সাদিয়া ইয়াসমিন ঐতিহ্য

ইট-কাঠ-পাথরের এই শহরে রাতই যেন একমাত্র সত্য। দিনে দানবিক মিথ্যের রাজ্য–এই রাতের আঁধারে কেমন যেন শান্ত কোমল হয়ে যায়, ঠিক যেমন একজন দুর্ধর্ষ শিকারির মুখও ঘুমিয়ে গেলে শান্ত আর মায়াবী হয়ে যায়, ঠিক তেমনই। ঠিক ঘুমন্ত মুখের মতো শান্ত, কোমল! রাতের আকাশও ঘুমন্ত মুখের মতো নিষ্পাপ, মায়াবী ও কোমল। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে অনন্তকাল।

অনেক দিন বারান্দায় বসে রাত্রিবিলাস করা হয় না। তবে আজ নিছক অভ্যাসবশতই যখন বারান্দার গেলাম, তখন বয়ে যাওয়া বাতাস যেন আমার দেহকে ভেদ করে হৃদয়ে স্পর্শ করল আর কানে কানে বলল, 'থাকো না কিছুক্ষণ!' আমিও সেই আবেদন, সেই অনুরোধ উপেক্ষা না করতে পেরে থেকে গেলাম।

আজ দারুণ বাতাস বইছে। না না, একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো নয়, অনেক কোমল ভাব রয়েছে আজ বাতাসে, শান্ত কিশোরীর চিত্তের মতো শান্ত, যাকে বলে 'মৃদুমন্দ সমীরণ'। হালকা স্নিগ্ধকোমল বয়ে চলা, যেন কোনও তাড়াহুড়োই নেই, সবকিছুকে খুব আলতো করে, যত্ন করে ছুঁয়ে যাচ্ছে মায়ের মতো, স্নেহশীল প্রেমিকের মতো।

চুল খুলে দিয়েছি। মৃদুমন্দ সমীরণ, খোলা এলোকেশ–কেমন কাব্যের মতো লাগছে সবকিছু! আস্তে ধীরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, যেন চুল নিয়ে খেলছে অথবা আলতো করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চোখ বুঁজতেই মনে হলো–মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

লর্ড বায়রনের 'She Walks in Beauty' কবিতার কথা মনে পড়ে গেল, শুধু পার্থক্য হলো–আমি বারান্দায় বসে রাত্রিবিলাস করছি। রাতের আকাশের অদ্ভুত একটা রং আছে। আর কোথাও এই রং দেখতে পাওয়া যায় না। কোনো শিল্পীও হয়তো হুবহু এই রং ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি আজও। এ-রঙের শিল্পী শুধু একজনই।

এই চিরন্তন সত্য, রাতের আকাশের মতো আরেকটি অবিচল সত্য পশ্চিম আকাশে পড়ে আছে; ঠিক যেমনটি শত অবেহেলার পরও ছেড়ে যায় না সামান্য এক ভালোবাসা প্রত্যাশী প্রেমিকারা; অথবা অপেক্ষার প্রহর গোনা প্রেমিকেরা–পড়ে থাকে একটা কোনায়। এই যান্ত্রিক প্রাণহীন ভবনের সঙ্গেও যেন অদ্ভুদ প্রাণময় রাতের আকাশটা বন্ধুত্ব করে ফেলেছে। দিনের আলোতে দানবরূপী ভবনগুলোকেও রাতের আকাশের সঙ্গে কেমন কোমল দেখাচ্ছে।

আজকের এই রাত যেন দুনিয়ার সকল মুগ্ধতা নিয়ে হাজির হয়েছে। এই রাত দেখতে

দেখতে একটি গোটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া যায়! জীবনের যা কিছু কোনও কষ্ট ছাড়াই পাওয়া যায়, তার সবটাই রূপকথার মতো। এই যেমন মৃদুমন্দ সমীরণ, মুগ্ধতা সৃষ্টি করা রাতের রং, নতুন ভোরের স্নিগ্ধতা, বৃষ্টির শব্দ, বয়ে যাওয়া বাতাসের নীরব আবেদন, জ্যোৎস্নার ফুল আর অমলিন প্রাণোচ্ছল অপার্থিব কিছু স্বপ্ন...।

আমিও পেয়েছি যান্ত্রিক ভবন, রাতের আকাশ, মৃদুমন্দ সমীরণ আর এলোকেশী যুবতীর চোখ ভরা স্বপ্ন।
'ধীরে ধীরে যাও না সময়
আরও ধীরে বও
আরেকটুক্ষণ রও না সময়
একটু পরে যাও'...

পারিবারিক বন্ধনে শিথিলতা: আমরা এবং আমাদের আগামীর প্রজন্ম

আনিশাহ্ বিলকিছ

ড. তারেক শামসুর রেহমানের মতো একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, রাজনীতি-আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ও বৈদেশিক নীতির গবেষকের মৃতদেহ ফাঁকা ফ্ল্যাট থেকে পুলিশের উদ্ধার এবং কবরীর মতো একজন স্বনামধন্য নায়িকা, বহুল পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের একাকিত্বের দীর্ঘশ্বাস– [আমার একটা দুঃখ রয়ে গেল, জীবনে আমি একজন ভালো বন্ধু পেলাম না, ভালো স্বামী পেলাম না। সন্তানেরা অনেকটা যার যার মতো করে আছে। কিন্তু সঙ্গ দেওয়ার মতো একজন ভালো মানুষ আমি পাই নি, যাকে বলতে পারি এসো, এক কাপ চা খাই গল্প করি। -অধুনা] আপনাদেরকে শঙ্কিত করছে কি না আমি জানি না, তবে আমাকে নাড়া দিয়েছে, ভাবাচ্ছে। খুব গভীরভাবে ভাবাচ্ছে আমাদের প্রজন্মের জন্য, আমাদের আগামী প্রজন্মের জন্য!

আমি বোধহয় কোনোখানে দেখে থাকব, অনেক দেশেই নাকি রোগীর অবস্থা মারাত্মক হয়ে গেলে গ্লাসে হালকা গরম পানি দিয়ে এমন করে বেঁধে দেওয়া হয় যাতে রোগী বুঝতে পাওে, তার আপনজন শেষযাত্রায় তার হাত ধরে আছে। ভাবা যায়, আপনজনের স্পর্শ কতটা দামী! তাহলে এখন ভাবুন, তো কত দামের বিনিময়ে আমরা কিনছি এই গভীর একাকিত্ব!

আজ দুপুরেই একজন লেখকের সঙ্গে কথা বলছিলাম, কথার মাঝখানে আমি হঠাৎই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা বলুন তো, সব থাকতে দেবদাসকে বাইরে গিয়ে মরতে হলো কেন? ভদ্রলোক আমাকে উল্টো প্রশ্ন করেছিলেন, একটা মানুষের জন্যই-বা কেন পথেঘাটে মরতে হবে? আগে বলুন, তারপর আমি উত্তর দিচ্ছি। আমার উত্তর ছিল খানিকটা এরকম–আসলে দেবদাসের জৌলুশময় ঠিকানায় ওইরকম ভালোবাসা ছিল না বললেই চলে। কেবল তার মা এবং চুন্নীলাল ছাড়া। এতসবের মধ্যে খুব সাধারণ মেয়ে পারু তাকে ভালোবাসত। দেবদাস যখন বুঝতে পারে এই ভালোবাসা–যা সে হারিয়ে ফেলেছে–তখনই তার কাছে জীবন তুচ্ছ হয়ে ওঠে; যাপন করতে থাকে নেশায় আসক্ত এক জীবন; এবং তার কাছে ছুটেও চলে যায় কিন্তু বাধ সাধল অসুস্থতা, মৃত্যু।

এখন আসি এ-কথায় যে, এক জনের জন্যই কেন পথেঘাটে মরতে হয়। যাদের পারিবারিক বন্ধন খুব শিথিল, এরা সাধারণত যাদের ভালোবাসে তাদেরকেই একটা পৃথিবী ভেবে বসে। এর পেছনে নানাবিধ কারণও আছে। আবার একটা বয়সের পরে আমাদের জন্মসূত্রে পাওয়া ভালোবাসার চেয়ে অর্জিত ভালোবাসার প্রতি ফ্যান্টাসি বেশি কাজ কওে; কারণ আমরা ধরেই নিই জন্মসূত্রে পাওয়া ভালোবাসা তো আছেই, এখন অর্জিত ভালোবাসাই রক্ষা করাই দায়। আসলেই ভালোবাসার কাছে জীবন খুব তুচ্ছ হয়ে ওঠে কখনো কখনো। সে যাই হোক, দেবদাস যখন বুঝতে পেরেছিল–হয়তো এই যাত্রায় আর রক্ষা হবে না, তখন কিন্তু ফিরতে

চেয়েছিল ভালোবাসার মমতাময়ী মায়ের কাছেই!

যে পরিবার মানুষের সবটা জুড়ে থাকে সেই পারিবারিক জীবন কতটা শিথিল হয়ে গেছে, পরিবার থেকে আমাদের প্রজন্ম কতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এখন ভাববার বিষয় এটাই। আমি খুব অবাক হয়ে দেখেছি, করোনাকালীন এক বছরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুবান্ধব, সিনিয়র-জুনিয়র অনেকের কোটি কোটি অভিযোগ পরিবারের প্রতি। আবার এমনও না যে সব অভিযোগ অহেতুক, বেশিরভাগই যৌক্তিক। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা শুনেছি তা হলো, আমি বাড়িতে থাকতে থাকতে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি। কেন? জিজ্ঞেস করায় অনেকের উত্তর ছিল এরকম–ঝুলে থাকা আমার একাডেমিক লাইফ, প্রেমের বিচ্ছেদ বা ঝামেলা কিংবা নিঃসঙ্গতায় ভুগছি; কিন্তু বাড়িতে নিজের কথাগুলো কাউকে বলতে পারি না প্রাণ খুলে। আমার একমাত্র সঙ্গী 'সোশ্যাল মিডিয়া'। সেখানেও অনেকের ভালো ক্যারিয়ার, লাইফ, বিয়ে কিংবা ভালো সম্পর্ক আমাকে ভাবাচ্ছে, আমি হতাশায় ভুগছি। অথচ আমার পরিবার ভাবছে, বাড়ি আছি, খাচ্ছি, ঘুমাচ্ছি আর কি! আসলে শারীরিক স্বাস্থ্যের বাইরেও যে মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য বলে একটা কথা আছে, এটা বাঙালি পরিবারের কাছে প্রায় অপরিচিত একটা শব্দ।

আবার মহামারিতে পৃথিবী যখন একটা অনিশ্চয়তা নিয়ে চলছে, যে-কারো যেকোনো সময় মৃত্যু হতে পারে একথা জেনেও অনেক তরুণ-তরুণী ঘরে ফিরছে না, ফিরবার প্রয়োজন বোধ করছে না। অন্তত পক্ষে আপনজনদের কাছে গিয়ে মরা তো যেত! অথচ সবার আগে এই মহামারিতে মানুষের আপন ঠিকানা ঘরেই ফেরার কথা ছিল। আবার কেউ কেউ তো নানান রকম চাপ সামলে উঠতে না পেরে আত্মহত্যার মতো দুঃসাহস করে ফেলেছে। তাহলে এই ঘরে না ফেরার কারণ? কারণ তো আছেই–এক, থাকবার জায়গামাত্রই সবার ঘর হয়ে ওঠে না; দুই, পারিবারিক সদস্যদের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব; তিন, পাড়াপড়শির কানাঘুষা (যেমন: ভাবী পোলার বয়স হইল চাকরি হয় না, মাইয়া তো বড় হইছে এহনও বিয়া দেন না ইত্যাদি) এবং চার, পরিবার হয়তো তেমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারছে না যেখানে নিজের মতো করে এই সময়টা কাজে লাগানো যায়।

এই অবস্থার শেষে এরাই কেউ কেউ হয়তো একটা রুটিরুজির ব্যবস্থা করে নিবে দেশে, আবার কেউ পাড়ি জমাবে বাইরের দেশে। যারা দেশে থাকবে তাদের অনেকেই নিজ পরিবার, চাকরির দোহাই দিয়ে দায় এড়িয়ে যাবে বাবা-মা-পরিবারের। যারা বাইরের দেশে থাকবে তাদের অবস্থা হয় অনেকটা 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের নায়ক অতীনের (বাবলু) মতো। এদের শিক্ষাজীবনের তীব্র অর্থাভাবের মুক্তি ঘটে, ব্যক্তিজীবনে স্থিরতাও আসে, কিন্তু পারিবারিক বন্ধনে ভৌগোলিক দূরত্বের সঙ্গে চলে আসে একটা মানসিক দূরত্বও। এই উপন্যাসে আমরা দেখি বাবলুর বাবা অসুস্থ থাকলেও সে আমেরিকা থেকে আসতে পারে নি চাকরির অজুহাতে। তার বাবা তীব্র একাকিত্বকে মোকাবিলা করে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। আমাদের বর্তমান সময়টাতেও কি তাই হচ্ছে না!

সফলতার নাম দিয়ে নির্দিষ্ট একটা সীমা বেঁধে দিই, যে তুমি এটা করলে সফল আর না করতে পারলেই জীবন শেষ। ছেলেমেয়েরা করেও তাই, জীবন থেকে অনেক কিছু বাদ দিয়ে কেবল একটা লক্ষ্যাভিমুখী জীবন-যাপন করে। তারপর তার ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও ঘটতে থাকে একই রকম ঘটনা। চলতেই থাকে বৃত্তাকার এই প্রক্রিয়া। এই গৎবাঁধা নিয়মে তথাকথিত সফল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও জীবন-সায়াহ্নের সময়টুকু পার করেন গভীর একাকিত্বে, তারপর হয়তো কোনো একদিন একলা স্বজনহীন ঘরে মরে পরে থাকেন।

আমার মনে হয় আমরা এমন একটা সময়ে চলে এসেছি, যেখানে দৃশ্যত পরিবারের মতো একটা প্রতিষ্ঠান আছে বটে কিন্তু আসলে মানসিকভাবে নেই অতটা। তাই এখনই সময় প্রত্যেক সন্তানকে পারিবারিক শিক্ষা-স্নেহ-শাসন-সম্মান এবং সুস্থ বিনোদনের মধ্য দিয়ে একজন মানবিক মানুষ হিসেবে করে গড়ে তোলা, ডিভাইস নির্ভর তরুণ-তরুণীদেরও উচিত কেবল বস্তুনির্ভর সফলতার চিন্তা না করে আমাদের কাছের মানুষ, প্রিয়জনদের আবেগ-অনুভূতির দাম দিতে শেখা, যেকোনো খারাপ অবস্থায় পাশে থাকার মানসিকতা তৈরি করা। যাতে করে আর একটি সন্তানকেও আর হতাশায় ভুগতে না হয়, আত্মাহুতি দিতে না হয় পারিবারিক সাপোর্টের অভাবে। সেইসঙ্গে আর কোনও বাবা-মারও যেন অন্তিম যাত্রা না হয় প্রবল একাকিত্ব আর গভীর নিঃসঙ্গতায়। সবশেষে একটি মানবিক পৃথিবীর প্রত্যাশা।

সব হারিয়েছি যমুনায়

মো. ফরিদুল ইসলাম

যমুনা নামটা শুনলেই কেমন জানি বুকটা ধকবক ধকবক করে ওঠে। কারণ এই যমুনায় হারিয়েছি আমার মা, বাবা, ভাই, বোন, ভাবি ও আদরের নিষ্পাপ ভাতিজাকে। রক্ষা পায় নি মাথা গোঁজার ঠাঁই বসতবাড়িটুকুও।

বলছি বর্ষাকালের কথা। সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। চারদিক যন থর থর করে কাঁপছে। এর মধ্যে বাবা বাড়িতে নেই, ভাইকে নিয়ে গরু চড়াতে গেছে মাঠে। চারদিকে মাঠভরা ফসল বাতাসে যেন আপন মনে দুলছে। এবার ফসলও খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু ঠিকমতো ঘরে তুলতে পারবে কি না এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় সবাই। কারণ এখন তো বর্ষা মৌসুম, সময়মতো ফসল না তুলতে পারলে সারা বছর খাবে কী!

নদীর পানি ক্রমেই বেড়ে চলছে, সন্ধ্যার মধ্যে পানি প্রায় বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছে। এখন সন্ধ্যা গড়িয়েছে। পানি বাড়ার সঙ্গে হচ্ছে মুষলধারায় বৃষ্টি। টিনের ঘরে বৃষ্টির আওয়াজ বেশ জোরেই শোনা যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন ঘন, প্রতিবারের ঝলকানিতে চারিদিক দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। বাড়ির চারপাশ ভরাট হয়ে গেছে পানি দিয়ে, যেন নদীর পূর্ণতা পেয়েছে।

বাড়ির সবাই খুব চিন্তায় আছে, এখনও যে বাবা, ভাই গরু নিয়ে মাঠ থেকে বাড়ি ফেরে নি। সন্ধ্যার পর আমি বের হলাম তাদের সন্ধানে ছোটো একটি ডিঙি নৌকা নিয়ে। জলভরা উত্তাল যমুনায় এদিক ওদিক খুঁজতে লাগলাম, নদীর মাঝে একা একা ভয়ও করছে। নদীর ছোটো ছোটো ঢেউয়েই ডিঙি নৌকা এশবার এদিকে একবার ওদিকে কাত হচ্ছে! তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম।

বৃষ্টি অনবরত হয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, যার ফলে অল্প সময়ের জন্য হলেও চারপাশ দেখা যাচ্ছিল। এদিক ওদিক খুঁজছি আর ভাবছি বাড়ির সবার কথা–কী করছে তারা! বাবা, ভাই কোথায় আছে, আদৌ পাব কি না তাদের সন্ধান। বিশেষ করে আদরের অবুঝ ভাতিজার কথা খুব বেশি মনে পড়ছে।

রাত্রি শেষের দিকে, হালকা আলোয় দেখা যাচ্ছিল চারপাশ, কিন্তু পানি ছাড়া কিছুই দেখতে পারছি না কোনও দিকে। মনে হচ্ছে আদৌ কি আছে আমাদের বসতভিটা! খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ পশ্চিম দিকে চোখ পড়ল, দেখি ওই দূরে একটা গাছের মতো দেখা যাচ্ছিল। নৌকা নিয়ে আস্তে আস্তে ঠিক ওখানে গেলাম। দেখালাম সেই আমগাছটা, আর কোনও স্মৃতিচিহ্ন নেই এই গাছটি ছাড়া।

হারিয়েছি বসতভিটা, হারিয়েছি পরিবারের সদস্যদের। এখন দিশেহারা হয়ে গাছের কাছে বসে কান্না করতে লাগলাম। আর বলতে লাগলাম ওহে নিষ্ঠুর যমুনা নদী, সবাইকে নিয়ে আমাকে কেন রেখে দিলে?

১.
নাম: বাতিঘর আদর্শ পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃ চৌরাকররা, পোঃ চৌধুরীমালঞ্চ, উপজেলা: টাঙ্গাঈল সদর
মোবাইল: ০১৭৬১৮৫৭৩৯৯
ইমেইল: batighar.ap2010@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫০০

২.
নাম: জ্ঞানান্বেষণ পাঠাগার
ঠিকানা: রামু, কক্সবাজার
মোবাইল: ০১৮৭৩১৮৮১৩৮
ইমেইল: gyananneshon@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০০+

৩.
নাম: অর্জুনা অন্বেষা পাঠাগার
ঠিকানা: অর্জুনা অন্বেষা পাঠাগার
মোবাইল: ০১৭৫২০২৩১৭৭
ইমেইল: anneshapatagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩০০০+

৪.
নাম: সেবাদান সমাজ কল্যাণ গণগ্রন্থাগার
ঠিকানা: গ্রাম+ডাকঘরঃ পাজিয়া, উপজেলা: কেশবপুর, জেলা: যশোর
মোবাইল: ০১৭৪৮৯৭৯৬৩৮
ইমেইল: orgssks@gmail.com
বই সংখ্যা: ৯৫০

৫.
নাম: শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: ৪৯১, পশ্চিম নাখালপাড়া (২য় তলা), তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
মোবাইল: ০১৬৭১০৯৬৯৪৪
ইমেইল: sbspathagar1989@gmail.com
বই সংখ্যা: ৬৫০০

৬.
নাম: আশার আলো পাঠাগার ও সংগ্রহশালা
ঠিকানা: পুলেরঘাট বাজার,পাকুন্দিয়া রোড,পাকুন্দিয়া-কিশোরগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭৩৯৭৬৭৪৮৪
ইমেইল: asharalogorup84@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০+

৭.
নাম: আলোর ফেরী পাঠাগার
ঠিকানা: সিংহেরাকাঠী, বাউফল, পাটুয়াখালী
মোবাইল: ০১৭১৭৯৮৩৪৭৩
ইমেইল: alorferipatthagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৩২৫

৮.
নাম: টেন বুকস লাইব্রেরি
ঠিকানা: তারাকান্দি, সরিষাবাড়ি, জামালপুর
মোবাইল: ০১৭০৭৯৯৬৩৬৯
ইমেইল: hn07996369@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৯০

৯.
নাম: আর.এন.বৈশাখ গনপাঠাগার
ঠিকানা: তাহিরপুর
মোবাইল: ০১৭১৮৭৪২৪৯২
ইমেইল: chandasuvo1@gmail.com
বই সংখ্যা: ৬৯১

১০.
নাম: মনোহরপুর গণগ্রন্থাগার
ঠিকানা: গ্রাম-মনোহরপুর, ডাকঘর- রাজগঞ্জ, উপজেলা- মনিরামপুর, জেলা-যশোর।
মোবাইল: ০১৯৪৬৫০৯৯২৮
ইমেইল: monohorpurpubliclibrary1986@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭০০+

১১.
নাম: সচেতন শিক্ষার্থী সংঘ (সশিস)পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম:সাদী ,পোস্ট:মণ্ডলের হাট ,থানা:উলিপুর ,জেলা:কুড়িগ্রাম
মোবাইল: ০১৭২০৫৫১০৮৭
ইমেইল: palash_roy87@yahoo.com
বই সংখ্যা: ২৫০০

১২.
নাম: জাগ্রত আছিম গ্রন্থাগার
ঠিকানা: গ্রাম + ডাকঘর : আছিম বাজার, উপজেলা : ফুলবাড়ীয়া, জেলা : ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ০১৯৪২৩১৩৬৭৯
ইমেইল: Jagrotoasimlibrary@gmail.com
বই সংখ্যা: ১২৮৭

১৩.
নাম: লোকগবেষক হামিদুর রহমান পাঠাগার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঠিকানা: গ্রামঃ শুনই (দশভাগিয়া), ডাকঘরঃ শুনই (বড়বাড়ি), উপজেলাঃ আটপাড়া, জেলাঃ নেত্রকোণা-২৪৭০
মোবাইল: ০১৭১২১৯৪৪৫৭
ইমেইল: info.gram.pathagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ৯৬০

১৪.
নাম: সাতভিটা গ্রন্থনীড়
ঠিকানা: ডাকঃ হিঞ্জুলী, উপজেলাঃ উলিপুর, জেলা ঃ কুড়িগ্রাম
মোবাইল: ০১৭৩৯৪২৬৯০৪
ইমেইল: Jaynalabedin865@ gmail. Com
বই সংখ্যা: ১২৬৫

১৫.
নাম: দীপশিখা গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা
ঠিকানা: গ্রাম: ফেকামারা, পোস্ট: জালালপুর, উপজেলা: কটিয়াদী, জেলা: কিশোরগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৭৪১৭৬১০৫২
ইমেইল: nayeemktd@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫১০

১৬.
নাম: দড়িপাড়া-রামকৃষ্ণপুর গণগ্রন্থাগার
ঠিকানা: দড়িপাড়া-রামকৃষ্ণপুর বাজার।
মোবাইল: ০১৭৬০১৫৪৮৫৮
ইমেইল: samapon600@yahoo.com
বই সংখ্যা: ৩০০+

১৭.
নাম: সৃষ্টি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও গ্রন্থাগার
ঠিকানা: নাহিরাজপারা, ডাক নিয়ামতপুর, উপজেলা করিমগঞ্জ। জেলা কিশোরগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭১১৩১০৪৮৩
ইমেইল: ashraf63@rocketmail.com
বই সংখ্যা: ১২৫০

১৮.
নাম: বিদ্যাকোষ গ্রন্থাগার
ঠিকানা: বুজরুক মুন্দিয়া, বুজিডাঙ্গা মুন্দিয়া, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।
মোবাইল: ০১৮৪১৯০১৯৪৫
ইমেইল: rakibulamth@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩৫

১৯.
নাম: রানীপুর জিলানী পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম : রানীপুর, ডাকঘর : গড়িয়াবুনিয়া হাট, উপজেলা : বেতাগী, জেলা : বরগুনা।
মোবাইল: ০১৩২১১৮৩৩৮৩
ইমেইল: gelanipathagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ৮০০

২০.
নাম: GSB-Library
ঠিকানা: তারাবুনিয়া ব্রিজ সংলগ্ন "আইডিয়াল কিন্ডার গার্টেন" প্রাঙ্গন, গ্রাম+ইউনিয়ন-সুটিয়াকাঠি,উপজেলা-নেছারাবাদ,জেলা-পিরোজপুর।
মোবাইল: ০১৭৮৩৪৩৫৯৯৯
ইমেইল: jimbepary13@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩০০+

২১.
নাম: বাবুই পাঠাগার
ঠিকানা: আলেয়া ভিলা ৩য় তলা, কালীবাড়ি রোড, পিরোজপুর
মোবাইল: ০১৭১৯৮৪৮৮৮৩
ইমেইল: babuipatrika2007@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭০০

২২.
নাম: বিদ্যাঝুড়ি গণপাঠাগার প্রকল্প
ঠিকানা: মুক্তির মোড়, নওগাঁ।
মোবাইল: ০১৭৫৯১৯৯২৩৩
ইমেইল: zrcs.naogaon@mail.com
বই সংখ্যা: ৫০০+

২৩.
নাম: জ্ঞানদীপ গণ গ্রন্থাগার
ঠিকানা: গ্রাম- কররা কাওয়ালজানী কান্দাপাড়া , পোঃ- উয়ার্শী, উপজেলা- মির্জাপুর, জেলা - টাঙ্গাইল।
মোবাইল: ০১৬৭৪৯৭৮৫৫৭
ইমেইল: gyandeepganogranthagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫৫১

২৪.
নাম: বন্ধু পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃ আঠার পাইকা, ডাকঘরঃ মন্ডলের হাট, উপজেলাঃ উলিপুর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
মোবাইল: ০১৫১৮৩৩৭৮৬০
ইমেইল:
বই সংখ্যা: ৯৫৮

২৫.
নাম: শেখ নবীর উদ্দিন আদর্শ পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম-ঝাঐল, ডাকঘর-শহীদনগর, উপজেলা-কামারখন্দ, জেলা-সিরাজগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৭১১৯৪৪১০৬
ইমেইল: snap.org.bd@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩৫৫০

২৬.
নাম: শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা আহসান উল হাবীব স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: এস,এস রোড, সিরাজগঞ্জ (মেহমান দোকানের উপর)
মোবাইল: ০১৭১৮৪৩১৪২১
ইমেইল: mdgiashuddin8@gmail.com
বই সংখ্যা: ২০০০ +

২৭.
নাম: সুলতানা রাজিয়া পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘরঃঃ, ছান্দিয়াপুর উপজেলাঃ সাদুল্লাপুর, জেলা গাইবান্ধা।
মোবাইল: ০১৭১৫৪১২২৫৫
ইমেইল: belal.sadullapur@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৭০০

২৮.
নাম: পাঠাগার ৭১
ঠিকানা: মুক্তিযোদ্ধা নয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়
মোবাইল: ০১৭১৮৮৪৩১২০
ইমেইল: aamoyna70@gmail.com
বই সংখ্যা: ১২০

২৯.
নাম: মজুমদার পাবলিক লাইব্রেরি
ঠিকানা: দক্ষিণ মাসকরা, মাসকরা একতাবাজার ৩৫৮৩ কুমিল্লা
মোবাইল: ০১৮১৯৯৮৫৩২৯
ইমেইল: Majumderpubliclibrary1@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫৫০

৩০.
নাম: গ্লোরিয়াস লাইব্রেরি
ঠিকানা: ছোট গুড়গোলা, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর
মোবাইল: ০১৭৫০১৮৯৬১৩
ইমেইল: gloriouslibrary16@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০

৩১.
নাম: বেগম রোকেয়া স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: পায়রাবন্দ, মিঠাপুকুর, রংপুর
মোবাইল: ০১৭২৪৬৭৫৮৪৮
ইমেইল: r48176748@gmail.com
বই সংখ্যা: ৬০০০+

৩২.
নাম: সৈয়দ জুনাব আলী-আনোয়ারা সংস্কৃতি কেন্দ্র ও পাঠাগার
ঠিকানা: আশ্রয়গ্রাম, টিলাগাঁও, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার
মোবাইল: ০১৯১২৫৪৭৬৭৩
ইমেইল: syed.mokammal@gmail.con
বই সংখ্যা: ৬০০+

৩৩.
নাম: আল হেরা পাঠাগার
ঠিকানা: রাম জীবন পুর, মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ-২৪৪৬
মোবাইল: ০১৫১৬১১৩৩৪৮
ইমেইল: masummunawar88@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭০০+

৩৪.
নাম: জাতীয় পাঠাগার আন্দোলন
ঠিকানা: ২৩/৩ সোনালী ব্যাংকের গলি জিগাতলা ধানমন্ডি ঢাকা
মোবাইল: ০১৭৩০৫৯৯৯৫৭
ইমেইল: jatiyapathagerandolon@gmail.com
বই সংখ্যা: ১০০০০

৩৫.
নাম: শ্রীশ্রী হরি-গুরুচাঁদ মতুয়া মিশন পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম ও ডাক :-উত্তর সোনাখালী। (৮৫৬০)উপজেলা-মঠবাড়িয়া,জেলা-পিরোজপুর।
মোবাইল: ০১৭৮৭২৪৭০৭০
ইমেইল: niranjanmitra33@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৮৬০

৩৬.
নাম: মিলন স্মৃতি পাঠাগার ও ইস্টিশন পাঠাগার
ঠিকানা: হাসড়া মাজালিয়া,সরিষাবাড়ি, জামালপুরডধরঃরহম
মোবাইল: ০১৪০৮৪১২৮৯৪
ইমেইল: atifasad1971@gmail.com
বই সংখ্যা: ৮০০০

৩৭.
নাম: অধরা পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম: ব্রাহ্মণ জাটিগ্রাম,পোঃ মহিষার ঘোপ উপজেলা : আলফাডাঙ্গা, জেলা : ফরিদপুর
মোবাইল: ০১৭২০৩৮৯৪৯৯
ইমেইল: azmulaziz2021@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০

৩৮.
নাম: অরুনভাতি গণগ্রন্থাগার
ঠিকানা: চন্দ্রপুর, শরীয়তপুর সদর, শরীয়তপুর।
মোবাইল: ০১৭৩৭০৪৬৮৭০
ইমেইল: Arunvatipubliclibrary@gmail.com
বই সংখ্যা: ২৫০+

৩৯.
নাম: চেতনা গণ পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃ জাহাপুর, পোঃ জাহাপুর (কোড নং-৭৮০১) উপজেলাঃ মধুখালী, জেলাঃ ফরিদপুর, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭১৯১২১৬৫৬
ইমেইল: cetona22@gmail.com
বই সংখ্যা: ৮৫০

৪০.
নাম: কমিউনিটি সলিউশন পাঠাগার
ঠিকানা: আশাপুর ত্রিমোড়, পোস্টঃ নৈহাটি বাজার, থানা: আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা
মোবাইল: ০১৪০৪১৯০৯০৩
ইমেইল: community2solution@gmail.com
বই সংখ্যা: ২২০

৪১.
নাম: জঙ্গলবাড়ী বাতিঘর
ঠিকানা: গ্রাম: জঙ্গলবাড়ী, ডাকঘর: রাণীগঞ্জ-২২২০, উপজেলা: ফুলবাড়ীয়া, জেলা: ময়মনসিংহ
মোবাইল: ০১৭৪৩৪৫৮৭৯৩
ইমেইল: junglebaribatighar@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫৫০+

৪২.
নাম: জ্ঞানের আলো পাঠাগার
ঠিকানা: কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
মোবাইল: ০১৮৭২৭৮৭৭৯৭
ইমেইল: gyaneralopathagar2017@gmail.com
বই সংখ্যা: ২৫০০+

৪৩.
নাম: Shamsul Huda Memorial Library
ঠিকানা: Talukdar Bari, Agterilla, Falda, Bhuapur, Tangail.
মোবাইল: ০১৭২৪৪৮৮৭৫২
ইমেইল: nurunnabi_khan@hotmail.com
বই সংখ্যা: ৫৫০

৪৪.
নাম: সাধারণ গ্রন্থাগার, টাংগাইল
ঠিকানা: নিরালারমোড়,টাংগাইল -১৯০০
মোবাইল: ০১৭১১৭০৯৩৩২
ইমেইল: ধনপফ
বই সংখ্যা: ২২৭৮৭

৪৫.
নাম: খিলা বাড় বাড়ি সামাজিক পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃ খিলা, থানাঃ মনোহরগঞ্জ, কুমিল্লা।
মোবাইল: ০১৯৪১৬২৫২৩৬
ইমেইল: sakhawathosain480@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫০

৪৬.
নাম: গ্রাম গবেষণা পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম : সাইংজুরী, ইউনিয়ন : বালিয়াখোড়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৭১৮০০০২১৬
ইমেইল: pkrishi2014@gmail.com
বই সংখ্যা: ১০০

৪৭.
নাম: বেড়ী পটল আদর্শ গণ-গ্রন্থাগার
ঠিকানা: গ্রাম:বেড়ী পটল, পোস্ট:পটল, থানা:কালিহাতী, জেলা:টাংগাইল
মোবাইল: ০১৭০৩৯০২১৭৬
ইমেইল: bagg.beripotol@gmail.com
বই সংখ্যা: ৪০০

৪৮.
নাম: শহীদ রুমী স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: বউ বাজার, কড়াইল, বনানী, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৮১২৬৪৫৯৫৯
ইমেইল: rumipathagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩০০০

৪৯.
নাম: জাহাঙ্গীর সার্কেল পাঠাগার
ঠিকানা: ৪২/১-ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৭১৫১৫০৩০৫
ইমেইল: mostafajahangir58@gmail.com
বই সংখ্যা: ৪০০

৫০.
নাম: রসুলপুর ইসলামিক পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম রসুলপুর, উপজেলাঃ কাহারোল, জেলা দিনাজপুর
মোবাইল: ০১৭৪১৭০০৭০৫
ইমেইল: 14.018.juel@gmail.com
বই সংখ্যা: ৪০০

৫১.
নাম: মামুদ আলী গণগ্রন্থাগার
ঠিকানা: কাটিগ্রাম বাসস্ট্যান্ড, মানিকগঞ্জ সদর, মানিকগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৭০০৫১৯৯৪১
ইমেইল:
বই সংখ্যা: ১৫০০

৫২.
নাম: গ্রাম পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম: মোসলেমাবাদ, ডাকঘর: মোসলেমাবাদ, উপজেলা: মাদারগঞ্জ, জেলা: জামালপুর।
পোষ্ট কোড- ২০১০
মোবাইল: ০১৭১৫৯৫১০৮১
ইমেইল: prasbangladesh@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩০০

৫৩.
নাম: বীর মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ূন কবির পাঠাগার
ঠিকানা: হবিগঞ্জ, চুনারুঘাট ১নং গাজিপুর, পচারবাড়ী
মোবাইল: ০১৭২৮৬৬৮৩৯১
ইমেইল: apondasawtal@gmail.com
বই সংখ্যা: ১১০০+

৫৪.
নাম: অদম্য '১৯ পাঠাগার
ঠিকানা: গফরগাঁও, ময়মনসিংহ
মোবাইল: ০১৭৯৬২৮২৩৩১
ইমেইল: mdtayabmridha333@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭০০

৫৫.
নাম: প্রম সমাজ-সংস্কৃতি কেন্দ্র
ঠিকানা: অন্নদানগর, পীরগাছা, রংপুর
মোবাইল: ০১৭৫৫১০০৩০৪
ইমেইল: Projonmokendro@gmail.com
বই সংখ্যা: ১০০০

৫৬.
নাম: জ্ঞানের ভুবন পাঠাগার
ঠিকানা: ১৬৯/১/এ বটতলা মাজার, হাজারীবাগ রোড, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৬৭১৬৩৬৭৯৭
ইমেইল: gyanerbhubanpathagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩০০

৫৭.
নাম: সেঁওতি গ্রন্থাগার
ঠিকানা: সরদারপাড়া, দিনাজপুর
মোবাইল: ০১৬৮৯০৪২৪৯০
ইমেইল: shuveschai@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫০০০

৫৮.
নাম: ইনফাক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি পাঠাগার
ঠিকানা: গোপালপুর বাজার, আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর।
মোবাইল: ০১৭১৬৮৬৬৩২০,০১৭৬০৮১৬৮৭৪
ইমেইল: shikkhapalli@gmail.com
বই সংখ্যা:

৫৯.
নাম: দেশরত্ন শেখ হাসিনা ডিজিটাল গণ গ্রন্থাগার
ঠিকানা: পূর্ব আরিচপুর, গাজী আলাউদ্দিন মার্কেট,বউ বাজার,টঙ্গী, গাজীপুর
মোবাইল: ০১৫৯০০১০১৮৩
ইমেইল: dshpl2019@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০

৬০.
নাম: আদর্শ পাঠাগার ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন
ঠিকানা: দক্ষিণ চরকমলাপুর, পোঃ ফরিদপুর-৭৮০০, উপজেলাঃ ফরিদপুর সদর, জেলাঃ ফরিদপুর।
মোবাইল: ০১৭২৭০১৩৫৮৮
ইমেইল: faisalali@gnail.com

বই সংখ্যা:

৬১.
নাম: বই ঘর পাঠাগার
ঠিকানা: টেংগরজানী, গাইবান্ধা সদর, গাইবান্ধা
মোবাইল: ০১৭৬৭১৪০১১৪
ইমেইল: editorboighor@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫৪৭

৬২.
নাম: মাও. আ. কুদ্দুস সাঈদী স্মৃতি গ্রন্থাগার
ঠিকানা: গ্রাম: ইন্দ্রইল, ডাক: বৈরচুনা, উপজেলা: পীরগঞ্জ, জেলা: ঠাকুরগাঁও।
মোবাইল: ০১৭৪০৯৫৫১৮৬
ইমেইল: abdurrashidpir@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০

৬৩.
নাম: আহমেদ জাবের চৌধুরী
ঠিকানা: ঢাকা
মোবাইল: ০১৮১৯১৮৮৯৮২
ইমেইল:
বই সংখ্যা: ৫০০

৬৪.
নাম: মোহনা পাঠাগার
ঠিকানা: মনমথ, বামনডাঙ্গা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা -৫৭২১
মোবাইল: ০১৭১৪৮৪৫২৪৮
ইমেইল: inforasel198882@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৮০০

৬৫.
নাম: বীরপ্রতীক বদরুজ্জামান স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: মিয়াপাড়া, শিমুলবাড়ী, ফুলবাড়ী, কুড়িগ্রাম
মোবাইল: ০১৭৪৪৯৫৩৮৫৮
ইমেইল:

বই সংখ্যা: ৫০০+

৬৬.
নাম: -
ঠিকানা: বড় কালীবাড়ি রোড, পূর্ব আদালত পাড়া, টাংগাইল
মোবাইল: ০১৭৬১৪২৮৩৪৮
ইমেইল: anandapath1952@gmail.com
বই সংখ্যা: ২৫০০

৬৭.
নাম: -
ঠিকানা: ঢাকা-জামালপুর মহাসড়ক, বাঁশহাটি, ধনবাড়ী, টাংগাইল।
মোবাইল: ০১৩১৯৮৯৭৯৪৯
ইমেইল:
বই সংখ্যা: ৪৪৩

৬৮.
নাম: একুশ স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: নগর কুমারী,বোদা,পঞ্চগড়
মোবাইল: ০১৭৪০৯৯৯৪৩৯
ইমেইল:
বই সংখ্যা: ২৫০০

৬৯.
নাম: আল-এমদাদ পাঠাগার
ঠিকানা: গুধিবাড়ি, জামিরতা, শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭৭৫৬৫৮৭৫২
ইমেইল: osmangonisiraji23@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩০০+

৭০.
নাম: চর জব্বর মেধা বিকাশ পাঠাগার
ঠিকানা: পরিষ্কার বাজার, চর জব্বর, সুবর্ণচর, নোয়াখালী।
মোবাইল: ০১৮২২৩৭৩৮৭২
ইমেইল:
বই সংখ্যা: ৫৫০

৭১.
নাম: Agrodut Dulu Paikar Smrity Pathagar
ঠিকানা: Pigachha Bazar, Matidali Road, Bogura Sadar, Bogura.
মোবাইল: ০১৭৫১৬৭৭৭২২
ইমেইল: agrodut.pathagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ৮৫০

৭২.
নাম: আলাপনী পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম- রূপরামপুর, ডাকঘর- থুকড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা
মোবাইল: ০১৯২২৬৭১৪১৭
ইমেইল: alaponipathagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ২৫০০+

৭৩.
নাম: খোকসা কমিউনিটি লাইব্রেরি
ঠিকানা: গ্রাম: পাইকপাড়া মির্জাপুর, পোস্ট: জানিপুর, উপজেলা: খোকসা, জেলা: কুষ্টিয়া
মোবাইল: ০১৭৬৫১৮২৮৯২
ইমেইল: mjuorg1@gmail.com
বই সংখ্যা: ২৫০০+

৭৪.
নাম: পাঠাগার ভিত্তিক যুব ও সমাজসেবা ক্লাব।
ঠিকানা: কাসারিতাল্লুক, উত্তর ছৈলাবুনিয়া, মির্জাগঞ্জ, পটুয়াখালী।
মোবাইল: ০১৭২৬৭৬০৩০২
ইমেইল: tareq.islam@pstu.ac.bd
বই সংখ্যা:

৭৫.
নাম: নিকরাইল গণকেন্দ্র পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম + পোস্ট অফিস: নিকরাইল, উপজেলা: ভূঞাপুর, জেলা: টাঙ্গাইল, পোস্ট কোড: ১৯৭৬
মোবাইল: ০১৭১৩৫৪৮৮১৭
ইমেইল: mdfaridulislamfarid17@gmail.com
বই সংখ্যা: ২৬৫২

৭৬.
নাম: অভিপ্রায় পাঠাগাঅভিপ্রায় পাঠাগার
ঠিকানা: মিরপুর বাজার,বিষ্ণুপুর,গাইবান্ধা সদর
মোবাইল: ০১৮১৫১১০২৯২
ইমেইল: ovipray171@gmail.com
বই সংখ্যা: ২০০

৭৭.
নাম: মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার, রাজশাহী
ঠিকানা: সাগরপাড়া, পো: ঘোড়ামারা, থানা : বোয়ালিয়া, জেলা: রাজশাহী
মোবাইল: ০১৭১৬২০৩৪৮৮
ইমেইল: latif.msp@gmail.com
বই সংখ্যা: ৪৮০০

৭৮.
নাম: হাফিজ স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম-শেরপুর, ডাকঘর - চিথলিয়া৭০৩০, উপজেলা - দৌলতপুর, জেলা - কুষ্টিয়া।
মোবাইল: ০১৭১১৩৪৫৩৮৭
ইমেইল: dranwarhb@yahoo.com
বই সংখ্যা: ৫৮০

৭৯.
নাম: শহীদ মনিরুজ্জামান স্মৃতী পাঠাগার
ঠিকানা: কোটচাঁদপুর কলেজ বাসষ্ট্যান্ড, কোটচাঁদপুর-৭৩৩০, ঝিনাইদহ।
মোবাইল: ০১৭১৮০৯২০০৭
ইমেইল: mukulp1971@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫০০+

৮০.
নাম: জয় বাংলা পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম.খামার পাড়া, হেমনগর, গোপালপুর, টাংগাইল
মোবাইল: ০১৭১২৯৭৭৮৯৯
ইমেইল: joybanglapathagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ১২৫০

৮১.
নাম: জ্ঞানবিক্ষণ পাঠাগার
ঠিকানা: ৯৪/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
মোবাইল: ০১৯১১৭৫২২৮৮
ইমেইল: Shabihasultana181082@gmail.com
বই সংখ্যা: ২০০০

৮২.
নাম: আলোকিত পাঠাগার
ঠিকানা: কুষ্টিয়া, কালিহাতী, টাঙ্গাইল
মোবাইল: ০১৭১৮৯৮২৬৩৪
ইমেইল: juwelkibria17@gmail.com
বই সংখ্যা: ১২০০+

৮৩.
নাম: আলহাজ মিনহাজ উদ্দিন আকন্দ স্মৃতি পাঠাগার,ধুবলিয়া।
ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর- ধুবলিয়া,উপজেলা - ভূঞাপুর, জেলা- টাংগাইল।
মোবাইল: ১৭৭৬৬৫১৭৮৫
ইমেইল: sohag571855@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭০০

৮৪.
নাম: গইজ চঁনষরপ খরনৎধৎু
ঠিকানা: ঠরষষধমব:এড়নরফধঢ়ঁৎ, টঢ়ধুরষধ: গঁশংঁফঢ়ঁৎ, উরংঃৎরপঃ: এড়ঢ়ধষমধহল
মোবাইল: ০১৭১৭৬৩৪৬৯১
ইমেইল: anismunshi@yahoo.com
বই সংখ্যা: ১০০০

৮৫.
নাম: আব্দুল মতিন মেমোরিয়াল হল এবং লাইব্রেরী
ঠিকানা: গ্রাম: পূর্ব ভাদেশ্বর,ডাক: পূর্ব ভাদেশ্বর-৩১৬১ থানা/উপজেলা: গোলাপগঞ্জ,জিলা-সিলেট।
মোবাইল: ০১৭৩১০০০৬২১
ইমেইল: halimmicrolab@gmail.com
বই সংখ্যা: ৪০০০

৮৬.
নাম: এবাদুল ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন ও পাঠাগার
ঠিকানা: চরবলেশ্বর, চন্ডিপুর হাট, ইন্দুরকানী, পিরোজপুর -৮৫০২
মোবাইল: ০১৭১৯৫৮৬১৩৬
ইমেইল: awfbd2013@gmail.com
বই সংখ্যা: ১২০০

৮৭.
নাম: ধলাপাড়া ইসলামি পাঠাগার
ঠিকানা: ধলাপাড়া, ঘাটাইল, টাংগাইল।
মোবাইল: ০১৭২৪৭১৮৩০৯
ইমেইল: mmdshariful309@gmail
বই সংখ্যা: ৫০০+

৮৮.
নাম: আবুল বাশার পাঠাগার (রেজিঃ নং- ঢ-০৪৮৮০)
ঠিকানা: গ্রাম- মঙ্গল বাড়ি, পো: মঙ্গলবাড়ি, উপজেলা-ধামরাই, জেলা- ঢাকা
মোবাইল: ০১৮২২০৫৫৪৩১,০১৭২৭১৯৬৩৮৮
ইমেইল: mdawladhossain41@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩০০

৮৯.
নাম: Chapainawabganj Public Library
ঠিকানা: Library Rd, Chapai Nawabganj
মোবাইল: ০১৭১২২২১০০৯
ইমেইল:faruque0069@gmail.com
বই সংখ্যা: ২৫০০০

৯০.
নাম: আমাদের লাইব্রেরি
ঠিকানা: গ্রাম+পোস্টঃ সুলতানপুর, উপজেলাঃ বোঁচাগঞ্জ, জেলাঃ দিনাজপুর
মোবাইল: ১৭১৭৮৮৪০১১
ইমেইল: mehedizm@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৬৮০

৯১.
নাম: পানিহার পাবলিক লাইব্রেরী
ঠিকানা: পোস্ট পানিহার উপজেলা গোদাগাড়ী জেলা রাজশাহী
মোবাইল: ০১৭৪০৬৩৪৭৩২
ইমেইল: ppl1945.m@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭৭০২

৯২.
নাম: স্বপ্নবিলাস উন্মুক্ত পাঠাগার
ঠিকানা: কলেজ স্ট্রিট, রাণীগঞ্জ(পোড়াবাড়ী বাজার), ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ০১৭১০৪০৩১৩৮
ইমেইল: swapnobilash.official@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭০০+

৯৩.
নাম: মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার, রাজশাহী
ঠিকানা: সাগর পাড়া পোষ্টঃঘোড়ামারা থানাঃবোয়ালিয়া, জেলাঃরাজশাহী
মোবাইল: ০১৭১৬২০৪৮৮
ইমেইল: latif.msp@gmail.come
বই সংখ্যা: ৪৮০০

৯৪.
নাম: শাহ কৃষি তথ্য পাঠাগার ও যাদুঘর
ঠিকানা: কালী গ্রামমান্দা,নওগা
মোবাইল: ০১৭১১৪৬৩৭৩৮
ইমেইল: Jahangir.rajshahi@yahoo.com
বই সংখ্যা: ৭০০০

৯৫.
নাম: পাবলিক পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃরূপাখাড়া,ডাকঘরঃসোনাখাড়া-৬৭২১,উপজেলাঃরায়গঞ্জ,জেলাঃসিরাজগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৭২৪৬২২৬৫৮
ইমেইল: smshahalam.319@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫২৬

৯৬.
নাম: গালা গণ পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম-গালা, ডাক-গালা বীরসিংহ, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।
মোবাইল: ০১৭১৮৫৯৬০৮৫
ইমেইল: pathagargalagono@gmail.com
বই সংখ্যা: ২১০০

৯৭.
নাম: শেখ নূর মোহাম্মদ স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃ বেটখৈর,ডাকঘরঃ চান্দাইকোনা,পোষ্ট কোড নংঃ ৫৮৪১,উপজেলাঃ শেরপুর, জেলাঃবগুড়া।
মোবাইল: ০১৭১০১৪৫৯৫৬
ইমেইল: mdali23789@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০

৯৮.
নাম: Shaheed Abdul Wahab Smriti Pathagaar
ঠিকানা: Vill- Choto Khatamari, P.O- Joymonirhat, P.S- Bhurungamari, Dist- Kurigram
মোবাইল: ০১৭১২৮২৯৮৮৮
ইমেইল: talukdermasudt2@gmail.com
বই সংখ্যা: ৬১৭

৯৯.
নাম: গ্রাম পাঠাগার
ঠিকানা: রামচন্দ্রপুর বাজার, মুরাদনগর, কুমিল্লা
মোবাইল: ০১৭২৩৪৯৪৮১৬
ইমেইল: Grampathhagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩,৫০০

১০০.
নাম: ইসলামী পাঠাগার সত্রাজিতপুর কেন্দ্রীয় গোরস্থান
ঠিকানা: সত্যজিতপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭১৯৮২৩৭৮৮
ইমেইল: ipskg1983@gmail.com
বই সংখ্যা: ১০০০

১০১.
নাম: নাজিরপুর কল্যাণ পাঠাগার
ঠিকানা: নাজিরপুর হাটপাড়া, পাবনা সদর, পাবনা।
মোবাইল: ০১৭১২৩৬৮৯৬৯
ইমেইল: engrsaidulislamsayed@gmail.com
বই সংখ্যা: ১০৭৯

১০২.
নাম: মসিদপুর শিক্ষা উন্নয়ন পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃ মসিদপুর, ডাকঘরঃ রামগাঁ, উপজেলাঃ মান্দা, জেলাঃ নওগাঁ।
মোবাইল: ০১৭১৬১০৫৬৬৪
ইমেইল: mosidpursupathagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ৬০৪

১০৩.
নাম: চাঁদ পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর: চাঁদট, খোকসা, জেলা: কুষ্টিয়া।
মোবাইল: ০১৭১৪৩৪১১৭৭
ইমেইল: chandpathagar12@gmail.com
বই সংখ্যা: ২৪৩০

১০৪.
নাম: হেরিটেক,বাংলাদেশের ইতিহাসের আরকাইভস(হেরিটেক আরকাইভস)
ঠিকানা: ৪৫৬-ক, কাজলা, ডাকঘরঃকাজলা,থানাঃমতিহার, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী ৬২০৮
মোবাইল: ০১৭১৬৭৬০৪৮৫
ইমেইল: mahabub52heritxse@yehoo.com
বই সংখ্যা: ৫০,০০০

১০৫.
নাম: মনবাহক
ঠিকানা: পাটগ্রাম, লালমনিরহাট
মোবাইল: ০১৭১২৯৪৬০৪৬
ইমেইল: monbahokpubliclibray@gmail.com
বই সংখ্যা: ৬২৫

১০৬.
নাম: সবার জন্য পড়া উন্মুক্ত পাঠাগার
ঠিকানা: ধুলাউড়ি পূর্ব পাড়া, ধুলাউড়ি, সাঁথিয়া, পাবনা।
মোবাইল: ০১৭৪৮৫৬৩৩৪২/০১৭৩৫২০১৫৪২
ইমেইল: mdsahadathossain342@gmail.com
বই সংখ্যা: ৪০০

১০৭.
নাম: এরাদত মোল্লা স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃঅর্জুনদাহ পো:ফুলারপাড় উপজেলাঃমুকসুদপুর জেলাঃগোপালগন্জ
মোবাইল: ১৭১৬৫১২৭৫৩
ইমেইল: abulmolla31@gmail.com
বই সংখ্যা: ১০৫০

১০৮.
নাম: আবেদ আলী স্মৃতি গ্রন্থাগার
ঠিকানা: গ্রাম: পনির পাড়া,পোষ্ট: দূর্গাহাটা, থানা :গাবতলী জেলা: বগুড়া
মোবাইল: ১৭৯১৭০০৯৯৬
ইমেইল: abusyed1997@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩৮০

১০৯.
নাম: কবি নজরুল পাঠাগার
ঠিকানা: বাদিয়াখালি গাইবান্ধা
মোবাইল: ০১৭৪০০৭৭৬৪৬
ইমেইল: rjnabil801@gmail.com
বই সংখ্যা: ১০০০

১১০.
নাম: উছমান- আজিম পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম: শিমুলবাঁক, ডাকঘর: বাদলা, উপজেলা: ইটনা, জেলা: কিশোরগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭১১৬৬১৫১৫
ইমেইল: halimdadkhan1955@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫৯৩

১১১.
নাম: অরণি পাঠাগার, কামারকাঠি
ঠিকানা: কামারকাঠি, নেছারাবাদ,পিরোজপুর, বরিশাল
মোবাইল: ০১৭১৬৪৪৫২৫৭
ইমেইল: dhireuhalder58@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৯০০০

১১২.
নাম: বিলকিছ আলম পাঠাগার
ঠিকানা: কোমাল্লা, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা
মোবাইল: ১৮১৪৯৩২৪২৩
ইমেইল: kalerdhonibd@gmail.com
বই সংখ্যা: ২৫০০+

১১৩.
নাম: আকাশী গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞান ক্লাব
ঠিকানা: গ্রাম-আকাশী, পোঃ+উপজেলাঃ-মধুপুর, টাংগাইল
মোবাইল: ০১৭১১১৯৭১৭৫
ইমেইল: akashigasc@gmail.com
বই সংখ্যা: ২০০০

১১৪.
নাম: পথ পাঠাগার
ঠিকানা: সুসঙ্গ দুর্গাপুর, নেত্রকোনা।
মোবাইল: ০১৭১৯৬০১৮৪৫
ইমেইল: pothpathagar1@gmail.com
বই সংখ্যা: ২০০০

১১৫.
নাম: শহিদ শুকলাল প্রামাণিক পাঠাগার
ঠিকানা: রঘুনাথপুর, ছাতনী, নাটোর সদর, নাটোর
মোবাইল: ১৭১৯৭৩৫৯৮৬
ইমেইল: ssppathagar2021@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭০০

১১৬.
নাম: আশার আলো পাঠাগার
ঠিকানা: হাসপাতাল রোড,নওয়াপাড়া, যশোর।
মোবাইল: ০১৭৪১৩০৪৬০৬
ইমেইল:
বই সংখ্যা: ৫০০

১১৭.
নাম: অনুপ্রেরণা পাঠাগার
ঠিকানা: উমর বালাটারি, গজঘণ্টা গংগাচড়া রংপুর।
মোবাইল: ১৭৩৮১০২৬৬৪
ইমেইল: mostrumakhan845@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭৩৯

১১৮.
নাম: মং চিঅং স্মৃতি গণপাঠাগার
ঠিকানা: বরইতলী, নাইক্ষংছড়ি, বান্দরবান
মোবাইল: ০১৮১১৬০০৪৩৬
ইমেইল: shipta52@gmail.com
বই সংখ্যা: ২০০০

১১৯.
নাম: তারাপদ বৈরাগী স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃ তালবাড়িয়া, পোস্টঃ হাতিয়ারডাংগা, উপজেলা ঃ কয়রা,জেলাঃ খুলনা-৯২৯০
মোবাইল: ১৭১৭৪১১৩০২
ইমেইল: pathagartarapado@gmail.com
বই সংখ্যা: ৮০০

১২০.
নাম: আলোর ফোয়ারা লাইব্রেরী
ঠিকানা: পিংগলিয়া, কাশিয়ানী, গোপালগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৫৮০৭৪১২১৫
ইমেইল: sirazulislam5510@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০

১২১.
নাম: পুরাপাড়া বঙ্গবন্ধু গণগ্রন্থাগার
ঠিকানা: পুরাপাড়া বাজার, নগরকান্দা, ফরিদপুর।
মোবাইল: ০১৭১১৭০৯২৫৭,০১৬৭০৪৬১৬০০
ইমেইল: purapara.uhc@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৬০০

১২২.
নাম: আলহাজ্ব আব্দুল হাই শেখ স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: রঘুনাথপুর আতাইকুলা সাঁথিয়া পাব
মোবাইল: ০১৭২৬৩১৬৯৫৯
ইমেইল: mdmithunsheikhmithu@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০

১২৩.
নাম: আলহাজ্ব আমজাদ হোসেন জ্ঞানদ্বীপ পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম: জয়দেব মধ্যপাড়া, পোস্ট: গজঘণ্টা, উপজেলা: গংগাচড়া, জেলা: রংপুর।
মোবাইল: ১৫১৬৭২৯০৯০
ইমেইল: shamolibinteamjad1993@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫০০+

১২৪.
নাম: মুক্ত পাঠাগার(১ বেশি ধরতে হবে)
ঠিকানা: কাজির হাট, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
মোবাইল: ০১৬৩২৭২৮৭৬৬
ইমেইল: muktopathagarbd71@gmail.com
বই সংখ্যা: ১,০০০+

১২৫.
নাম: মাতৃভাষা গণগ্রন্থাগার
ঠিকানা: মাতৃভাষা গণগ্রন্থাগার, কালুহুদা,বাথানগাছি,মহেশপুর, ঝিনাইদহ।
মোবাইল: ০১৭১৬৬৭৯৫১১
ইমেইল: librarytutul@gmail.com
বই সংখ্যা: ৬০০০

১২৬.
নাম: উজান গণগ্রন্থাগার
ঠিকানা: জয়পাড়া,দোহার,ঢাকা।
মোবাইল: ১৭২১৭২৬৬৭৬
ইমেইল: ujanganagranthager@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫০০

১২৭.
নাম: বিশ্ববিদ্যা প্রাঙ্গণ
ঠিকানা: কৃষ্ণপুর, চান্দিনা, কুমিল্লা
মোবাইল: ১৯২৬০০১৭৪৩
ইমেইল: amin.du1992@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫০

১২৮.
নাম: মুক্ত পাঠাগার
ঠিকানা: চট্টগ্রাম
মোবাইল: ০১৬৩২৭২৮৭৬৬
ইমেইল: muktopathagarbd71@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫৮

১২৯.
নাম: শিশুদের হাসি পাঠাগার
ঠিকানা: হোসেনপুর, কিশোরগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭১৭০৪২১৪৮
ইমেইল: shpkg1@gmail.com
বই সংখ্যা: ৯০০

১৩০.
নাম: মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মুক্ত পাঠাগার
ঠিকানা: বাড়ি নং# ১৭, রোড নং# ১৩, পিসিকালচার হাউজিং, শেখেরটেক, আদাবর, ঢাকা
মোবাইল: ১৬৭৫৪১১৮৮৮
ইমেইল: shikkhalok@cdipbd.org
বই সংখ্যা: ১০০০

১৩১.
নাম: উত্তরণ পাঠাগার
ঠিকানা: সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা
মোবাইল: ০১৫৭১২৪১৪৮৬
ইমেইল: pathagar.uttaran@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৮০০

১৩২.
নাম: মানুষালয়
ঠিকানা: হোসেনপুর, মহিচাইল, চান্দিনা, কুমিল্লা
মোবাইল: ১৭২০২৫৭৮১৫
ইমেইল: manushalay@gmail.com, mahfuzjewelster@gmail.com
বই সংখ্যা: ১১২১

১৩৩.
নাম: হাওয়া গন পাঠাগার
ঠিকানা: বগুড়া
মোবাইল: ০১৭৭২৩৮৬০৬৮
ইমেইল: Houa begum@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫০

১৩৪.
নাম: মুক্তি গণপাঠার
ঠিকানা: কাঠগড়া, জিরাবো, আশুলিয়া, ঢাকা
মোবাইল: ০১৯৭৭৪৬৬১৬৭
ইমেইল: muktiganapathagara@gmail.com
বই সংখ্যা: ৬০০+

১৩৫.
নাম: বইপোকা পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম : নীলেরপাড়া (পূর্ব), ওয়ার্ড : ৩০ নং, পোস্ট : গাজীপুর সদর-১৭০০, জেলা : গাজীপুর, গাজীপুর মহানগর, গাজীপুর।
মোবাইল: ০১৫১৫৬৭১২১১
ইমেইল: madhabmon1991@gmail.com
বই সংখ্যা: ২০০০

১৩৬.
নাম: বইবন্ধু
ঠিকানা: বাসা নংঃ ৫৯, রোড নংঃ ৫ শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মোবাইল: ০১৭০৬৪৬৮০৮৫
ইমেইল: mdshm44@gmail.com
বই সংখ্যা: ৪০০০

১৩৭.
নাম: বীরমুক্তিযোদ্ধা তুলা কমান্ডার পাঠাগার
ঠিকানা: কোনাবাড়ি বাজার, গোপালপুর, টাঙ্গাইল
মোবাইল: ০১৭১০৬৯৮৪৯৮
ইমেইল: mrdolon98@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০+

১৩৮.
নাম: আলোর ভুবন পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃ সিংরইল, পোঃ সিংরইল, থানাঃ নান্দাইল, জেলঃ ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ১৯৮৭০১৯৩৭৭
ইমেইল: fizulislam4952@gmail com.
বই সংখ্যা: ৩০০০

১৩৯.
নাম: আলোকিত পাঠাগার (১২টি পাঠাগার)
ঠিকানা: আলোকিত ১১ নং ইউনিয়ন, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর
মোবাইল: ০১৯৭২১৮৮২০০
ইমেইল: sarfuddin.yousuf@gmail.com
বই সংখ্যা: ৬০০০ (১২ পাঠাগার)

১৪০.
নাম: গোপালদী আবঃসালাম মোল্যা লাইব্রেরি
ঠিকানা: ফরিদপুর
মোবাইল: ০১৭১০৬৮৭৯৫৮
ইমেইল: zahidulislam1975@gmail.com
বই সংখ্যা: ২০৫৩

১৪১.
নাম: বন্ধন পাবলিক লাইব্রেরি
ঠিকানা: ফরিদপুর
মোবাইল: ০১৫১১৫৮৯৮৬৩
ইমেইল: hedayetbiplob@gmail.com
বই সংখ্যা: ৬০০

১৪২.
নাম: ইসলামী গণগ্রন্থাগার ও সেবা সংঘ
ঠিকানা: ফরিদপুর
মোবাইল: ০১৭১২১৭৮১৮১
ইমেইল: khabir8187@gmail.com
বই সংখ্যা: ৬০০

১৪৩.
নাম: নয়ন গণগ্রন্থাগার
ঠিকানা: ফরিদপুর
মোবাইল: ০১৭০৯৬১৪১২২
ইমেইল: khancybernet@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭০০

১৪৪.
নাম: ফরিদপুর মুসলিম মিশন গণগ্রন্থাগার
ঠিকানা: ফরিদপুর
মোবাইল: ০১৭১৫০১৫৬২১
ইমেইল: snmision@gmail.com
বই সংখ্যা: ২১০০০

১৪৫.
নাম: হক ফাতেমা পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম- গাংগাইল, পোঃ গাংগাইল (২২৯১), উপজেলা- নান্দাইল, জেলা- ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ০১৭১৫৩৪০৫৯৭
ইমেইল: babulnandail@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭০০০

১৪৬.
নাম: নান্দাইল প্রেসক্লাব পাঠাগার
ঠিকানা: নান্দাইল চৌরাস্ড্র, উপজেলা- নান্দাইল, জেলা- ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ০১৭৭৮৫১১৬২৩
ইমেইল: nandailpc@gmail.com
বই সংখ্যা: ২৫০০০

১৪৭.
নাম: ভাষা ও স্বাধীনতাসংগ্রামী মতি মিয়া ফাউন্ডেশন পাঠাগার
ঠিকানা: দেওয়ানপাড়া, জামালপুর।
মোবাইল: ১৭১৬৪৭৩১৮১
ইমেইল: motimiahpathagar@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩০০০

১৪৮.
নাম: আকাশের আখড়া
ঠিকানা: ৪৪৫, চেয়ারম্যান গলি, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
মোবাইল: ০১৫৩৩৯৬৯৫৮৮
ইমেইল: mdshmab43@gmail.com
বই সংখ্যা: ২০০

১৪৯.
নাম: বীর মুক্তিযোদ্ধা আ ফ ম মাহবুবুল হক পাঠাগার
ঠিকানা: নজরুল সরণি, চৌরাস্তা মোড়, প্রেসক্লাব এর ২ য় তলা, সিরাজগন্জ সদর, সিরাজগন্জ।
মোবাইল: ০১৭১৭৮২১৬৮৬৩০১৯৩৯৩৩৫৭৮৭
ইমেইল: afmmahbub1947@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৮০০

১৫০.
নাম: বিমল সরকার সাহিত্য সম্ভার ও পাঠাগার
ঠিকানা: তুলসীঘাট গাইবান্ধা
মোবাইল: ০১৭৮৩১৫৯৫২১
ইমেইল: mdshamimsarker1925@gamil.com
বই সংখ্যা: ১৭০০

১৫১.
নাম: অন্বেষা পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃ মাইজবাগ, পোঃ মাইজবাগ, থানাঃ ঈশ্বরগঞ্জ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
মোবাইল: ০১৭১৬৩৬০৩৮৭
ইমেইল: Fizulislam4952@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০০

১৫২.
নাম: লেখিকা নাসরীন রেখা গ্রন্হাগার
ঠিকানা: কুবতলা গাইবান্ধা
মোবাইল: ০১৭১৪৬০৫৬০৩
ইমেইল: Nasinsultana1361994@gmail.com
বই সংখ্যা: ৭০০

১৫৩.
নাম: আল- কারীম ইসলামী পাঠাগার
ঠিকানা: খারুয়া মাদ্রাসা বাজার, নান্দাইল, ময়মনসিংহ
মোবাইল: ০১৮৫৭৮৬০০৫০
ইমেইল: Alkarimpatager2018@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০+

১৫৪.
নাম: হাজী মাছিদ আলী গণপাঠাগার ও কল্যাণ ট্রাস্ট
ঠিকানা: গ্রাম ও ডাক- বহরগ্রাম-৩১৬৫, উপজেলা- গোলাপগঞ্জ, জেলা- সিলেট
মোবাইল: ০১৭১৮৫০৮৫৬৮/০১৭৪৯৭৫০৫৩৫
ইমেইল: mamalik568@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৮৯৪

১৫৫.
নাম: কেরানীগঞ্জ আলোক পাঠাগার
ঠিকানা: জিনজিরা বাজার ঈদ গাঁ রোগ, বয়জ অব জিনজিরা বিল্ডিং ৩য় তলা, ঢাকা-১৩১০।
মোবাইল:
ইমেইল: mrana83@gmail.com
বই সংখ্যা:

১৫৬.
নাম: লাইব্রেরী অন্বেষণ
ঠিকানা: বেলতৈল, মির্জাপুর, টাংগাইল
মোবাইল: ০১৭৫৩৫৪০২৭৯
ইমেইল: jahirislam827@gmail.com
বই সংখ্যা: ৪৫০

১৫৭.
নাম: ভাটিয়াল মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি পাঠাগার
ঠিকানা: বাউরখুমা (বিলোনিয়া), পরশুরাম, ফেনী-বাংলাদেশ।
মোবাইল: ০১৫১১৪৯৫৬১৫
ইমেইল: vatialbd@gmail.com
বই সংখ্যা: ১২৫০

১৫৮.
নাম: শিক্ষাবিদ ড. এলহাম হোসেন পাঠাগার ও কাউন্সেলিং সেন্টার
ঠিকানা: দিঘলকান্দি (বড় বাড়ি),ধুনট, বগুড়া
মোবাইল: ০১৭০১৭১২৭৬২
ইমেইল: nabilislam832@gmail.com
বই সংখ্যা: ৫০০+

১৫৯.
নাম: জারুলবনিয়া পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রামঃ শিলখালী জারুলবনিয়া, ডাকঘরঃ বারবাকিয়া (৪৭৭০), উপজেলাঃ পেকুয়া, জেলাঃ কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৬২৯৭২০৪৮৮
ইমেইল: makarim.bangladesh@gmail.com
বই সংখ্যা: ৩০০

১৬০.
নাম: জিয়াউল হক পাঠাগার
ঠিকানা: মুসরিভুজা ভোলাহাট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মোবাইল: ০১৭২১৮৭৭৩৯২
ইমেইল: faruque0069@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৪০০০

১৬১.
নাম: গ্রন্থবিতান
ঠিকানা: ৮-৯ রাজা শ্রীনাথ রায় স্ট্রীট,লালবাগ, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৯১২৩৮৯৭২১
ইমেইল:
বই সংখ্যা:১১০০০

১৬২.
নাম: মুক্ত পাঠাগার চট্টগ্রাম জোন
ঠিকানা: চট্টগ্রাম
মোবাইল: ০১৮৬৮৬০৬৭৫৯
ইমেইল: muktopathagarbd71@gmail.com
বই সংখ্যা: ২০০

১৬৩.
নাম: সৃষ্টি পাঠোদ্যান
ঠিকানা: বাসা ৫০, রোড ১৯, রুপনগর আ/এ, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭১১৩১০৪৮৩
ইমেইল: ashraf63@rocketmail.com
বই সংখ্যা:৬৫০০

১৬৪.
নাম: ছোট মহেশখালী গণপাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম:দক্ষিণ নলবিলা,ইউনিয়ন: ছোট মহেশখালী, পোষ্ট : গোরকঘাটা, থানা : মহেশখালী, জেলা: কক্সবাজার।
মোবাইল: ০১৮২৪১৮১০০৭/০১৮৫০৩৯৩৪৯৭
ইমেইল:
বই সংখ্যা:৫০০

১৬৫.
নাম: তাজউদ্দীন শিশু পাঠাগার
ঠিকানা: নয়নপুর, রাজেন্দ্রপুর ক্যান্ট, গাজীপুর।
মোবাইল: ০১৮৭৮৬২৯০৫৮
ইমেইল: issc134482@gmail.com
বই সংখ্যা: ১৫০০+

১৬৬.
নাম: আলোর দিশারি পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম- নগরবাড়ি, ইউনিয়ন - নারান্দিয়া, থানা- কালিহাতী, জেলা- টাঙ্গাইল।
মোবাইল: ০১৭১৫২৮১৭৫০
ইমেইল:abuhanifasibp@gmail.com
বই সংখ্যা:২৫০০

১৬৭.
নাম: হলহলিয়া পাঠাগার
ঠিকানা: গ্রাম: নয়া-উল্লাপাড়া, থানা ও পোষ্ট অফিস: ধুনট, জেলা: বগুড়া
মোবাইল: ০১৭১৬১৩৩৮৯১
ইমেইল:aopurno1@gmail.com
বই সংখ্যা:৩৫০

১৬৮.
নাম: আদর্শ
ঠিকানা: ২০ বাবুপুরা, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা ১২০৫
মোবাইল: ০১৭৯৩২৯৬২০২
ইমেইল:hello@adarsha.com.bd
বই সংখ্যা:৩০০

১৬৯.
নাম: আহমেদ পরিবার পারিবারিক পাঠাগার
ঠিকানা: ২৫ ম্যান্সউড গার্ডেন্সটরন্টো, অন্টারিও, কানাডা
মোবাইল:
ইমেইল:
বই সংখ্যা:

১৭০.
নাম: সুফি মোতাহের পাঠাগার
ঠিকানা:
মোবাইল:
ইমেইল:
বই সংখ্যা: